শিক্ষাপ্রসঙ্গ ও দেশ-কাল

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

ন বা র্ক ॥ ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা ৭০০ ০৫৯

মুখবন্ধ

শিক্ষকতার সূত্রে বঙ্গভূমি ছেড়ে যেতে হয়েছে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। দেশের মাটির রসে যতদিন পুষ্ট থেকেছি মনে তেমন ভাবে প্রশ্ন জাগে নি। একথা বলতে দ্বিধা হয় তবু সেটাই আমার যথার্থ পরিচয়।

পাশ্চাত্ত্য সমাজজীবনের চঞ্চলতায় খানিকটা দিশাহারার মতো অবস্থা হ'ল। আপন সমাজ থেকে দূরে এসে মাটির টান বেড়ে উঠল। অন্তরের গভীরে সুরু হ'ল রক্তমোক্ষণ। পীড়া বোধ হ'ল, এমনকি ক্ষোভও। প্রশ্ন জাগল কেন যতটুকু মানুষের হাতে আছে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় না? কেন ভ্রান্ত দৃষ্টি আত্ম-স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখে না?

সমাজে ভারসাম্য টলেছে। সাম্য ও সহযোগিতা, শান্তি ও সন্তোষ নয়, নিরন্তর প্রতিযোগিতায় লব্ধধন পুঞ্জীভূত করে সুখভোগের লুব্ধতা সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। এই প্রতিযোগী জীবনদৃষ্টি, ব্যক্তিবাদ যা ধনতান্ত্রিক জীবন আদর্শের নিদান, দরিদ্র অনগ্রসর সমাজজীবনে তা যেন অভিশাপেরই নামান্তর। মুষ্টিমেয়র সাফল্য— অধিকাংশের বিফলতা, এই ক্ষয় ক্ষতির উপশমের জন্যই নতুন করে এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেন চিন্তা করে। মুক্তির পথ খুঁজে পায়। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব, পরাধীনতার দোষগুণ সমাজে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, হিংসাত্মক অন্তর্ঘাতী কার্য-কলাপে নয়, চিন্তা, বুদ্ধি, শিক্ষা, বিচার-বিবেচনা এবং সংগঠনশক্তির প্রভাবে পূর্ব-বর্তী প্রজন্মের ভুলভ্রান্তি যেন সংশোধিত হয়— এই আশা। কিন্তু অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে নয় – স্বচেষ্টায় স্বনির্ভরতায়। এখানেই স্বাধীন জাতি স্বাধীন সত্তার প্রকাশ।

আমার ক্ষোভ, বেদনা, আর্তি, জিজ্ঞাসা শুধু আমি এই ব্যক্তিটিরই নয়, আমার যুগের অনেকেরই। দর্পণে প্রতিফলনের মতো সাধারণ সামাজিক অনেকেই আপন-আপন মনোভাবের প্রতিফলন দেখবেন নিবন্ধের বক্তব্যে। এযুগের ছেলেমেয়েরা হয়তো কিছু চিন্তার খোরাক পাবে।

কাম এবং ক্রোধের মতো লোভও ইন্ধনে বেড়ে ওঠে। ব্যক্তির মনে সমাজের শিক্ষায় বর্মের আবরণ সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সমাজের স্থায়ী মঙ্গলের জন্য পরিবেশ প্রতিবেশের গুরুত্ব সমধিক। আজকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় প্রচার মাধ্যম সরকারি সর্ব-প্রকার উদ্যোগে যেন প্রচেষ্টায় থাকে সংযম, দায়দায়িত্ববোধ, সহিষ্ণুতা, পরিমিতি, সেবা ও সহযোগী মনোভাব গঠনের। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারতীয় ভাব মূল্যবোধ ও মানবীয় চিরন্তন সদ্গুণগুলি শিশু কিশোর যুবকের মনে দানা বেঁধে উঠলে তবেই দরিদ্র আধুনিক জীবন মানে অনগ্রসর সমাজগুলির স্থায়ী মঙ্গলের সম্ভাবনা। শক্তিশালী ধনীদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কূট চালে যেন এই সমাজ-গুলি সম্পূর্ণ বিকিয়ে না যায়— এই কথাগুলি বিভিন্ন নিবন্ধে বলবার চেষ্টা আছে।

কয়েকটি নিবন্ধ 'দেশ' সাপ্তাহিকে ও 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় কবি শ্রী বিরাম মুখোপাধ্যায় পাণ্ডুলিপি দেখে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। তাঁর চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত হ'ল :

"বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির ডামাডোলের মধ্যে এমন একটি বইয়ের প্রয়োজন ছিলো— আপনি অভাব-অনটন ও তার প্রতিকারের দিকে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন···।"

বিশেষজ্ঞের জ্ঞান না থাকলে প্রতিকারের পথ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখানেই আমাদের মতো মানুষের বিফলতা, এমনকি অনেক মহৎ ব্যক্তিরও।

পরিশেষে উল্লেখ করি শ্রী তপেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও আমাদের কন্যা শ্রীমতী রুচিরার উৎসাহ ও সক্রিয় সাহায্যের কথা, যা না-হলে আমার এই রচনা অসমাপ্ত থাকতো। প্রুফ-সংশোধনের জন্য শ্রীমতী মমতা চাকীকে ধন্যবাদ।

মলয়া গঙ্গোপাধ্যায়

সূচিপত্র

উৎসর্গ

রুচিরা, শর্মিলা, পার্থ ও সন্দীপের

করকমলে

ভূমিকা

নবযুগের ভারতপথিক, ভাবুক, মনীষীবৃন্দের ভাব ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মী ও নায়কবৃন্দের প্রদর্শিত পথে ভারতসমাজ আজ যে-অবস্থায় উপনীত, সেই অবস্থায় আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন খুব বেশি। সমাজের দিক থেকে, ব্যক্তির দিক থেকেও বটে।

ব্যক্তিজীবনের সার্থকতা ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা-নির্ভর। সমাজ-দেশ-কাল-শিক্ষা ও পারিবারিক শিক্ষা নির্ভরশীল মঙ্গল ও শুভবোধের উপর। ব্যক্তির আশাআকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, সামর্থ্য-যোগ্যতা পরিণতি-পরিমিতিবোধ এবং সমাজের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ-শ্রেণীনির্ভর, জাগতিক সুখসমৃদ্ধির ধারণার। একথা স্বতঃই স্পষ্ট হয় যে শৈশব-কৈশোর-যৌবনে পরিবার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি গোষ্ঠী-সমাজ ও প্রতিষ্ঠান বিশেষের শিক্ষা ব্যক্তির মনে নানাজাতীয় ধারণা-ভাবনাবোধের উন্মেষ ঘটায়, তারই উপরে নির্ভর করে ব্যক্তির চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সার্থকতা নিরর্থকতা-বোধ মঙ্গল ও শুভবোধের পরিণতি। কাজেই আত্মসমীক্ষাও ব্যক্তির বোধ-বোধি নির্ভর।

শুধুই দিনযাপনের আনন্দ অথবা তদতিরিক্ত প্রচেষ্টায় নিজেকে ব্যাপ্ত করা, পরিবার-আত্মীয়-গোষ্ঠী-সমাজ-মানবজীবন-জগৎ এইসবের মিলিত সত্তা অনুভব করে আপন-আপন শক্তি-সামর্থ্য-যোগ্যতা বুদ্ধি অনুযায়ী মানবজীবনের দায়দায়িত্ব পালনে প্রবৃত্ত হওয়া। সমাজের সমীক্ষা সমগ্রের দিক থেকে। সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত করি যে সাধারণ মানুষের প্রধান কাম্য জাগতিক জীবনের সচ্ছলতা ও সুখ। অন্তত ভারতীয় তথা বাঙালীজীবনে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' এই কামনাটি ঐকান্তিক। সেই আকাঙ্ক্ষাটি সমাজের সকল-স্তরের মানুষের জীবনে পূরণ হোক, এই যদি স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি লক্ষ্য হয়, তবে সে-লক্ষ্যে অগ্রসর হবার সহায়ক সমমনোভূমি-প্রতিষ্ঠা।

স্বাধীন জাতির সমাজে সমমনোভূমি-প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি জন-শিক্ষায়। শ্রম-সাধনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি যন্ত্র প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার, সংগঠিত পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গণজাগরণের নিমিত্ত উপযোগী শিক্ষাই স্থির লক্ষ্যে উপনীত হবার অন্যতম সহায়ক।

এ-গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলিতে মূলত শিক্ষা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলবার চেষ্টা আছে। আনুষঙ্গিকভাবে আর যা বলা হয়েছে তা বোধ-হয় অনুপযোগী নয় এই সংকলনে। কোন প্রবন্ধই বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে যুক্তি বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে লেখা নয়। তথাপি কিছু চিন্তার খোরাক যোগাতে পারে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সাধারণ মানুষ খুব-একটা যুক্তিতর্ক বিচারের পথ ধরে চলে না। Elitist Intellectualদের মতো hyper critical mind তাদের নয়। নানাদিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে মরিয়া হয়ে কখনো কখনো রুখে দাঁড়ায় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, তারা মেনে নেয়। যে-কোন স্বাধীন দেশেই যখন শাসক ও শোষিতের কোন মনোভাব থাকা অনুচিত, তখনও বিচার বিবেচনা, গভীর চিন্তা সমগ্রসমাজের মঙ্গলার্থে সর্বপ্রকার দায়দায়িত্ব পূর্বকালের মতো একালেও বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর উপরেই বর্তায়। কাজেই যাঁরা ভারপ্রাপ্ত তাঁরা যদি সমগ্র সমাজের দিক থেকে ভেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহলে অধিক সংখ্যকের পক্ষে মঙ্গল হয়।

প্রশ্নটা এখানেই, সমমনোভূমি-প্রতিষ্ঠা যদি গণশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয় কীভাবে সে-উদ্দেশ্য সফল হবে। শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী পাশ্চাত্ত্য ভাবের এবং আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যার শিক্ষা ব্যবস্থাতে আজও পর্যন্ত দেশের পঞ্চাশ ভাগ মানুষও শিক্ষিত হয় নি। শিক্ষিতের-অশিক্ষিতের মানসিক বিভেদ বেড়েই চলেছে। শিক্ষিত বেকার-সমস্যা প্রায় অপ্রতিরোধ্য। এমত অবস্থায় গণশিক্ষা কি এমন হবে যে শিক্ষা লাভ করলেই চাকরীর সন্ধানে যেতে হবে? ব্যক্তি আর নিজের গ্রামে, সমাজে নিজেকে মানাতে পারবে না, রুজির জন্য শহরে ছুটবে, যেমন আজ হয়েছে উচ্চশিক্ষা হলেই দেশের বাইরে ছোটার ব্যাকুলতা?

শিক্ষা মানে কি শুধু অর্থ রোজগার, ব্যক্তি ও পরিবারের ভরণ-

পোষণ করার উপায় শিক্ষাই একান্ত, বৈষয়িক ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসই যথেষ্ট? সমাজ জীবন ও জগতের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যক্তির কি জানা প্রয়োজন নয়? দেশের সমাজের বিশ্বের মানুষের মনে কতগুলি সমভাব-ভাবনার উদ্বোধন ঘটানোর উপযোগী জ্ঞান দান কি শিক্ষা নয়? পারস্পরিক কর্তব্যবোধ দায়দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়ে ওঠা ও তা জাতীয় স্বভাবে পরিণত করার শিক্ষাই কি সমমনোভূমি-প্রতিষ্ঠার উপযোগী প্রস্তুতি নয়?

যে আত্মীয় বুদ্ধি দয়া দাক্ষিণ্য স্বল্পপরিসর গোষ্ঠী সমাজে কৃষিনির্ভর গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে ব্যাপৃত ছিলো আজ আর তা যথেষ্ট নয়। যন্ত্র ও নগরসভ্যতার জীবনে ব্যক্তিকে স্বতোপ্রবৃত্ত হয়ে যেমন ব্যক্তি সমাজ রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্ক বুঝে নিতে হবে, তেমনি যার যা দায়িত্ব সমাজ সেবার মনোভাব নিয়ে পালন করবার যোগ্যতাও চাই।

এই দুটি ভাবই সমাজ-মনে ব্যাপক ও দৃঢ় হতে পারে সেই শিক্ষায় যা দেশ-কালের ঐতিহাসিক বিচারের সূত্রে শ্রেণীবিশেষের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির প্রসারতা ঘটায়, স্বার্থবোধ ও বস্তু উপকরণ বাহুল্যের ঝোঁক থেকে মনকে সংযত করে, এবং হিংসা বিদ্বেষ সংঘাত অসহিষ্ণুতা অথবা নিঃশর্ত আনুগত্য এ-দুয়ের প্রকট উত্তেজনা পরিহার করে স্বার্থ ও প্রয়োজন সিদ্ধির অতিরিক্তভাবে মানবজীবনের মূল্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেয়।

বিশেষ বিশেষ ধর্মের আশ্রয়ে মানুষের মনে নীতিবোধ উপ্ত হয়, কিন্তু গোষ্ঠী সম্প্রদায় অতিক্রমকারী মানসিক প্রসারতা লাভের জন্য আচার নিয়ম-পালন উৎসব-পালনই যথেষ্ট নয়। শৈশব-কৈশোর-যৌবনে নিয়ম শৃঙ্খলা উৎসব পালন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মূল সত্যের অনুসন্ধান-প্রতীতি জাগানোর দায়িত্বও সমাজের। ব্যক্তি-প্রচেষ্টা সব ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান, আর্থিক উন্নয়ন, সমস্যা সমাধানের মতো শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব আজ রাষ্ট্রের। গণশিক্ষা যদি ধর্মবোধ অর্থাৎ ধর্মবিষয়ক নীতি ও চরিত্রগঠন বিষয়ক শিক্ষা বিযুক্ত হয়, স্বাভাবিকভাবেই তা একদেশদর্শী, অসম্পূর্ণ, সমগ্র সমাজবোধ ও সংহতি সংস্কৃতি প্রসারে অসমর্থ। কেননা, ধর্মবোধ মানব মনের একটি গভীর চেতনা।

এযুগে 'ধর্ম' সম্বন্ধে একপ্রকার অনীহা সোচ্চার, অথচ বিশ্বজনীন

সত্য আবিষ্কারই মানব-প্রগতির মূল। ধর্ম বলতে কি বোঝায়— ধর্মের ব্যাখ্যা ও নবমূল্যায়নের সত্য জনমনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, অজ্ঞতা নয়,— সমমনোভূমি-প্রস্তুতির প্রথম সোপান। ধর্মের সংজ্ঞা কি? দেশকাল-নিরপেক্ষ মানবতাবোধ ও ধর্মবোধের বৈশিষ্ট্য কি? পার্থক্য কোথায়? জাগতিক জীবনের সুখসমৃদ্ধি বা দুঃখদুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম মানুষকে কী দিতে পারে? উপাস্য-উপাসকের নিগূঢ়তা কি সহজে জন্মায়? সমবেত উপাসনা, পূজা আরতি মন্দির মসজিদ গীর্জায় সশ্রদ্ধ প্রণতি ছাড়া আর কিছু কি বুঝি না? বর্তমান যুগে মানুষের সার্থকতা নিরর্থকতা-বোধের ভিত্তি কি? কোন্ মহৎ প্রাপ্তি, আশ্বাস আশা ধর্ম মানুষের মনে সঞ্জীবিত করে? আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি-শিক্ষানীতি-ধর্ম নিরপেক্ষভাবে কতটা অসম্পূর্ণ পৃথিবীব্যাপী মানবসমাজের জটিল সমস্যায় প্রমাণিত হয় কি না? এই বহুবিধ প্রশ্নের সদ্‌উত্তরেই এ যুগে নবমূল্যায়ন বলে আমার বিশ্বাস। যুক্তির নিরিখে বিচার করে এ যুগের চিন্তা গ্রহণে বর্জনে অভ্যস্ত। সহজবোধ্যভাবে জনসাধারণে সমাজের সর্বস্তরে ভাব-ভাবনা পৌঁছে দেওয়াই গণশিক্ষায় মুখ্য।

প্রবহমান জীবনের ধারায় ব্যক্তির স্বল্প পরিসর জীবনটা প্রকৃতি ও সমাজ-সংস্কৃতি পরিবেশ পরিস্থিতির সমবায়ে ঘটমান, মানসিকতা সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণে পরিপুষ্ট। ব্যক্তিজীবন নানা জাতীয় অবস্থার প্রভাবাধীন। ব্যক্তিবাদী যে শিক্ষা পুঁজিবাদী বণিক অর্থনীতির সহযোগিতার প্রভাব এড়িয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজের মনোভূমিতে যদি সমতাবোধ জাগাতে হয় ধর্মবিশ্বাসী ভারতীয়ের বিশ্বাস প্রণত মনোভাবটি প্রতিকূল ভাবের তাড়নায় উৎসাদিত করা মারাত্মক ভুল হবে। যান্ত্রিক আবিষ্কারে অগ্রবর্তী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আপাত প্রাচুর্যের অন্তরালে ধ্বংসের পরোয়ানা পৌঁচেছে। পশ্চাৎপদ দেশ-গুলিতে সমাজের সর্বস্তরে অভাব দুঃখ পীড়া অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগান্তি দূর করবার সৎ সংকল্পে অটুট থেকে নতুন অর্থনৈতিক আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সমাজের ভুলেরও আমদানী করা যুক্তিযুক্ত নয়। আবার সমাজবাদী দেশের অনুকরণেই আমাদের সমাজে সার্বিক উন্নতি হবে এমনও মনে হয় না। বস্তুত ব্যক্তির সন্তোষ, সহযোগিতা, পরস্পর সমত্ব অনুভবের উপযোগী স্বদেশীয় ধ্যান-ধারণাগুলি জীবনকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শেখায়— তার ফলেই ধনতান্ত্রিক

শিক্ষার নিগূঢ় বন্ধন অনেকটা শিথিল হতে পারে। ব্যক্তির মনে, সমগ্র সমাজের মনোভূমিতে বিবেক চৈতন্যের উদয় হলে তবেই প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ অর্থবিত্তে স্পৃহা কমতে পারে। সম্পদ পুঞ্জী-ভূতকরণ সর্বশক্তি নিয়োগে সম্পদ আহরণের অপেক্ষা এই স্বল্প-পরিসর জীবন শ্রমে সাধনায় কর্মে দানে প্রতিদানে যাপন করে যাওয়াই শ্রেয় এমন বোধ জাগতে পারে। তার ফলেই সম্ভবত প্রয়োজন বাহুল্য, উপকরণ বাহুল্যে সংযম আসে। যার অনেক আছে সে স্বেচ্ছায় ছাড়তে পারে। যার নেই তাকে দিয়ে আপনাকে ধন্য মানে। একপক্ষে লোভ শক্তি অপরপক্ষে ক্রোধ দাবী বলাধিকার; ফলত বিদ্বেষ, এ-ইতিহাস এমন প্রকট যে সে-পথে আস্থা রাখাই মারাত্মক ভুল। অবস্থা সাম্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের অনুকূল শিক্ষাদান আবশ্যক।

"...ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ।" (গীতা ৩-১৩) "যে পাপাচারগণ কেবল নিজের জন্য অন্নপাক করে, তাহারা পাপান্ন ভোজন করে।" এ-বাণী ভারতবর্ষের। আমাদের পক্ষে পশ্চিমদুনিয়ার বাণী অপেক্ষা এইসকল মহৎ বাণীর ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত সত্য হৃদয়ঙ্গম সহজতর হবে।

কোন কূটতর্কে প্রবৃত্ত না হয়ে শিক্ষার সাধারণ অর্থটি ধরা হয়েছে —বিশেষ দেশ-কালের একটি মানবগোষ্ঠীর চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা, চলমান জীবনের প্রয়োজন ও সমৃদ্ধির ধারণা ইত্যাদি পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত করা, মাণবকদের উদ্বুদ্ধ করা জ্ঞাত করার বিষয় এবং পদ্ধতির সম্মিলিত রূপ। কিছু আধুনিক সংবাদ পরিবেশন ও জীবিকার্জনের বিষয় শিক্ষা— খর্ব, একদেশদর্শী রূপ বলে মনে হয়েছে, বিশেষত জনগণের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাপারে। বাল্যকাল কৈশোর ও কৈশোরত্তীর্ণ বয়ঃসন্ধির কাল পর্যন্ত মনোবিকাশও চরিত্র গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় চিন্তা, বহুযুগের ধ্যান-ধারণাগুলির নির্ণীত সত্য হৃদয়ঙ্গমের প্রয়াস যদি শিক্ষায় প্রাধান্য পায় আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সাধারণের মনে সমভাবের উন্মেষ হতে পারে— যা সমাজের অপরাপর উন্নয়ন ও পরিবর্তনের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

শিক্ষাপ্রসঙ্গে

সব দেশে সব সমাজেই দেখা যায় ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক গঠন-সাযুজ্য অনুযায়ী ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, পেশা, বিশেষ বিষয়ে অনুরাগ অনুসন্ধিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সেই ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠতে সহায়তা করে, একথা অবশ্য স্বীকার্য। আবার এই ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, পেশা শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির অসমতা বা ভিন্নতা সত্ত্বেও দেশ ও সমাজগত একটি ঐক্যবোধ অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্রেই বিদ্যমান। এই মনোভাব রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় সংহতির অনুকূল। অধিকাংশ পাশ্চাত্ত্য প্রগতিশীল সমাজ-মানসে যে যৌথ দায়িত্ববোধের পরিণতি লক্ষ করা যায়, সংঘবদ্ধভাবে পরস্পর সহযোগীভাবে কাজ করার বুদ্ধি দেখা যায় তার মূলে এই মনোভাব ক্রিয়াশীল। আত্মস্বার্থরক্ষা, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা জীব-স্বভাবের মূল উপাদান বটে কিন্তু তদতিরিক্ত সমাজ সচেতনতাও মানব-স্বভাবের আর-একটি মৌলিক উপাদান। সমগ্র সমাজবোধই একটি জাতিকে বাস্তব সমৃদ্ধির একমুখী লক্ষ্যে অগ্রসর করে। সমাজে ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতা, সুস্থ পরিবেশ ও উপযুক্ত শিক্ষা। পরিবেশের প্রভাবে, শিক্ষার প্রভাবে মানুষের ভালোভাবে বাঁচবার আগ্রহ জন্মায়। সুতরাং শিক্ষা ও পরিবেশের উপর ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে, অবশ্য আর্থিক শক্তি-সামর্থ্য তার রুচি ও ইচ্ছা পূরণে সহায়ক।

এই সমালোচনার যথাস্থানে শিক্ষাপ্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা আছে, দ্বিতীয় পর্বে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। ভারতবর্ষের আধুনিক শিক্ষার বনিয়াদ যদিচ মূলত পাশ্চাত্ত্যের মতোই সংশয় ও বিশ্লেষণবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত তথাপি শতাব্দীকালের অধিক সেই শিক্ষা-আদর্শ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও বিশ্লেষণী শক্তির পরিণত পরিচয় ব্যাপকভাবে শিক্ষিতের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ-শিক্ষা ব্যাপক জন-শিক্ষায় পর্যবসিত হয় নি। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বহুবিধ কারণে

ভারত-সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে ; বিজ্ঞানের অগ্রগতি, প্রসার-প্রয়োগ পাশ্চাত্ত্য সমাজের মতো হয় নি।

ইতিহাস-গতির নির্দেশে সমাজে বহু পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয়— জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক শিক্ষার ফলশ্রুতি হিসাবে শিক্ষিতের মনে ব্যক্তিবাদ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ হয়েছে স্পষ্টতর। সমাজে বিবদমান পরস্পর-বিরোধীভাব ও শক্তির ক্রিয়া ও গতি ঠিক নির্ণয় করা যাচ্ছে না। বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী শহর এলাকায় ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ, দৈনন্দিন জীবনের নানা অসুবিধা ইত্যাদি সহ্য করেও শহরেই ভিড় করে থাকে ; দিনে দিনে গ্রাম ও শহরের দূরত্ব, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের শ্রেণীভেদ প্রকট হয়। মোটা রেখায় ভাগ করা যায় স্বাক্ষর ও স্বাক্ষরহীন দুটি শ্রেণী। শিক্ষিত বা স্বাক্ষরদের মধ্যেও উচ্চ-নীচ ভেদ আছে শিক্ষার তারতম্যে, অর্থ-সামর্থ্য ও সমাজ-প্রতিষ্ঠার মাপকাঠিতে, যোগ্যতা সফলতা-বিফলতার পরিপ্রেক্ষিতে।

গ্রামে চাষ-আবাদের কাজে, শহরে নানা ধরনের নিম্নমানের কাজে, কায়িক শ্রমের কাজে, শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকের কাজে লেখাপড়া জানার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, বরং বিদ্যালয়ের পাঠ নিলে চাষীর ছেলে, শ্রমিকের ছেলে, মুচি-মেথরের ছেলে আর পৈত্রিক বৃত্তি গ্রহণ করবার মতো মনের সায় পায় না। ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই স্বাক্ষরহীন নিম্নমানের জীবনযাত্রা নির্বাহকারী। এই জনগণ আধুনিক শিক্ষায় বঞ্চিত। এই জনজীবনের সার্বিক উন্নতি ভারতসমাজ উন্নয়নের প্রথম সোপান।

যে-শিক্ষা আমাদের সমাজে মাত্র মুষ্টিমেয়কেই সমৃদ্ধি দিতে পারে, যে-শিক্ষার কিঞ্চিৎ প্রসারে ভয়াবহ বেকারসমস্যা দেখা দেয় সেই শিক্ষা কি হুবহু এই জনগণের জন্য প্রসারিত হওয়া যুক্তিসঙ্গত ? স্বতই দুটি জিজ্ঞাসা প্রধান হয়ে ওঠে— জনগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হবে ? যে-শিক্ষাধারা দেশে প্রচলিত আছে সেই গতানুগতিক ব্যবস্থা কতদূর উপযোগী ?

প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে নূতন কথা অবতারণার বিশেষ কিছু নেই, সেই বহুকথিত পুরাতন কথারই পুনরাবৃত্তি করে বলতে হয়— মনুষ্যত্বের

দীক্ষাই হবে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। আর শিক্ষা যেন ভালোভাবে বাঁচবার আগ্রহকে জন্ম দেয়, বুদ্ধিকে প্রখর করে, সমাজবোধের ধারণা দেয়, বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ-বর্জনের শক্তি দেয়, সর্বোপরি যেন জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বাস্তব দৃষ্টি দেয় শিক্ষার্থীকে।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটির উত্তরে সর্বপ্রথম মনে হয় আরও কিছু প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হলে অর্থাৎ উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেই কি উদ্দেশ্য সফল হবে? অথচ বিদ্যালয়-স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য, কারণ, আধুনিক যুগের প্রয়োজন উপযোগী শিক্ষা আজকের যুগে বিদ্যালয়ের মতো সামাজিক প্রতিষ্ঠানই জোগাতে পারে। গ্রাম-সমাজে হোক, শহরের সমাজে বা শিল্পাঞ্চলে হোক, শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিই সমাজের যোগ্য কেন্দ্র, ভবিষ্যৎ সমাজ-মানসিকতা গঠনের ও কর্মজীবনের উপযোগী শিক্ষাদানের ভিত্তিভূমি। সুতরাং প্রতি গ্রামে প্রতি শহরে বিভিন্ন মহল্লায় যেখানে প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভাব আছে সেখানেই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন। এইসব বিদ্যালয়ে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ হবে বলেও মনে হয়।

জনশিক্ষার প্রসারকল্পে এমন একটি শিক্ষাক্রম প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক যাতে অন্তত দুটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে—

১। জীবনের মূল্যবোধ, সমাজবোধ, সমাজ-সংহতি আত্মস্বার্থ ও সমাজস্বার্থের স্বরূপ, সামাজিক দায়িত্ববোধ।

২। শ্রমনিষ্ঠা, কোন একটি বৃত্তি শিক্ষা, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান উপযুক্ত-ভাবে স্ব-স্ব বৃত্তিতে প্রয়োগের ক্ষমতা-লাভ।

উল্লিখিত দুটি দিকে বিশেষ নজর রেখে একটি কার্যকরী শিক্ষাক্রম প্রস্তুত করা সম্ভব হলে এই শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্তেরা শহরে গিয়ে ভিড় বাড়িয়ে উত্তরোত্তর বেকারসমস্যা বৃদ্ধি করবে না বলেই আশা হয়, অথচ এই শিক্ষা জনমানসে পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জীবনদৃষ্টির উদ্বোধন সম্ভব করতে পারে।

সমাজের বর্তমান পরিস্থিতিকে বিশদভাবে বুঝবার চেষ্টা করা যাক। শতাব্দীকালের অধিক আধুনিক শিক্ষা প্রচলিত থাকলেও—ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদির বিভিন্নতা হেতু গণ্ডিবদ্ধ মনোভাব শিক্ষিত শ্রেণী আজও এড়াতে পারে নি। বর্তমানের অর্থনৈতিক নৈরাশ্য, উত্তরোত্তর বেকারসমস্যা, সামঞ্জস্য ও সংহতির পরিপন্থী

মনোভাবকেই দানা বেঁধে উঠতে সহায়তা করছে।

যেসব অঞ্চলে শিক্ষার প্রসার অধিক কিন্তু অর্থনৈতিক সমস্যা গুরুতর সেইসব অঞ্চলে সমাজে অস্থিরতাও অধিক, রাজনৈতিক সাময়িক ক্ষণিক বিস্ফোরণও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অথচ এই অস্থিরতা কোন স্থায়ী সমাধানের নির্দেশ করে বলে মনে হয় না। মানবসমাজে কোন স্থায়ী কল্যাণের পশ্চাতে থাকে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ; বহু মানুষের চিন্তা ও কর্মের সমবায়ে সেই কল্যাণ সম্ভব হয়। কোনপ্রকার ভয়-ভীতি, খুন-খারাপি, জবরদস্তি, ব্যক্তিবিশেষের নিগ্রহ শাস্তিবিধান বা সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করে সাময়িক পরিবর্তন ঘটতে পারে কিন্তু সে-প্রভাব স্থায়ী হয় না। শিক্ষার প্রভাবই সমাজ মনে স্থায়ী ও দৃঢ়মূল হতে পারে বলে বিশ্বাস হয়। জীবন ও জগতের প্রতি বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ উপযোগী শিক্ষাই বোধহয় জাতীয় চরিত্র গঠনের একটি প্রধান উপাদান।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকারের অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গি অবিবেচনাপ্রসূত নীতি ও কর্মপদ্ধতির দরুন সমাজে কী দুঃখ-দারিদ্র্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কী ধরনের সামাজিক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে এবং কী ধরনের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ঘটতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ। সমস্যা অত্যন্ত জটিল। এই জটিল পরিস্থিতির পশ্চাতে আনুষঙ্গিকভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ-নীতির নানা কার্যকারণ জড়িত, বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতায় আসীন অবস্থা, সরকারী শাসন-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব ইত্যাদি অনেক-কিছুই জড়িত।

আজকের দিনে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, এককথায় একটি দেশ বিশ্বের অপরাপর সকল দেশের সঙ্গে যুক্ত, আজ আর বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্ট হয়ে আন্তর্জাতিক সবরকম ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা কোন সভ্য দেশের পক্ষেই কঠিন। তথাপি দেশের অভ্যন্তরীণ অনেক বিষয়ের ব্যাপক পরিবর্তন পরিবর্ধন, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও সফলতা অপরাপর দেশ-নিরপেক্ষ।

যদিও বহুবিধ প্ল্যানিং-এর দুর্বলতা আর্থিক অনুন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ, উপযুক্তভাবে কার্যে পরিণতির অভাব নানা প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার কারণ, তথাপি একথা অবশ্য স্বীকার্য যে ভারতবর্ষের আর্থিক অনুন্নতি ও

নানা প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার বহুতর কারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষার অভাব, জাতীয় সংহতির অভাব ও ব্যক্তি তথা জাতির বনিয়াদের দুর্বলতাও অন্যতম।

বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন সচেতন সামাজিক সমাজের পরিস্থিতি ও গতিবিধি অনুধাবন করতে পারে এবং শিক্ষানীতির প্রভাবে কীভাবে সমাজজীবনের ধারা বদ্‌লে যায় তাও খানিকটা বুঝতে পারে। তাই স্বাভাবিকভাবেই কতগুলি প্রশ্ন সোচ্চার হয়ে ওঠে : যদি সারা ভারতে মাত্র তিরিশ ভাগ লোক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় এবং নানা বৃত্তিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে থাকে তবে এই তিরিশ ভাগের মধ্যেও ভয়াবহ বেকারসমস্যা কেন? যদি শতকরা সত্তর-আশি ভাগ লোকের গ্রামেই বাস এবং অধিকাংশেরই জীবিকা নির্বাহ হয় কৃষিকে কেন্দ্র করে তবে সেই ভূমি ও কৃষি উন্নয়ন সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পায় না কেন? স্বাস্থ্য-চিকিৎসা, খাদ্য-পানীয় জলের সুব্যবস্থা, বাসস্থান, শিক্ষা —যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপত্তার ব্যবস্থা এককথায় জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনের সুব্যবস্থা গ্রামে করা হয় না কেন? গ্রামের কোনরকম গুরুত্ব না দিয়ে সারা দেশের উন্নয়ন কেমনভাবে সম্ভব হতে পারে? স্বাধীন একটি দেশে সরকার কি এমন দায়িত্ব বোধ করে না যাতে সে-দেশের প্রতিটি মানুষ খেয়ে-পরে সচ্ছলভাবে বাঁচে তার ব্যবস্থা হয়? এমন শিক্ষার ব্যবস্থা কি করা যায় না যাতে আগামী দিনের নাগরিক তরুণ সমাজ গড়ে-পিটে মানুষ হবার দীক্ষা পায়, মাঠেঘাটে, শিল্পসংস্থায়, নানাবিধ কর্মে জীবনের সর্বক্ষেত্রে উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে স্ব-স্ব অধীত বিদ্যা কাজে খাটিয়ে তৃপ্তি পায় ও সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধি ঘটায়?

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কথাই ধরা যাক। তাদের উপরেই দেশ ও সমাজের একটা ভরসা থাকে যে, তারাই নেতৃত্ব দেবে, সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের পথ আবিষ্কার করবে, সমগ্র সমাজকে আশা ও আশ্বাসের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সমর্থ হবে। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তা, চেতনা ও শক্তির উপর সমাজের গভীর আস্থা। অথচ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করতে হয় সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অধিকাংশের মধ্যে আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিবাদ ও আঞ্চলিকতা বোধের উগ্রতা ; গা বাঁচিয়ে চলা ঔদাসীন্য, পলায়নীবৃত্তিসুলভ এক অদ্ভুত মনোভাব। বহু জ্ঞানীগুণী, দক্ষ কারিগর, উচ্চশিক্ষিত বিশেষ-বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পাশ্চাত্ত্য ধনী

সমাজে ঠাঁই পাবার প্রাণপাত প্রচেষ্টা।

লুব্ধ ক্ষুব্ধ এক ভাব মধ্যবিত্তের মানসিকতায়। সমগ্র সমাজে সেই গতানুগতিকরা, কখনো-বা এখানে ওখানে সাময়িক বিস্ফোরণ অস্থিরতা। একটু দূর থেকে দেখে স্বতই মনে হয় কোথাও একটা বড়-রকমের গলদ আছে। নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তি মানুষ সদা সচেতন, সেটা জীব মাত্রেরই স্বভাব। কিন্তু মানুষ আবার সমাজ-সচেতনও বটে। শিশুমনে সমাজবোধের ধারণা উপ্ত হলে কালে তা পরিণতি লাভ করতে পারে।

দুই

সামাজিকের দেহ ও মন দুয়ের পুষ্টিসাধনে উপযুক্ত খাদ্যপানীয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক সুস্থ অবস্থা, শিক্ষা ও সমাজ পরিবেশের প্রভাব সমধিক। স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে অধিকাংশ শিক্ষিতের মধ্যে কতটা প্রত্যয় জাগে বা কী ধরনের প্রতীতি জন্মায় অর্থাৎ ব্যক্তি-পরিচয়ে সমাজজীবনে চিহ্নিত হয় সেদিকে দৃষ্টিপাত করার চেষ্টা করা যাক।

ক। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ সমাপ্ত করেও অনেকে জীবনে আর্থিক সফলতা অর্জন করতে পারে না। উপযুক্ত কাজ খুঁজে পায় না।

খ। বিভিন্ন লব্ধবিদ্যা উপযুক্তভাবে কর্মক্ষেত্রে বাস্তবে প্রয়োগের বুদ্ধি অল্পসংখ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

গ। অধিকাংশের মধ্যেই পরিবারের বা বন্ধু-পরিসরের সীমা অতিক্রম করে যে সমাজ যে বোধ, সমগ্র ভারত সমাজবোধ স্পষ্ট নয়।

ঘ। এমন ঔদার্য অল্পসংখ্যকের মধ্যেই মেলে যাদের বর্ণ-শ্রেণী-সংস্কার ইত্যাদি থেকে মুক্ত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ঙ। অধিকাংশই কোন বিষয়ে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে ততটা উৎসাহ পায় না যতটা পায় একটি নির্বিবাদী দায়িত্বহীন অল্প আয়াসের চাকুরী করতে।

চ। মুষ্টিমেয়ের মধ্যেই নিবিষ্ট চিন্তা অধ্যয়ন— গভীর অনুসন্ধিৎসা সীমাবদ্ধ থাকে।

ছ। অধিকাংশের মধ্যেই অল্প আয়াসে লাভের প্রবণতা অধিক লক্ষ করা যায়।

জ। শ্রমসাধ্য বৃত্তির প্রতি (কায়িক শ্রমের) সাধারণভাবেই শিক্ষিতের মনে এক ধরনের বিরাগ জন্মায়।

ঝ। বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ-বর্জনের শক্তি, অভিনিবেশ সহকারে কিছু বুঝবার চেষ্টা, গভীর কৌতূহল উদ্যম ও শ্রমনিষ্ঠা অল্প-সংখ্যকের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। পরিচ্ছন্ন যুক্তি, শৃঙ্খলাবোধ ও পারিপাট্য অল্পসংখ্যকের মধ্যেই দেখা যায়।

উপরিউক্ত মনোভাব, অসাফল্য, নিষ্ক্রিয়তা ইত্যাদি ব্যক্তির স্ব-স্ব সামর্থ্য, বুদ্ধির উপর মূলত নির্ভর করে সত্য। কিন্তু সমাজ পরিবেশ ও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ব্যক্তির সফলতা-ব্যর্থতা, জীবনের মূল্য-বোধ গঠনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি দেশ-প্রচলিত শিক্ষা ব্যক্তির আত্মিক বিকাশ ও ঐহিক সমৃদ্ধিলাভে মদৎ দেয়। শেষোক্ত, শিক্ষাপ্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই আলোচনার উদ্দেশ্য। পরিশেষে গ্রাম-উন্নয়ন তথা শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য পেশ করব।

প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা স্বাধীনতা পরবর্তী তিরিশ বছরে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সমাজ মানসিকতা পরিবর্তনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধিই কি যথেষ্ট? শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষার পদ্ধতি ও লক্ষ্যের গুরুত্ব কি সমধিক নয়!

মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদির পাঠক্রম দেখলে বোঝা যায় যে, এই পর্যায়ের শিক্ষাতে বিষয়-শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, সামগ্রিক জীবনবোধের যাতে উন্মেষ হয় এমন শিক্ষার উপর নয়। অর্থাৎ নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরণের জন্য তৈরি হয়। সেদিকে নজর রেখেই পাঠক্রম, শিক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষার ব্যবস্থা। মননের দিকে যতটা লক্ষ প্রয়োগ, প্রযুক্তির দিকে ততটা নয়। অথচ একে অপরের পরিপূরক। দুয়ের দ্বন্দ্ব মিলনেই সমাজের বাস্তব সমৃদ্ধি সম্ভব। মনে হয় এইখানেই কিছু রদবদলের প্রয়োজন। ভার এক-ঝোঁকা হওয়াতে অধিকাংশের জীবনে বিদ্যালয়ের পাঠ আর জীবন যেন দুই প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়ে থাকে, মেলে না। ফলে আত্মপ্রত্যয়হীন ব্যর্থ,

নিষ্ক্রিয়, হীনমন্য-ভাব জাগে ব্যক্তির মনে তারই প্রতিক্রিয়ায় সমাজ-মানস তথা সমাজ-জীবন একটা নির্জীব গতানুগতিকতার চক্রে আবর্তিত হতে থাকে।

আমার মনে হয় মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক বা কলেজ পর্যায়ে সর্বভারতীয় শিক্ষানীতিতে 'বিষয় শিক্ষা, জীবনকেন্দ্রিকতা ও আত্ম উন্নতি' এই তিন লক্ষ্যের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। শিক্ষার লক্ষ্য শুধু সংবাদ সংগ্রহে পর্যবসিত হলে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ বিকাশ ও বাস্তব বুদ্ধির স্বতস্ফূরণ ব্যাহত হয় বলেই মনে হয়। এখানে স্মরণ রাখতে হবে সাধারণ জনসমাজের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই মন্তব্য, সহজাত প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ধীমান শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নয়। এই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশ স্বাভাবিকভাবেই হয় এবং চেষ্টায় যোগ্যতর তারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়।

শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি প্রাথমিক-মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন ভাষা, শ্রেণী (সরকারী, বেসরকারী, ধর্মীয়) নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়, পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতিতে সমতা থাকে, যদি গ্রন্থ নির্বাচন, পাঠক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি এমন হয় যাতে উপরিউক্ত তিনটি লক্ষ্যের সামঞ্জস্য থাকে তাহলে সমগ্র সমাজে ধীরে ধীরে কতগুলি স্থায়ী মূল্যবোধ জাগতে পারে। বাস্তব জীবন-উপযোগী, সমাজ অবস্থা অনুযায়ী শিক্ষাদানের যেমন প্রয়োজন তেমনি শিক্ষার্থীর মানসিকশক্তি, বুদ্ধি স্ব-স্ব ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ থাকা চাই।

অতীত ইতিহাসের নজীরে এবং সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীতেও দেখা যায় সমাজে যারা ধনসম্পদের অধিকারী, ক্ষমতা শাসনভার যাদের হাতে, যাদের প্রখর বুদ্ধি, তারা ছলে বলে কৌশলে নানা ফন্দি-ফিকিরে অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা করে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ-বিলাস আরাম ইত্যাদি ঐহিক সমৃদ্ধি তারা একচেটিয়া রাখতে চায়। আবার একশ্রেণীর মানুষেরা চিরকালই দুঃস্থ বঞ্চিত জনগণের জন্য মধ্যস্থতা করে, আর ধর্মপ্রবক্তা মনীষী মহাপুরুষেরা সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণে ত্যাগ, তিতিক্ষা ঔদার্য করুণা তথা মনুষ্যত্বের দীক্ষা দেন। আধুনিক যুগে কোথাও কোথাও বঞ্চিত মানুষেরা আদায় করেছে তাদের অধিকার, দুঃসাধ্য চেষ্টা ও নিয়ত পরিশ্রমে জনজীবনের মান উন্নয়ন ও বাস্তব সমৃদ্ধি সাধনে রত তারা।

এই জবরদস্তি আর ছলকৌশলের মধ্যবর্তী সুস্থ পন্থা অবলম্বনের প্রধান উপায় সম্ভবত এমন শিক্ষাদান যাতে একদিকে জনমনে সুস্থ হয়ে বাঁচবার চেতনা জাগে, বস্তু চাহিদা সঙ্কোচের স্পৃহা হয়, শ্রমনিষ্ঠা জাগে ও মনুষ্যত্বের দীক্ষা হয়। অপরদিকে জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি স্থির সত্য দৃষ্টি জাগে। এই সকল দিকে দৃষ্টি রেখে চিন্তাশীল শিক্ষাবিদগণ একটি সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে পারেন। সমাজ-সচেতন অভিজ্ঞ শিক্ষক ও সজাগ গ্রন্থকার একযোগে সেই শিক্ষানীতিকে কার্যে পরিণত করে জাতির জীবন সফল করে তুলতে পারেন।

পাঠদান-পদ্ধতির পরিবর্তনে মনে হয় নিম্নোক্ত উপায়ে পাঠদান ফলপ্রসূ হতে পারে।

ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, ভাষাশিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান ইত্যাদির পাঠে শুধু পরীক্ষা পাসই মুখ্য না করে বাস্তবজীবনের নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের সঙ্গে যোগ কোথায়, প্রয়োগের ক্ষেত্র কি বা কোনখানে তার আলোচনা সূত্রে বিশেষ-বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে। নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও নানা ধরনের বই, পত্রপত্রিকা এবং দৈনিক সংবাদপত্র থেকে অসংখ্য বিচিত্র জীবনচিত্র তুলে ধরা যায়। বিমূর্ত ভাব-মূলক পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে অস্তিবাচক বিদ্যা ও প্রয়োগ-পদ্ধতি এই পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের পরিচয়মূলক বিষয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। কার্যব্যপদেশে অন্যত্র না গেলে বা ভ্রমণের সুযোগ না হলে বা বিশেষ ঔৎসুক্য না থাকলে কৈশোরে যৌবনে এক অঞ্চলের অধিবাসী অপর অঞ্চলের অধিবাসীর সম্বন্ধে আর কতটুকু সংবাদ রাখে? অথচ এক অঞ্চলের সমাজজীবনযাত্রাপদ্ধতি, শিক্ষাসংস্কৃতি, আচারব্যবহার, ব্যক্তি-বিশেষের জীবন ও কর্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের অবহিত থাকা দরকার। পরিচয়ের পরিধি বিস্তৃত হলে সমাজবোধের ধারণা জাগতে পারে।

সমাজের উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেরই জীবনের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি যে সমান এবং সকলেরই যে সুস্থভাবে বাঁচবার অধিকার আছে এই সমতার শিক্ষাই শিশু ও কিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করতে পারে। এই সমত্ব-

বোধের ফলে পাশ্চাত্ত্য সমাজে জনজীবনের মান উন্নত। বিদ্যালয়ে নিয়মিত মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীদের পোশাক-পরিচ্ছদের সমতা থাকাও একান্ত বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে শ্রমিকের কাজে বেতন কম, চাষীর কাজে বা অন্যান্য কায়িকশ্রমে যে-ধরনের খাটুনি বিনিময়ে উপার্জন এত কম যে জীবনধারণ করাই সমস্যা—সেসব কাজের সামাজিক মান নেই আমাদের দেশে। কোন কাজই যে ছোট নয় সে-বোধ তখনি জাগবে যখন নিচুতলার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। একদিকে উচ্চ গবেষণা কেন্দ্রে লব্ধজ্ঞান চাষীর কাজে, জেলের কাজে, অন্যান্য কায়িক-শ্রম লাঘব করবার কাজে ও উৎপাদন বৃদ্ধি করবার কাজে যদি লাগানো যায় এবং নানাপ্রকার বৃত্তিমূলক কাজ বিদ্যালয়পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত হয় তাহলে সেগুলি চিরাচরিত কুলকর্মের আওতা থেকে সমাজকর্মের রূপ পায়। ফলে সমাজ মানসিকতা ধীরে ধীরে বদলায়। জীবনমানের উন্নতি না হলে সমাজে শ্রেণীভেদের দূরত্ব কমে না। সমাজ-মানসে প্রস্তুতি না থাকলে পরিবার পরিকল্পনাই হোক বা ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণ হোক কোন প্রকল্প সফল হতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ জমিদারী উচ্ছেদ আইন ধরা যাক। এই আইন চালু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ খৃস্টাব্দে। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারদের মধ্যে বহুজনই সর্বস্ব হারিয়েছে। প্রতিশ্রুতি ছিলো কৃষকের উন্নতি হবে, হয় নি কেন? জমিদারী উচ্ছেদের পর গ্রামে দলবাজ, মামলাবাজ, ফন্দিবাজ ধূর্তলোকের আমদানি ও নষ্টামী বেড়েছে বই কমে নি, আর জেলা শহর-গুলির সেটল্‌মেণ্ট দপ্তরগুলি এক-একটি দুর্নীতির আখড়া। অথচ মধ্য-স্বত্বভোগী জমিদারেরা সকলেই দাম্ভিক, অত্যাচারী, মদ্যপ, নারীনিগ্রহ-কারী ছিলো না। অনেকে সৎ ছিলো। প্রজাবর্গের আত্মিক উন্নতির বিধিব্যবস্থা বিশেষ না করলেও, খোঁজ নিলে দেখা যাবে অনেকেই সমাজ হিতৈষণার পরিচয় দিয়েছে। তাদের প্রভাবে গ্রামে স্বস্তি ছিলো খানিকটা, হিন্দু-মুসলমান প্রজায় বিবাদ ছিলো কম। শহরেই বিরোধ ও বিবাদের সূচনা অনেকক্ষেত্রে। ইতিহাসের মাটি খুঁড়লে দেখা যাবে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ থেকেই বিরোধ ও বিবাদের প্ররোচনা এসেছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ নেওয়া যাক—জনস্বাস্থ্য। বিভিন্ন সরকারী

বেসরকারী আপিসে, রেলস্টেশনে, হাসপাতালে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাধারণ শৌচাগারগুলির অবস্থা দেখলে বোঝা যায় আমাদের স্বাস্থ্যবোধ ও সমাজবোধের কত অভাব। খাবার দোকান, পথেঘাটে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের রীতি, হাটবাজার ইত্যাদি স্বতই প্রমাণ করে আমাদের শিক্ষার অসঙ্গতি, অপরিপূর্ণতা।

তৃতীয় উদাহরণ নেওয়া যাক: প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার। উদ্দেশ্য সাধু হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে কি হয়? উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনে ক্ষমতা বয়ঃপ্রাপ্তি হলেই হয় না। সে-প্রমাণ তো পর-পর কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন, রাজ্য নির্বাচনে পাওয়া গিয়েছে। আর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে কয়জনই বা রাজনৈতিক পরিণতি বা সমগ্র সমাজবোধের পরিচয় দিয়েছেন? দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী, ভ্রষ্ট রাজনীতিক, ঘুষখোর পদস্থ কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কি কমেছে জনসাধারণ তা ভালো করেই জানে। যে-দেশে অবাধে ব্যবসায়ী খাদ্যে ঔষধে ভেজাল দেয়, দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা আয়কর ফাঁকি দেয় অর্থাৎ সে-সুযোগ থাকে, বুঝতে হবে সে-সমাজে জনচেতনা জাগে নি। জনসাধারণের কাছে সরকারের কোন নীতি বা প্রকল্পের ব্যর্থতার জন্য জবাবদিহি করতে হয় না। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধি মাত্রেই যদি জনগণের কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকে, যদি জনসাধারণ সরকারের কাছে মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দাবি করতে শেখে, সরকারের অপব্যয় অপচয়ের জন্য কৈফিয়ত দাবি করতে শেখে তবেই নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং সংগঠিত সরকার সদা সজাগ থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাই জনজাগরণ সম্ভব করতে পারে। ধ্বংসাত্মক কাজ খুনখারাপি সমাজে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়ায়, অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট করে। কোন স্থায়ী সমাধান হয় না। মুষ্টিমেয় লোক ভাগ্যান্বেষণে বিদেশে পাড়ি দিতে পারে, সে-দেশে সুখে-সচ্ছলতায় থাকতেও পারে কিন্তু সেটাও কোন জাতির অর্থ নৈতিক অবস্থার স্থায়ী সমাধান নয়।

তবে কি সাময়িকভাবে বৈদেশিক আদান-প্রদানে, ভারতীয় নাগরিকের বিদেশে যাতায়াতের বা বিদেশী নাগরিকের ভারত আগমনে কঠোর নীতি অবলম্বন করলে সুফলের আশা আছে? বিলাসদ্রব্য উৎপাদন ও আমদানি বন্ধ করলেই কি প্রলোভন কমবে? বিদেশী অর্থ, বিদেশী কর্মী আমাদের দেশে খাটলেই কি একযোগে শিল্প-কৃষির উন্নতি

হবে ? দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা ঘুচবে ? প্রতিকারের পথ কি ? মনে হয় শিক্ষাপ্রসার ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা হবে প্রাথমিক সোপান প্রতিকারের পথে।

তিন

এমন একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কি করা যায় না যাতে প্রতি গ্রামে অন্তত প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, ডাকঘর, পুলিশফাঁড়ি, কৃষি বিভাগের কার্যালয় তথা সার-বিতরণ জলসেচ ব্যবস্থা কেন্দ্র, ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঔষধের দোকান আদালত প্রভৃতি স্থাপিত হয় ? তাহলে বহু শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হতে পারে। গতানুগতিকভাবে বি-এ, এম-এ ইত্যাদি পাসের সংখ্যা হ্রাস করা যায় না কি ? এমন প্রকল্প কি নেওয়া যায় না যাতে গো-পালন, হাঁস-মুরগি পালন ব্যবস্থা, শাকসবজি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রতি গ্রামে মহকুমা-জেলা শহরের প্রতিবেশে বৃদ্ধি পায় এবং স্থানীয় প্রয়োজন মেটাতে পারে ? যাতে স্থান উপযোগী ফলচাষের ব্যবস্থা হয় ? পুকুরে, খালে, বিলে মাছের চাষ সম্ভব হয় ? যাতে শিক্ষক, চিকিৎসক, ডাক-বিভাগের কর্মী, কৃষি-বিভাগের কর্মী, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মী, আরক্ষা-বিভাগের কর্মী, ব্যাঙ্ক কর্মী সকলেরই কর্মে নিয়োগের প্রথম অবস্থায় গ্রামে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা যায় ? এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে কর্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা, গ্রামে যাতায়াতের সুব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, এককথায় গ্রামগুলিতে জীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সকল রকম ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হবে। যদি তা সম্ভব হয় তাহলে শহরবাসী কার্য উপলক্ষে গ্রামে বাস করতে ভয় পাবে না, শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রভাব গ্রামসমাজে পড়বে এবং আনুষঙ্গিকভাবে কৃষি, মাছের চাষ, ফলের-বাগান, সবজিবাগান ইত্যাদির উন্নত ব্যবস্থা হ'লে, গ্রামের ছেলেরা সামান্য লেখাপড়া শিখে পৈতৃক কর্মে অনীহা প্রকাশ করবে না বলেই মনে হয়।

আর-একটি কথা, যদি সমাজে উচ্চতম ও নিম্নতম আয়ের একটা হার বেঁধে দেওয়া যায়, ধনী ব্যক্তিদের পুঞ্জীভূত ধনসম্পদের অংশবিশেষ সরকারের হাতে আসে এবং সরকারের বিভিন্নখাতে বরাদ্দ অর্থ যাতে

যথোপযুক্তভাবে ব্যয়িত হয়, সেদিকে কঠোরতা অবলম্বন করা হয়, তাহলে অর্থনৈতিক অবস্থার আশু পরিবর্তন হতে পারে। এই সব-কিছু পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে যদি নির্বাচিত সরকার সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়। আর পরিকল্পনাগুলির সার্থক রূপায়ণে প্রয়োজন হবে সমাজ-মানসিকতার পরিবর্তন। সেই পরিবর্তনে শিক্ষাব্যবস্থায় কী ধরনের রদবদল প্রয়োজন তার আভাস পূর্বেই দেবার চেষ্টা করেছি। আমাদের সমাজে যেসব পরস্পর-বিরোধী ভাব ও শক্তি ক্রিয়াশীল সেগুলিরও সমন্বয়ের প্রয়োজন আছে। যেমন, ধরা যাক ভারীশিল্পের প্রসার হবে, যন্ত্রের ব্যবহার চলবে, বৈদ্যুতিকশক্তির ব্যবহার চলবে, কিন্তু কৃষি উন্নয়নে যন্ত্র, বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার কিছুই পৌঁছাবে না কারণ নিঃস্ব ব্যক্তি-কৃষকের ক্ষমতার বাইরে এবং সরকারও এ-বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার দায়িত্ববোধ করে না। এক পুজোপার্বণ ধর্মকর্মের ব্যাপার বা বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপার ছাড়া একত্র হয়ে কোন কাজ করার অভ্যাস আমাদের কম। যেমন গ্রামসমাজে তেমনি শহরে ও পরিবার ও বন্ধুবর্গের সীমানার বাইরে আমাদের সমাজবোধ অগ্রসর হয় না। পরস্পর সহযোগিতায় যৌথভাবে কোন কাজ করা ততটা সহজ হয় না। সামবায়িক শিক্ষার যেমন অভাব, সামবায়িক শক্তিতে আস্থাও তেমন নেই। ব্যক্তি মালিকানা, ব্যক্তি প্রচেষ্টা এবং অদৃষ্টবাদে আমরা বিশ্বাসী। কাজে কাজেই আমাদের কৃষিব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা গতানুগতিকভাবে চলতে থাকে। সরকার দায়িত্ববোধ করে না, সমাজও এগিয়ে আসে না। কিছু চিন্তাশীল ক্ষুব্ধ মানুষেরা আলোচনা করেন, প্রশ্ন করেন। কিছু সুবিধাবাদী রাজ-নীতিক সোরগোল করে বাজিমাত করে, ভোট পাওয়া তার একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এখানে-ওখানে কিছু বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ, কিছু রাস্তা-ঘাট সংস্কার ইত্যাদি, আর সবকিছু মুলতুবী থাকে পরবর্তী পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য। দেশ কীভাবে বড় হবে সে-সম্বন্ধেও জনগণের বক্তব্য থাকে। আমাদের জনসাধারণের বক্তব্য কি? আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগ নিয়েই এতকাল বাঁচতে শিখেছি ব্যক্তিজীবনে। পারিবারিক জীবনে সেই বোধেরই ব্যাপকতা দরকার; ব্যক্তি ও পরিবার শুধু নয় সমাজজীবনে একে অপরের সঙ্গে কিছু ভাগ দিয়ে এবং নিয়েই বোধহয় বৈষম্য দূর করা সম্ভব। একদিকে স্বল্পে সন্তোষ,

ত্যাগ তিতিক্ষা ধর্মবোধ ন্যায়নীতিবোধ, আর-একদিকে শ্রমানুরাগ ও উদ্যম-নিষ্ঠা এই দুয়ের সমন্বয়ী শিক্ষাই কোটি কোটি মানুষের আত্মবিকাশ ঘটিয়ে সমাজে স্থায়ী কল্যাণসাধন করতে পারে বলে বিশ্বাস হয়, প্রলোভন ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করে নয়। কয়েকটি ধনী সমাজ ব্যতীত অধিকাংশ জনসমাজেই দারিদ্র্য-বুভুক্ষু ও বৈষম্য। খাওয়া-পরা-বাসস্থান রোগের চিকিৎসা এসবের সুষ্ঠু ব্যবস্থা সমগ্র মানবসমাজে কোন্ পথে আসবে, কেমন করে সম্ভব হবে সে-কথা সব দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই ভাবছেন, তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নানা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াই সেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলেমিশে গা-ঢাকা দিয়ে আছে বটে কিন্তু বহু মানুষের সৎ চেষ্টা ও ইচ্ছাকে অবজ্ঞা অশ্রদ্ধা করবার কোন কারণ নেই।

একথা যথার্থ যে মানুষের চাহিদার শেষ নেই। খাওয়া-পরার প্রাথমিক প্রয়োজন যেই মেটে তখনি প্রবণতা জাগে উপকরণ বাহুল্যের প্রতি। ব্যক্তি-ইচ্ছাই প্রাধান্য পায়। আর্থিক সচ্ছলতা নারী-পুরুষ উভয়কে অনেকক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে। ব্যক্তিজীবনে ন্যায়নীতির ধারণা অনেক শিথিল হয়ে পড়ে। এই উপকরণ বাহুল্যের প্রতি প্রলোভন ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের শিক্ষা আমাদের বৃহৎ জনসমাজে যতটা কম আমদানী হয় ততটাই মঙ্গল। পাশ্চাত্ত্যের ধনী সমাজগুলিতে সাধারণ মানুষ জীবনের নানা উপকরণ সংগ্রহ করতে নিজেদের ক্ষয় করে চলেছে। তাদের চাকচিক্যময় বিলাস উপকরণের দিকে নজর না দিয়ে তাদের শ্রমনিষ্ঠা সাংগঠনিক শক্তি ও বিজ্ঞানের ব্যবহার যদি আমরা আয়ত্ত করতে পারি তাতেই আপামর জনসাধারণের মঙ্গল হবে। লোভ ও প্রতিযোগিতার মনোভাব দমন করতে শেখানোও একটা বড় শিক্ষা।

ধনী দেশগুলি আয়কর বৃদ্ধি করে, ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করে বিজ্ঞানের সহায়তায় যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধির বনিয়াদ দৃঢ় রাখে, ব্যবহারিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি বজায় রাখে। ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ ধনী দেশগুলির সমৃদ্ধির কারণ, লোকসংখ্যার পরিমিতিও বটে। অবশ্য প্রকৃতির নিয়মে খনিজ সম্পদ একদিন ফুরবে, তখন কি অবস্থা হবে বলা শক্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা খুবই ভাগ্যবান। অথচ এসত্ত্বেও ধনী দেশগুলিতে বেকার

সমস্যা আছে, সঙ্গতিসম্পন্ন ধনী ব্যবসায়ী ও ধনী ঐশ্বর্যহীন সাধারণ মানুষের মধ্যে দারুণ বিভেদ ও বিক্ষোভ আছে।

অথচ চীন রাশিয়া প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এই সমস্যা থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। তবে জীবনযাত্রার মান সেসব দেশে কতটা উন্নত তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। বহু লোক অসুখী, রাজনৈতিক আদর্শ শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি বহু বিষয়েই তারা ক্ষুব্ধ, হয়তো স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের স্বাধীনতাও খর্ব সেসব দেশে। কিন্তু এসব নানা ত্রুটি ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেসব দেশে জনসাধারণের খাওয়া-পরার অভাব নেই, আমাদের দেশের মতো নিরন্ন ভিক্ষুকের আধিক্য নেই। না খেয়ে মানুষ মরে না। কর্মক্ষম ব্যক্তি মাত্রেরই কাজ আছে অর্থাৎ কিছু কাজ করতে বাধ্য হয় এবং বেকারসমস্যারও একভাবে সমাধান হয়েছে।

তথ্য ও তত্ত্বনিরপেক্ষভাবেও বোঝা যায় রাজনৈতিক আদর্শের পরিবর্তন তথা ধনবণ্টনের সমতা শাসনপদ্ধতির কাঠামো ও সমাজ-মানসিকতার আমূল পরিবর্তনের ফলেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জন-সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে। সবাই সুখী একথা বলছি না, কিন্তু জীবনের প্রাথমিক যে-চাহিদা সেই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এগুলির সমস্যা মেটানোও তো কম কথা নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক বা শাসননীতির আদর্শ ভারতবর্ষের মানুষের মনঃপূত কি? খাওয়া-পরার চাহিদা যেমন মেটা চাই তেমনি চাই ব্যক্তির পূর্ণ স্বাধীনতা। সন্ত্রাসবাদ বা জবরদস্তির শাসন ভারতের মানুষের আদৌ পছন্দ নয়। মূলত শান্তিকামী ভারতবর্ষ সদা ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে চায় না, গণতন্ত্রেই এ-দেশের অধিবাসী অভ্যস্ত। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল আপামর জনসাধারণের কাছে গণতন্ত্রের স্বরূপ কতটা স্পষ্ট? দুঃখের বিষয়, শান্তি ও গণতন্ত্রের সফলতা সাধনের জন্য যে জাতীয় মনোবল, কর্মশক্তি, সংঘবদ্ধ তৎপরতা, শ্রমনিষ্ঠা ও বাস্তব বুদ্ধি সমগ্র সমাজমানসে স্থিতিশীল হওয়া দরকার— সেই চারিত্রিক বনিয়াদ আজও তৈরি হয় নি। সমগ্র সমাজ-জীবনে উন্নতির একমুখী লক্ষ্যে পৌঁছাতে শিক্ষাই প্রধান সহায়ক, হাতিয়ার বলা যেতে পারে। আজকের শিক্ষার প্রভাব আগামীদিনের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-ব্যবস্থা-স্বাস্থ্য উন্নয়ন প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পড়বে। এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিক্ষাই পারস্পরিক যোগাযোগ-পরিবর্তন-পরিবর্ধনে সহায়তা করবে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বাহুল্যবর্জনের আদর্শ, রুচির আদর্শ, লোভকে প্রতিযোগিতাকে দমন করবার আদর্শ, সংগঠনের শক্তি কর্মে নিষ্ঠা, সমাজ ও দেশবোধ, সর্বোপরি অহংবোধের পরিহার ও উদার মনুষ্যত্ব-বোধের উন্মেষ, ন্যায় ও নীতিবোধের উন্মেষ ঘটানোই হবে ভবিষ্যৎ ভারতের শিক্ষার আদর্শ। এই শিক্ষাই ভারতের জনগণের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করবে বাস্তবভাবে। ধনসমবণ্টনের প্রকল্প, বহুবিধ উন্নয়নের প্রকল্প, লোকসংখ্যা সীমায়িত রাখার প্রকল্প ইত্যাদি সফল হবে জনসমাজে ব্যাপক শিক্ষার প্রচলন হ'লে। একমাত্র শিক্ষা ও দমননীতির দ্বারাই দুর্নীতি ও ক্ষমতার লোভ, ব্যক্তি-অহংকার ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব আয়ত্তে আসতে পারে, সুযোগসন্ধানী প্রবৃত্তি দমিত হতে পারে।

পরাধীন ভারতে বহু মনীষী স্ব-স্ব আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন, কালে সে-সকল প্রতিষ্ঠান বিস্তার, সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বহু ব্যক্তি সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভের সৌভাগ্যে স্ব-স্ব জীবন সমৃদ্ধ করেছেন, সমাজে প্রভাব বিস্তারও করেছেন, কিন্তু সেসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য সকলের হয় নি, ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ। আজ সমাজমানস গঠনের গুরুদায়িত্ব স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত। স্বাধীনতা প্রাপ্তির চার দশক পরেও কেন শিক্ষা সর্বব্যাপক হবে না? নানা গবেষণা কেন্দ্রে শুধু থিসিস লেখা হবে, কিন্তু কেন সেই সব চিন্তা বাস্তবে ফলিয়ে তোলার উপায় নেই? প্রতিদিন নানা রকমারি আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের সমাজে এসে পড়ছে— ধনী সমাজের প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাহিনী দেশের ধনী-নির্ধন সকলের কাছেই পৌঁছচ্ছে, নানা বিলাস দ্রব্যসম্ভারে দেশ ছেয়ে যাচ্ছে। আমরা নিয়ত প্রলুব্ধ। কেমন করে প্রলোভনকে জয় করা যাবে?

আমরা দেখছি, শুনছি যন্ত্রের ব্যবহারে, বিজ্ঞানের সহায়তায় বিভিন্ন দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, উন্নতিমূলক কাজ হচ্ছে— আমাদের দেশে বিজ্ঞানের যথার্থ ব্যবহার নেই কেন, হয় না কেন?

মনে হয় এই বহুবিধ প্রশ্নের সমাধানে প্রধান হাতিয়ার হবে বাস্তব উপযোগী জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষা। দীর্ঘসূত্রতা পরিহার করে একদল শিক্ষাবিদ রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতায় শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মী ও মন্ত্রীকে যদি জাতীয়-শিক্ষা প্রকল্পের গুরুত্ব বোঝাতে পারেন,

এই আলোচনায় উল্লেখিত সমস্যা ও সমাধানগুলির মধ্যে যদি কোন বাস্তব সত্যের সন্ধান পান এবং সেগুলি ঠিক পথে পরিচালিত করে কার্যকরী করে তুলতে সচেষ্ট হন তবে আশা করা যায় আগামী বিশ-পঁচিশ বছরে বৃহৎ ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হবে, হয়তো গঠনমূলক একটি স্থিতির দিকে সমাজ এগিয়ে যাবে। যদি গ্রাম-উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক খসড়াটির ত্রুটিবিচ্যুতি বিচার করে আংশিকভাবে কাজে পরিণত করবার আশু চেষ্টা হয় গ্রাম-জীবনে পরিবর্তন আসবে। আশা হয়, আমাদের জীবদ্দশাতেই বাংলার তথা ভারতের সমৃদ্ধ সুখী গ্রামের চিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সরকারের স্থির সংকল্প, দৃঢ় মনোভাব ও সক্রিয় চেষ্টায় শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে সামাজিক মানসিকতার পরিবর্তন হবে বলেই বিশ্বাস।

একটি বিকল্প ব্যবস্থা

ভারত সরকারের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে বেকারের যে সংখ্যা ও বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে হার দেখানো হয়েছে তাতে একটা বিষয় বেশ স্বচ্ছ— যে-দলই সরকার গঠন করুক বা ক্ষমতায় আসুক রাতারাতি কোন সমস্যার সমাধান হয়ে উঠবে না। সারা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্পষ্টই বোঝা যায় এমন অবস্থা কোনদিন কোন রাষ্ট্রেই সম্ভবত হবে না যেখানে মানুষের মনে অর্থমনস্কতার বিকার থাকবে না এবং ক্ষমতার শীর্ষে শুধু নির্মোহ ব্যক্তিরাই অবস্থান করবে। যদি কোনদিন সুদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে, যদি কেন্দ্রীভূত শক্তিই দেশের অর্থ পরিচালনার পূর্ণভার গ্রহণ করে, তখন সেই ভার যে-শ্রেণীর উপর বর্তাবে, তাদের ব্যবস্থাপনায় যে দেশের দশের শুধু মঙ্গলচিন্তাই একনিষ্ঠ হয়ে উঠবে এবং কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ মানুষের লোভ, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, ভোগের আকাঙ্ক্ষা প্রবল, আজও যেমন আছে, সেদিনও থাকবে। অর্থ ও ক্ষমতা বহু জ্ঞানী-গুণী মানুষেরও চারিত্রিক ভারসাম্য টলিয়ে দিতে পারে।

তথাপি, মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা রেখেই বর্তমান সমাজ ও অর্থনৈতিক বিন্যাসে সমাজের মানসিক তথা চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা ব্যতীত আর কোন আশু উপায় আছে বলে মনে হয় না। আমাদের যে 'সেটআপ' তাতে প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, মনোভাব বদল হওয়া দারুণ কঠিন ব্যাপার। আমাদের সমাজে শুধু ধনের বৈষম্য-জনিত অনগ্রসরতা নয়, শিক্ষা-বৈষম্য-জনিত অনগ্রসরতা ভয়াবহ। একদিকে বিত্তবান ধনিক উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত যারা আত্ম-স্বার্থ সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, চতুর এবং কুশলী, আর একদিকে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত জনসাধারণ যাদের নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনা খুব কম, যারা স্বভাবতই পরের বুদ্ধিতে উত্তেজিত। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণই অপরিণামদর্শী

দলনেতাদের হাতের ক্রীড়নক, রাজনীতির শিকার, সমাজে বিড়ম্বিতভাগ্য মার-খাওয়া জনগণ। আর আছে শিক্ষিত বেকার, শিক্ষিত নিম্নবিত্ত যারা অভাবে ব্যর্থতার গ্লানিতে নিয়তমোহ্যমান, কখনো বা অগ্নিগর্ভ আস্ফালনে দিশাহারা।

সমাজের যে অর্ধেকের বেশি অংশে মজ্জাগত জড়তা, দরিদ্র অবস্থাজাত উদ্যমহীনতা, অজ্ঞাতজাত বিপাকে-পড়া পরিস্থিতি— এই ভাব এই অবস্থা শিক্ষার সঞ্জীবনী ব্যতীত কদাচ দূর হওয়া সম্ভব নয়। 'গরিবি হঠাও', 'কথা কম কাজ বেশি' বা এই ধরনের আরও কিছু জুৎসই বুলি সাময়িক কিছু উত্তেজনা সঞ্চার করলেও করতে পারে। 'মদ্যপান নিবারণী সভা' বা ঐ জাতীয় প্রচেষ্টার কিছু উপকারিতা হয়তো আছে। কিন্তু এসবের দ্বারা জনসাধারণের স্বভাবের স্থায়ী পরিবর্তন সম্ভব বলে মনে হয় না। যেমন, অস্পৃশ্যতা নিবারণের কথাই ধরা যাক। যদি এক শ্রেণীর মানুষ সমাজে সবচেয়ে যে নিকৃষ্ট কাজ সেই কাজই তাদের বরাদ্দ হয় তাহলে কি কখনো অপর শ্রেণীর অবজ্ঞা থেকে তারা মুক্তি পেতে পারে? আজকাল তো শহরে গ্রামে সর্বত্রই সেপটিক ট্যাঙ্ক হয়েছে, কলকাতা শহরে বরাবরই আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাইপের ব্যবস্থা আছে, তবে মেথর শ্রেণীকে নিকৃষ্টতম কাজটির জন্য জিইয়ে রাখার প্রয়োজন কি? গৃহস্থ মাত্রেই তো নিজের বাড়ির পায়খানা পরিষ্কার করতে পারে। বারির জঞ্জাল নির্দিষ্ট স্থানে জমিয়ে রাখতে পারে। রাস্তায় নির্দিষ্ট আধারে ফেলতে বাধা কোথায়? মেথর-শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হলেই সমাজে তাদের চিহ্নিত নিম্নস্থান থাকবে না, অন্যথায় সে চিহ্নিত নিম্নস্থান থেকেই যাবে। আজ আর ছোঁয়াছুঁয়িতে আমাদের জাত যায় না। গ্রামে এখনো যায় বটে, অধিকাংশ শহরেই যায় না। অপর ধর্মাবলম্বীর ঘরে পানাহারেও জাত যায় না। এ-যুগে আমরা বুঝতে শিখেছি ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মালেই ব্রাহ্মণত্বের অধিকার জন্মায় না। ব্রাহ্মণের সন্তান শুধু অধ্যয়ন অধ্যাপনা, যজন যাজন করে না, কার্য-গতিকে ট্যানারীতে কাজ করে, পুলিশে চাকরী করে, দরকার হলে শ্রেণীশত্রু খতম করতে পিছপা হয় না। কালাপানি পার না হতে পারলেই উচ্চ সমাজে যেন মান থাকে না। বিভিন্ন বর্ণে বিবাহের ঘটনা সমাজে আর ঘোঁট পাকায় না, এমনকি বিদেশী কন্যা বিবাহে উচ্চ সমাজে যেন মান বাড়ে। সুতরাং বর্ণভেদের প্রকটতা আধুনিক হিন্দু

সমাজে স্তিমিত। সমাজনৈতিক রাজনৈতিক বহুবিধ কারণের মধ্যে শিক্ষাই এই মানসিক পরিবর্তনের একটি অন্যতম কারণ এ-বিষয়ে সকলেই এক-মত। তেমনি এই বোধের উদয় হবার সময় এসেছে যে ধনীর গৃহে জন্মালেই ধনের অধিকার অর্থাৎ পিতৃ-পিতামহের উপার্জিত তথা সঞ্চিত ধন-সম্পত্তি ভোগের অধিকার জন্মায় না। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনার অধিকার, কোন বিশেষ কর্মদক্ষতা যেমন অর্জন করতে হয় তেমনি সাবালকের পক্ষে ধনভোগের অধিকারও অর্জনসাপেক্ষ। কয় জন পিতা-মাতা আপন সন্তানকে সে-শিক্ষা দিই বা দিতে পারি অর্থাৎ মানসিক সায় পাই যোগ্য শিক্ষা দেবার! অথচ এই শিক্ষাই মানুষের অর্থমনস্কতার উগ্রতা ও ধনপুঞ্জীভূত করার উদগ্র কামনা দূরীকরণে সহায়তা করে বলে আমার বিশ্বাস।

অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনীতি, শিক্ষা-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের আভাস সমাজের গর্ভ থেকেই আসে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপদেষ্টারা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে বিশেষজ্ঞ অভিমত যদি না দিতে পারে, যখন যে-দল ক্ষমতায় আসীন তখন যদি তাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির না থাকে, দলের কর্মীরা যদি সমাজ ও অর্থনৈতিক কাঠামোটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হয় এবং রাষ্ট্রশাসন-যন্ত্রকে যথাযথ পরিচালনা বা বশে রাখতে না পারা যায় তাহলে একটি বিরাট দেশে যে-ধরনের বিশৃঙ্খলা ঘটা সম্ভব ঠিক সেটাই আমাদের দেশে ঘটেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার কঠিন চাপে বাস্তবের মার খেয়ে অন্তত এটুকু চৈতন্য সাধারণ স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তি মাত্রেরই হয়েছে যে ভোটাভুটির প্রহসন, মিথ্যা গালভরা প্রতিশ্রুতি, ভাষা সংস্কৃতির আন্দোলন ইত্যাদির চেয়ে খেয়ে প'রে বাঁচার তাগিদটাই জরুরি। সেজন্য প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রেরই একটা কাজ চাই - তা হাতে-কলমে কাজ হোক, গায়ে-গতরে খাটার কাজ হোক বা বুদ্ধিমানের কাজ হোক, একটা কিছু চাই যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে জীবনধারণ করা যাবে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত জনসাধারণের অধিকাংশের কাছে এটা স্পষ্ট নয় যে একটা বিরাট দেশ, এক রাজ্যের সমস্যার সঙ্গে আর এক রাজ্যের সমস্যা জড়িত, এক রাজ্যের সমৃদ্ধির সূত্রে অপর রাজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভরশীল, দেশের খনিজ সম্পদ উৎপাদন অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক লেন-দেনের উপর

অর্থনীতির বনিয়াদ, খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকবার ন্যায়সংগত অধিকার সকলেরই কিন্তু কৃষিযোগ্য ভূমির উৎপাদন লোকসংখ্যার অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়, খাদ্যশস্য-বাসযোগ্য ভূমি লোকসংখ্যার অনুপাতে দিন-দিনই কমতির পথে। এই সাধারণ সংবাদগুলি সারা ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের মনে গেঁথে দিতে হলে জাতীয় সরকারকে যে ধরনের শিক্ষাদানে বদ্ধপরিকর হতে হয় — বর্তমান বয়স্ক শিক্ষা, সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা বা মদ্যপাননিবারণী সভা ইত্যাদিতে তার ঘাটতি আছে মনে হয়। পূর্বে হোক পশ্চিমে হোক জনজীবনের বিড়ম্বিত ভাগ্য মার খাওয়া শোচনীয় অবস্থা যে অনেকটাই মানুষের হাতে গড়া ব্যবস্থার জন্য, ব্যক্তির অজ্ঞতার জন্য সেকথা বুঝবার, বোঝবার এবং প্রতিকারে বদ্ধপরিকর হবার দিন এসেছে। পূর্ব-পশ্চিমের সব সভ্য দেশেই স্থিতধী দৃঢ়প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এই শিক্ষাদানে আজ ব্রতী। নিঃসন্দেহে তারা সংখ্যালঘু। অধিকন্তু ব্যক্তিজীবনে কর্মক্ষমতার পরিধি খুব বেশি হলেও গড়ে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের বেশি নয়, প্রকৃতির নিয়মে ব্যক্তি মানুষকে বিদায় নিতে হয়, ব্যক্তি আদর্শ-ইচ্ছা বা কর্মের প্রভাবও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে অপরাপর প্রভাবে। শুধু তাই নয়, একজন যা বলে বা প্রকাশ করে আমরা আপন আপন বুদ্ধি-বিচার শক্তি অনুযায়ী সেই ভাবের বক্তব্যের সারাৎসার অনুধাবন করি আবার ব্যাখ্যা করি ব্যক্তি-বিশেষের চিন্তাশক্তি অনুযায়ী, প্রয়োগ করি আপন আদর্শের আদলে। কোন সৎ আশাবাদী চিন্তা-আদর্শের বাস্তব রূপায়ণের পথে অগ্রগতিতে পরস্পর-বিরোধী চিন্তার প্রতিফলন থাকতে পারে, বহুবিধ বিপত্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। সমাজ আপন গতিতে এগিয়ে চলে।

মুশকিল এই যে যখন আমরা একটা বহুকাল প্রচলিত ব্যবস্থায় পারিপার্শ্বিকে বাস করতে অভ্যস্ত হয়ে যাই, যখন পিতৃপুরুষানুক্রমে বংশপরম্পরায় সুখ-দুঃখ ভোগ করি বা কোন অধিকার দখল করে থাকি তখন পারিপার্শ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক ত্রুটি গলদ বিপর্যয় বৈষম্য এমন-কি অন্যায় আমাদের চোখে পড়ে না গা-সহা হয়ে যায়, কোন প্রশ্নও জাগে না। যারা ক্রমাগত নানা অসুবিধা ভোগ করে, অভাবে-অনটনে দিন কাটায়, শারীরিক ক্লেশ ও ব্যর্থতাবোধের মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে, হয়তো মরীয়া হয়ে কখনো কখনো সব ভেঙেচুরে ফেলবার একটা সাময়িক উত্তেজনা তাদের মধ্যে আসে। আর সেই অবস্থাতেই সমাজে

এখানে ওখানে নানা ধরনের বিক্ষুব্ধ বিস্ফোরণ ঘটে। ইতস্তত বিক্ষোভের ঘটনাগুলি একসূত্র বন্ধনে গেঁথে সংগঠিত পরিচালনায় যদি আসে এবং একটি মুখ্য উদ্দেশ্যে যদি পরিচালিত হয় তবে সমাজে বিপ্লব ঘটে। সে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সমাজনৈতিক হতে পারে। কোন সমাজে কীভাবে সেই অমোঘ শক্তি ক্রিয়া করছে সেটা সমসাময়িককালে বোঝা শক্ত হলেও সমাজ বিশেষের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। বর্তমান যুগে বহুবিধ সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও— যুদ্ধ, ক্ষমতার লড়াই বা নারী স্বাধীনতা তথা প্রগতি লড়াই আমাদের নয়। অধিকাংশ এশীয়, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাবাসীর লড়াই মানুষের মতো বেঁচে থাকার— অন্ন বস্ত্র, বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা, রোগের চিকিৎসা, রোগ উপশমের উপায় ও উপযুক্ত শিক্ষা— অজ্ঞতা দূরীকরণ।

উন্নত দেশগুলির সঙ্গে দরিদ্র অনুন্নত দেশগুলির গুণগত প্রধান পার্থক্য উন্নত সমাজের মেয়ে-পুরুষ উভয়েই দারুণ পরিশ্রমী দায়িত্বশীলও বটে। সেসব সমাজে কায়িকশ্রম শুধু সমাজের নিচুতলার একচেটিয়া নয়। মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত শিক্ষিতেরাও বাস্তব অর্থে কায়িকশ্রম করে। আমাদের দেশে যেটা অকল্পনীয় আত্মসমর্থনে যুক্তি এই যে, দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য ও শ্রমমূল্য কম হলে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকে কায়িকশ্রম থেকে অব্যাহতি নেবেই। কিন্তু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যদি প্রতি সক্ষম মেয়ে-পুরুষ আট-দশ ঘণ্টা খাটে তাহলে সেই সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফসল ওঠে কত! আমাদের প্রতিবেশী জাপান একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। তৃতীয়ত সীমায়িত লোকসংখ্যা। চতুর্থত কৃষিজাত শস্য উৎপাদনে, সর্বপ্রকার উৎপাদনে তথা সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ। সর্বোপরি প্রশংসনীয় উদ্যমী প্রচেষ্টা— ভালোভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা সমাজের উচ্চনীচ নির্বিশেষে।

সবদেশে গ্রামই শস্যের ভাণ্ডার, খাদ্যদ্রব্যের আকর। এই কারণে অধিকাংশ উন্নত দেশগুলি গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গ্রামজীবনের সমৃদ্ধি সাধনে তৎপর। দরিদ্র দেশগুলিতে বিপরীত পরাধীনতা। দারিদ্র্যের একটি অন্যতম কারণ সত্য কিন্তু অজ্ঞতাও আর একটি কারণ বটে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আছে, ভাগ্যও মানতে হয়, এসব সত্ত্বেও বলতে হয় পুরুষকারের উদ্বোধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটা শুধু আধ্যাত্মিক জীবনে প্রযোজ্য নয় ব্যবহারিক জীবনেও প্রযোজ্য।

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাদ, কেরল, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে স্বল্পকাল বাসের সুযোগে ও গ্রামাঞ্চলে প্রাণের সুযোগে সীমায়িত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতায় বুঝেছি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যাতায়াত ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। সামগ্রিক রাজনৈতিক চেতনা না থাকলেও দলগত উত্তেজনা সর্বত্রই আছে। বহুস্থানে বয়স্ক শিক্ষার কেন্দ্র, জনসংযোগ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়. গ্রন্থাগার ইত্যাদি হয়েছে। স্বাক্ষরতাই শিক্ষার প্রধান মাপকাঠি বলে গণ্য হয়েছে বলে মনে হয়। দক্ষিণ ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি চোখে পড়ার মতো। কোথাও কোথাও চাষের জন্য ট্রাকটর ভাড়ার ব্যবস্থা জমে উঠেছে, সারের ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই তিন দশকে আশানুরূপ উন্নতি হয় নি বলেই মনে হয়। চিকিৎসা কেন্দ্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বিদ্যালয়ের অভাবটাই অধিক। দূর দূর গ্রাম থেকে একটি গঞ্জের হাটের দিনে সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি ঔষধের আশায় রোদ বৃষ্টি মাথায় করে কীভাবে যে শিশু, বৃদ্ধ, নারী রোগী দলে দলে আসে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। কৃষিক্ষেত্রে সেই সনাতন পদ্ধতি। এইসব চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা যাদের আছে তাদের মনে একবার প্রশ্ন জাগবেই সত্যিই কি দেশটা স্বাধীন? এই স্বাধীনতা এদের কাছে কতটা অর্থবহ? বড় বড় শহরের মসনদে বসে থাকা আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সত্যিই কি জনসাধারণের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত প্রাণ! পূর্ব-উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের গ্রামবাসীর অধিকাংশের সমস্যাই প্রধানত একটি— প্রকট দারিদ্র্য। অন্ন-বস্ত্র-চিকিৎসা ও শিক্ষার দারিদ্র্য। অবশ্য দারিদ্র্যের পরিধি শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয় শহরের শ্রমজীবী বিভিন্ন জীবিকা আশ্রয়ী অল্পশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত— অশিক্ষিত শ্রেণী, স্বল্পপুঁজির ব্যবসায়ী, দোকানী, শিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত— দেশের এই বৃহৎ জনসংখ্যা। এছাড়াও আছে কর্মহীন দুঃস্থ, আছে শিক্ষিত বেকার। এসব কথা সকলেরই জানা নতুন করে বলবার কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো নানা ধরনের বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান আছে। দেশী বিদেশী বহু প্রতিষ্ঠানের সাহায্য বহু শহরে বহু গ্রামে আছে। অন্ধ্র, তামিলনাদ, কেরল, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের কিছু গ্রামে খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী দুঃস্থদের কাছে বিদেশের সাহায্য পৌঁছায়।

পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উত্তর ভারতে, ওড়িশায় এ-ধরনের সাহায্য আছে। বিভিন্ন ধর্ম প্রতিষ্ঠানের দরিদ্রসেবা, গ্রামসেবা আছে। সেসব মহানুভব প্রচেষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে বলতে হয় এই আংশিক প্রচেষ্টা কোন বিরাট দেশের মূল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। দ্বিতীয়ত বিদেশী সাহায্যের গুপ্ত পথে রাজনীতির করালছায়া মুখব্যাদান করে। এমনকি ধর্মের ছদ্মবেশেও বিপদ আসে— যা রাষ্ট্র সংহতির মূলে পর্যন্ত আঘাত হানিতে পারে - একথা আজ আর অবিদিত নেই।

আবহমানকাল ধরে ধনী সম্পন্ন গৃহস্থ দরিদ্রকে দান করে, শ্রেষ্ঠীরা দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। এখনো অভাবী গৃহস্থও মমতা-সমবেদনা প্রকাশ করে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেয়, সাধুসজ্জনকে সেবা দেয়, সাধ্যমত অতিথি পরিচর্যা করে। সম্পন্ন গৃহস্থ পুত্রের অন্নপ্রাশনে,পুত্র বা কন্যার বিবাহে গ্রামবাসীকে ভোজন করায়। পিতামাতার পারলৌকিক কর্মে জ্ঞাতিভোজন শুধু নয় কাঙালী বিদায় করে। মানবিক মর্যাদা, মানবিক বেদনা এখনো খোয়া যায় নি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় দারিদ্র্যের সমস্যা সমাধান হয়েছে কোথায়? আর আজকের প্রাগ্রসর সভ্যযুগে সমাজে কাঙালী থাকবে কেন? আজও শুধু ব্যক্তি, সম্পন্ন গৃহস্থ, ভূস্বামী এদেরই পূর্ণ দায়িত্ব নয়, যৌথভাবে সকলে এবং প্রত্যক্ষ-ভাবে জাতীয় সরকার যদি স্থির সংকল্প গ্রহণ না করে তাহলে ব্যাপক পরিবর্তন অসম্ভব। সমগ্র ভারত সমাজে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, বিত্তবান বণিক শ্রেণী, ধনী শিল্পপতি ইত্যাদির পাশাপাশি একটি সুস্থ-তৃপ্ত সচেতন কর্মীশ্রেণী গড়ে তুলবার পূর্ণদায়িত্ব প্রত্যেক রাজ্য সরকারের তথা কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের।

একথা স্মরণ রাখা ভালো যে বর্তমান পৃথিবীর সমাজ সাক্ষ্য দেয় যে অর্থনৈতিক সমতা কোথাও নেই। তবে সমান সুযোগের পথ খোলা আছে। অনুন্নত দেশগুলিতে, দরিদ্র দেশগুলিতে তাও নেই। এমনকি সরকারের নিরপেক্ষ সমর্থনও অনেক দেশে নেই। সুতরাং আর্থিক অসমতা মেনেই নিতে হবে। মানুষে মানুষে যেমন চেহারা, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, শক্তি-সামর্থ্যের পার্থক্য তেমনি ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রগত গুণগত পার্থক্যের জন্য শিক্ষা, বৃত্তি প্রভৃতির তফাত অবশ্যম্ভাবী সমাজে। আর ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি, রুচি, শিক্ষা ও বৃত্তি তার জীবন-যাপনের রীতিতে ছাপ রাখবে। সুতরাং সব সমাজে শ্রেণীভেদ থাকবে।

অবস্থার অসাম্য থাকবে। মানসিকতার ভেদাভেদও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই ভেদ, সেই অসমতা জাতিগত বংশগত গোষ্ঠীগতভাবে কায়েমী হয়ে না বসলেই মঙ্গল। আজকের সমাজে ধনী-সচ্ছল আর দুঃস্থ-নিরন্নের যে আসমান-জমিন ফারাক, যে পীড়াদায়ক বৈষম্য তা যদি কমিয়ে আনতে না পারা যায় তবে একপক্ষের দুঃখ-দুর্দশা তো থেকেই যাবে উপরন্তু সমাজে উত্তরোত্তর বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষ বেড়েই চলবে। উন্নত ধনী সমাজগুলিতে জীবন-যাপনের ব্যবহারিক দিকটায় খানিকটা সমতা আছে। আমি বলতে চাইছি খাওয়া-পরা মাথার উপর একটি আচ্ছাদন নীচুতলার লোকদেরও সে সমাজে আছে। আমাদের দেশে যার একান্ত শোচনীয় অভাব। মানসিকতার পার্থক্য। জীবন-যাপনের রীতির স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি স্বীকার করেও বিত্তবান ধনী, সচ্ছল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পাশে একটি সুস্থ কর্মীশ্রেণী না থাকলে সমাজে ভারসাম্য হারিয়ে যায়। সমাজসৌধের ভিত্তি দৃঢ় হওয়া দরকার এই কথাটাও উচ্চকোটির মানুষদের বুঝবার সময় এসেছে। বিদ্বেষ ও শত্রু খতমের পথ যে একান্ত পথ নয় সে সাক্ষ্য বর্তমান ইতিহাসে আছে। শুভবুদ্ধি ও উদ্যোগের সহযোগিতায় আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যাওয়াই হবে মহৎ কাজ।

যাদের হাতে দেশ শাসনের ভার, ব্যবস্থাপনার ভার, শাসন ব্যবস্থা চালু রাখার যান্ত্রিক দিকটা বজায় রাখতে তারা নিয়ত ব্যস্ত— এই ইংরেজ প্রদত্ত বিধিব্যবস্থায় এমন কতগুলি বদ অভ্যাস দৃঢ়মূল হয়ে আছে যেগুলি দূর করা বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, যান্ত্রিক পটুত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হলেও উদ্যোগী কর্ম তৎপরতা সমন্বয়ী দৃষ্টি রাজনৈতিক পরিণতি আমাদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। অথচ এই স্বভাব দৈন্যবশতই আমরা বহুদিকে পশ্চাৎপদ। এছাড়া আছে আমাদের সমাজে বয়স্ক রাজনীতিতে বিদ্বেষ ও সর্বক্ষেত্রে প্রাদেশিক মনোভাবের উৎকটতা। এবম্বিধ ভাব জাগার পশ্চাতে হয়তো পরাধীনতার অভিশাপ সক্রিয়, তথাপি মনে হয় অন্যতম কারণ শৈশবে ও কৈশোরে সমাজ সাধারণের সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে কোন প্রকার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তুলবার শিক্ষার অভাব। কিন্তু যৌবনে যখন বৈষম্যমূলক অবস্থা ও নানা ধরনের বিধিব্যবস্থা পীড়াদায়ক বোধহয়, ব্যক্তি-জীবনে বহুস্থানে ঠেকতে হয় ঘা খেতে হয়, যখন আর্থিক সংকট, বেকার অবস্থা বহুজনকে

দিশাহারা করে তোলে তখনি তাদের রোষ ক্ষোভ কখনো বা শ্রেণী-বিদ্বেষে কখনো বা প্রাদেশিকতার প্রকাশ পায়। নানাভাবে বঞ্চিত মানুষদেরই রাজনীতির শিকারে পরিণত হবার সম্ভাবনা অধিক থাকে। তাদের মনে স্বভাবতই সচ্ছল শ্রেণীর মানুষদের প্রতি বিদ্বেষ, ঈর্ষা, রোষ জাগতে পারে। সচ্ছল ধনী অবস্থায় বংশপরম্পরাক্রমে যাদের জীবন কাটে তাদের অনেকের মনে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, দুঃস্থ শ্রেণীর প্রতি একটা অবজ্ঞার ভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। অনেক উচ্চ শিক্ষিত ধনী, সচেতন বুদ্ধিজীবী বা ধার্মিক উদার মহানুভব প্রকৃতির মানুষদের মনে দয়ার ভাব বা অনুকম্পার ভাব প্রবল হতে দেখা যায়। কিন্তু কোন অবস্থাতেই দুস্থ বা উচ্চ সর্বশ্রেণীর সামাজিকের মধ্যে সমানাধিকারবোধ বা সমভাব জাগা সম্ভব নয় যদি সর্বস্তরের শিশু ও কিশোরের মনে ব্যবহারিক অর্থে সমানাধিকার ও সমভাবের ধারণা না দেওয়া হয়, জীবনে সমানাধিকার ভোগের সমব্যবস্থা না থাকে। ঋষিকল্প জ্ঞানী ত্যাগী স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিরা সমভাব পোষণ করেন কিন্তু সাধারণ সামাজিকের মনে সে ভাবের বীজ শৈশবে উপ্ত না হলে, সেই বোধের উদয় হতে বহু সময় নেয় অথবা সেই বোধের উদয়ই না হতে পারে। যৌবনে উত্তরণের মুখে সমাজ-জীবন ও পারিপার্শ্বিকের জটিলতায় শৈশবের সরলরা স্বাভাবিকভাবেই জটিল হতে থাকে গৃহ ও সমাজ পরিবেশে সামাজিক তথা আর্থিক শ্রেণীবোধের তথা ভেদের ধারণা দৃঢ় হতে থাকে। গৃহ ও সমাজ প্রতিবেশের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানের প্রভাবও ব্যক্তিজীবনে গভীর। সমাজের বহিরঙ্গ তথা অন্তরঙ্গের পরিবর্তন পরিবর্ধনে অর্থনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত দেশ প্রচলিত শিক্ষা।

দুই

মুখবন্ধে উল্লিখিত লক্ষণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে বহিরঙ্গ পরিবর্তনের ইঙ্গিত থাকলেও শিক্ষা নীতি ও ব্যবস্থা সম্বন্ধেই মূলত আলোকপাতের চেষ্টা থাকবে। প্রাথমিক শিক্ষা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রসঙ্গত উচ্চশিক্ষার সমান্তরাল একটি কার্যকরী বিদ্যাশিক্ষার কথা উল্লিখিত হবে। সে বিষয় অবতারণার

পূর্বে পুনর্বার উত্থাপন করি— গ্রামীণ অর্থনীতির বিধ্বস্ত অবস্থা আমাদের পিছিয়ে থাকার একটি কারণ। শুধু শস্য উৎপাদনের উন্নত ব্যবস্থা, কৃষি পদ্ধতির উন্নতি যথেষ্ট। এর আনুষঙ্গিকভাবে সংরক্ষণ, হস্তান্তর ও বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। সর্বোপরি ক্রমবৃদ্ধির হার সঙ্কোচনের আত্যন্তিক প্রয়োজন। পূর্বে যখন বসন্তের টিকা বা কলেরার ইনজেকশন ব্যাপকভাবে দেবার ব্যবস্থা ছিলো না সাধারণ মানুষেরা ভয় পেত, সমাজে নানা গুঞ্জন উঠত। কিন্তু এই টিকা ও ইনজেকশনের উপকারিতা এখন আমরা বুঝি। তেমনি জন্ম নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা ও কার্যকারিতায় সাধারণ মানুষকে অভ্যস্ত করে তুলতে হলে সরকারী নীতির কঠোরতা প্রয়োজন হতে পারে। গ্রামবাসী, শহরবাসী অজ্ঞ জনসাধারণের আবেগ ও ভাবপ্রবণতায় সুড়সুড়ি দিয়ে যে সব দলনেতা তাদের রাজনীতির হাতিয়ার করে, সেই নেতাদের নির্বুদ্ধিতা যে সমাজের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর তা বুঝবার ক্ষমতা সেইদিন হবে যেদিন যথার্থ সমাজশিক্ষা পাবার তাদের সুযোগ আসবে।

ধর্মশিক্ষায় অধ্যাত্মবোধের শিক্ষায় প্রথম সোপান প্রবৃত্তি দমনে— একথা প্রাচীনকাল থেকেই শেখানোর চেষ্টা হয়েছে। মানসিকতার উদ্বোধন নীতি ধর্মের অগ্রাধিকার শেখাবার শত সহস্র প্রচেষ্টা আজও মানুষের জৈব প্রকৃতিকে সংশোধন করতে পারে নি. জৈব প্রবৃত্তিকেও সংযত করতে পারে নি, দমন করতে পারে নি। মানসিক ভিত্তি প্রস্তুতির পুনঃপ্রচেষ্টা ব্যবহারিক অর্থে শিক্ষার মাধ্যমে এবং পরিপূরক হিসাবে তাই বিজ্ঞানের সহায়তা বাস্তব জীবনে আবশ্যক। হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধ-লোভ অবদমনে শিক্ষা এবং প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগ যেমন সমাজ রক্ষায় অবশ্যম্ভাবী তেমনি শুধু সহানুভূতি নয় কঠোরভাবেই কামপ্রবৃত্তির ফলস্বরূপ জন্মনিরোধের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। জৈব প্রবৃত্তির অবদমনে কর্তব্য-বুদ্ধিকে সজাগ করে তোলা দরকার। কথাটা নিষ্ঠুরের মতো শোনালেও ভেবে দেখা দরকার যাদের আয় নেই, উপার্জন নেই, যারা পথে বাস করে, ভিক্ষাবৃত্তি যাদের অবলম্বন পরের গৃহে দাসদাসী-বৃত্তি যাদের অবলম্বন, যারা রুগ্ন এমনি আরও অনেকে যদি বিকারগ্রস্ত না হয়, যদি নিজের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুমাত্র চেতনা থাকে তাহলে স্বেচ্ছায় তারা সাবধান হয়। যদি শিশুরা সুস্থভাবে উপযুক্তভাবে প্রতিপালিত না হয় তবে রুগ্ন-অশিক্ষিত-ক্ষীণকায় সেই সব শিশুদের দ্বারা সমাজের কি

উপকার সাধিত হতে পারে? তাদের ব্যক্তি-জীবনেরই বা ভবিষ্যৎ কতখানি উজ্জ্বল? অবাঞ্ছিত সংখ্যাবৃদ্ধির অর্থহীনতা সমাজের নিচু তলার মানুষেরা বুঝতে শিখলে তবেই হয়তো ভয়াবহ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন কিনারা হতে পারে। পিতা-মাতার এই কর্তব্যবুদ্ধি জাগা চাই— যে-সন্তানকে প্রতিপালনের ক্ষমতা নেই, সে-সন্তানকে পৃথিবীর আলো-হাওয়ায় ভূমিষ্ঠ করবারও অধিকার নেই তাদের। আমাদের দেশে সাধারণ গৃহস্থের যা অবস্থা তাতে একটি বা দুটি সন্তানের অধিক সন্তান হলে মানুষ করে তোলা কষ্টকর। শিক্ষিত সমাজকে এ-বিষয়ে সতর্ক করার দরকার হয় না। যেখানে অশিক্ষা ও অজ্ঞতা সেখানেই সাবধান-বাণী পৌঁছানো দরকার। সরকারী নীতিতে কোন ধর্ম বা জাতির প্রতি সহজ ভাব ধারণের স্থান কম। সমাজ যখন সমস্যাভারে বিপন্ন তখন দলীয় রাজনীতির কাছে নতিস্বীকারের অবকাশও সরকারের থাকে না। সর্বক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা প্রত্যাশিত।

তিন

এই পর্যায়ে বিচার্য হবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় কয়েকটি মূল নীতি যা সমগ্র ভারতসমাজে সমানভাবে প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে ইংরেজ-প্রবর্তিত এ-যাবৎকাল প্রচলিত ব্যবস্থায় এমন পরিবর্তন প্রয়োজন যা লক্ষ লক্ষ বেকার সৃষ্টি রদ করবে। এই নীতি মুখ্যত সমাজ-জাগরণের কুশলী মন্ত্রণায় পর্যবসিত হলেই সার্থক হবে। উগ্র ব্যক্তিবাদের পরিবর্তে সমগ্র সমাজ-চেতনাই হবে সে শিক্ষার ফলশ্রুতি। এই শিক্ষা যেন ব্যক্তিকে বুঝবার সুযোগ দেয় সমাজে ব্যক্তির যথার্থ স্থান কোথায়। সর্বরাজ্যে সর্বস্তরের প্রাথমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় একযোগে মূলনীতিগুলি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ দ্বন্দ্ব বিরোধের আশঙ্কা থেকেই যাবে। একটি গোষ্ঠীর ব্যর্থতা, অপর গোষ্ঠীর সুযোগপ্রাপ্তি, রক্ষণশীলতা বা উষ্মা-অবজ্ঞা-দাম্ভিকতায় এক ধরনের অসুস্থ পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনাও থেকে যাবে। একথা বলাই বাহুল্য যে এমন আদর্শ অবস্থা কোন সমাজেই কোনদিন আসবে না যেখানে প্রতি ব্যক্তিই সুখী বা সন্তুষ্ট। তথাপি আশা করা হচ্ছে যদি নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি উপরিউক্ত পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাধান্য

পায় বা অবশ্য-শিক্ষণীয় নীতি বলে গৃহীত হয় তবে ধীরে ধীরে সমাজের চারিত্রিক রূপ বদলাবে—

ক। জাতি, ধর্ম, ভাষা-সংস্কৃতির উগ্র অভিমান দূর করা,

খ। দরিদ্রের দীনতা ও বিত্তশালীর অভিমান দূর করা,

গ। স্বাস্থ্যসম্মত, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ জীবনযাপনের উপযোগী শিক্ষা দান,

ঘ। দেশের আইন-আদালত, রাজনীতি-সমাজ-অর্থনীতির কাঠামো কেমন সে-বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঙ। নির্বাচনের উদ্দেশ্য কি, ভোটদান পদ্ধতি কেমন, প্রজাতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব কি, নাগরিকের কর্তব্য কি, দাবী কি— সে-সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান,

চ। বৃহৎ ভারতবোধের উদ্বোধন,

ছ। সামাজিক সচলতা সহজীকরণ, প্রাদেশিকতা দূরীকরণ,

জ। গ্রাম-সমাজের অর্থনৈতিক সুস্থ অবস্থা কিসের উপর নির্ভরশীল সে-বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঝ। ব্যক্তির সুস্থ জীবনযাপনের জন্য কমপক্ষে কতটুকু স্থান ও সুসম খাদ্যের প্রয়োজন সে-সম্বন্ধে অবহিত করা,

ঞ। খাদ্যের উৎস কি, লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ কি, ঘাটতি কতটা, কীভাবে তা পূরণ হয়, ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান,

ট। শস্য ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যাদির পরিমাণ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান দান,

ঠ। কেন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম সাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার অতিরিক্ত হয়ে পড়ে, কীভাবে সাধারণের পক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহজলভ্য হতে পারে, ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দান,

ড। প্রতি বৎসর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কী ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে— বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি চাষ-আবাদের কি প্রকার ক্ষতি করে, তার ফল কীভাবে সমাজে অনুভূত হয়, যাতায়াত ব্যবস্থায় কি পরিমাণ অসুবিধা সৃষ্টি হয় বা হতে পারে— সে-সম্বন্ধে জ্ঞান দান,

ঢ। অসুস্থ হলে আমরা কি করি, কার কাছে যাই, চুরি-ডাকাতির

ভয় থেকে আমরা কীভাবে অব্যাহতি পাই— সমাজ রক্ষণা-বেক্ষণের ভার কাদের উপর ন্যস্ত সে-বিষয়ে জ্ঞান দান,

ণ। কত রকমারি শিল্প আছে আমাদের দেশে, ক্ষুদ্র শিল্প, ভারী শিল্প, কুটির শিল্প ইত্যাদি, কেমন করে লেনদেন হয়, আমদানি রপ্তানী কীভাবে হয়, এক দেশের সঙ্গে আর-এক দেশের রাজ-নৈতিক যোগাযোগ কীভাবে ঘটে এবং চালু থাকে, বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ কীভাবে রক্ষা পায়,

ত। খনিজ দ্রব্য কত প্রকার আছে আমাদের দেশে, কোথায় আছে, কী ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্যে ভারত উন্নত বা অবনত ; পণ্যসম্ভার কীভাবে এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে, এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যায়, কে বা কারা সেসব কাজে যুক্ত থাকে ; ইত্যাদি বহুবিধ সংবাদ, জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র দিক শিশু ও কিশোরের সম্মুখে উন্মোচিত হলে তবেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক সচেতনতার বিকাশ ঘটে বা সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘস্থায়ী নাবালকত্ব, একদেশদর্শী মনোভাব, বহু প্রকার আবেগ অভিমান সমাজ-মন থেকে দূর হতে সহায়তা করে।

স্বীকার করা ভালো যে, স্বাক্ষরতা শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বটে কিন্তু যথেষ্ট নয়। স্বচেষ্টায় গ্রন্থাদি পাঠ করে মোটামুটি একটা ধারণা জন্মাতে অন্তত দশ বছরের বিদ্যালয়ের পাঠ, পরবর্তী চার-ছয় বছরের শিক্ষা প্রয়োজন। বয়সের অভিজ্ঞতায়, শিক্ষার প্রভাবে ও পরিবেশ পরিস্থিতির গুণে সাধারণ মানুষের মানসিক পরিণতি ঘটে। কিন্তু যদি শৈশব-কৈশোর অবস্থায় সমাজ ও জীবনের নানা সংবাদ পরিবেশন করা যায় কতগুলি মূল্যবোধ গেঁথে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে মানসিক ক্রমপরিণতি যৌবনেই বিকশিত হতে পারে। বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রেও একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। স্বাক্ষরতা শিক্ষার আনুষঙ্গিক-রূপে সমাজ ও জীবনের নানা সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আত্যন্তিক প্রয়োজন।

বলাই বাহুল্য প্রচলিত শিক্ষাধারায় পরিবর্তন আনতে গেলে বহুবিধ সমস্যা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে। বিশেষত সচ্ছল ঘরের, ধনী ঘরের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বাধা আসবে, কারণ উচ্চকোটির অভিভাবকদের স্ব-স্ব সন্তানের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি থাকে, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ উচ্চ ধারণা থাকে। অভি-

ভাবকদের বিশেষ মতামত আছে, ভালো-মন্দ বিচারেও তারা তীক্ষ্ণ। বহু শিক্ষকের ভ্রূকুটি সহ্য করতে হতে পারে, কারণ পাঠ্যপুস্তক গলাধঃকরণ ও পরীক্ষা পাসই এ-শিক্ষার অন্তিম বা একান্ত উদ্দেশ্য হবে না বলে, এবং শিক্ষাবিদও একমত না হতে পারেন। অবোধ শিশুর নিষ্পাপ সরলতা ভেঙে দিয়ে এই শতাব্দীর খরমধ্যাহ্নে জাগিয়ে তুলতে তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারেন। হয়তো তাঁদের মনে হবে অলীক কল্পনার ইন্দ্রজালে ঘেরা মায়া রাজ্য সৃষ্টিই উৎকৃষ্টতম নীতি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে সচেতন করে তোলা তাহলে উপরিউক্ত সাধারণ জ্ঞান ও বাস্তববোধের শিক্ষা দানের যথেষ্ট সার্থকতা আছে— বিশেষত যখন সমাজের বঞ্চিত জনজীবনের সামাজিক উন্নয়ন আমাদের কাম্য। দ্বিতীয়ত আজ যখন সুস্পষ্ট যে, শতাব্দীকালের অনুসৃত শিক্ষার ফলে ভয়াবহ বেকারসমস্যা ও বিচ্ছিন্ন সংহতি পরিদৃশ্যমান— সেই পরিস্থিতিতে প্রচলিত নীতি বা ধারার পরিবর্তন হবে না-ই বা কেন?

সমাজ-মানসিকতা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে গ্রাম-শহর-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে, ইংরেজী দেশীয় ভাষা মাধ্যম সরকারী-বেসরকারী ধর্মীয় ইত্যাদি বিদ্যালয়ের শ্রেণীগত পার্থক্য নির্বিশেষে সমগ্র ভারতসমাজে শিশু-শিক্ষায়, মাধ্যমিক-শিক্ষায় ও বয়স্ক-শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষানীতির মূল দর্পণ যদি হয় জাতীয় জাগরণের উদ্দেশ্যে সমতার শিক্ষা দান, তবে আশা করি সমাজের সর্বস্তরে কতগুলি ভাবধারণা-মূল্যবোধ জাগা সম্ভব। একদা প্রাচীন ভারতসমাজে ধর্মশিক্ষা-সমাজশিক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ছিলো। যুগ-বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা এসেছে। আজকের বিদ্যালয়ে ব্যবহারিক শিক্ষায় বিশেষ ধর্মশিক্ষা অঙ্গীভূত নয়, কিন্তু মানবধর্ম-বিচ্যুত শিক্ষাও হতে পারে না। সমাজশিক্ষা মানবধর্ম-শিক্ষা না থাকলে কেবলমাত্র বিষয় শিক্ষা ব্যবহারিক বিদ্যাশিক্ষা মানবচরিত্রের পূর্ণবিকাশ ঘটাতে পারে না। পরাধীন ভারতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মিবৃন্দের শিক্ষাব্রতীর ভূমিকা ছিলো সমাজ-শিক্ষায়। দুর্ভাগ্যবশত স্বাধীন ভারতে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের ভ্রষ্ট চরিত্রই সমাজে স্পষ্ট। ধর্মগুরুর ভূমিকা এ-যুগের সমাজে সংকীর্ণ। শিক্ষাব্রতীই এখন একমাত্র ভরসা।

চার

পশ্চিমবঙ্গকে আদর্শরূপে ধরা যাক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গোষ্ঠী ও মতবাদ নিরপেক্ষভাবে এই নীতি পোষণ করে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। এই রাজ্যে ত্রিশ হাজার গ্রামে কোথাও কোথাও প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। অনুমান করা যাক, প্রায় ত্রিশ হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হ'লে অন্তত ষাট থেকে নব্বুই হাজার শিক্ষিত ছেলেমেয়ের কাজ জুটবে। আমি গ্রামের কথাই উত্থাপন করছি এইজন্য যে, শহরে সম্ভবত বেসরকারী ধর্মীয় বিদ্যালয়-গুলি সরকারী অর্থসাহায্য ব্যতীতই কাজ চালাতে সক্ষম, সেসব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনেক বিষয়ে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র; এমনকি বিত্তবান সচ্ছল অভিভাবকদের সহায়তায় সেসব বিদ্যালয় থেকে সরকারী নীতির বিরোধিতাও হতে পারে। শহরের বড় বড় সরকারী বিদ্যালয়গুলির সেটআপে অভ্যস্ত শিক্ষকদের পক্ষেও বিরোধিতা করা সম্ভব, অসন্তোষ প্রকাশ করাও স্বাভাবিক। সুতরাং প্রথম ধাপে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও শহরাঞ্চলে সরকারী সাহায্যপুষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অধিকতর সুযোগ আছে বলে সেখানেই শুরু হওয়া যুক্তিযুক্ত। ধীরে ধীরে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের সহায়তায় ব্যাপকতর ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়।

উপরিউক্ত ত্রিশ হাজার গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হওয়া উচিত ষাট থেকে নব্বুই হাজার উচ্চশিক্ষিত বা বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত উৎসাহী কর্মী, আশাবাদী তরুণ সম্প্রদায়— যারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির দিকে বিশেষ নজর দেবে। শুধু জ্ঞান আহরণে, সঞ্চয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বাস্তবে প্রয়োগের নিপুণতা যেমন নবীন শিক্ষকদের আয়ত্তে থাকবে তেমনি তাদের কাজ হবে শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীকে উদ্দীপিত করে তোলা। অনুমান করা যাক প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত তিনজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা নিযুক্ত হবে, প্রধান বা প্রধানা এম-এ বা বি-এ পাস অবশ্যই হবে, দ্বিতীয় জন যদি স্কুল-ফাইনাল হয় তবে শিক্ষণ-শিক্ষা অবশ্য থাকা চাই এবং তৃতীয় জন সংগীত, সুচীশিল্প অন্যান্য হাতের কাজ বা রন্ধনবিদ্যায় পারদর্শী হবে।

মঠ-মাদ্রাসা-গুরুকুল পণ্ডিচেরী মিশনারী স্কুল কন্‌ভেণ্ট ইত্যাদির সঙ্গে এই বিদ্যালয়গুলির চরিত্রগত পার্থক্য এই যে, কোন একদেশ-

দর্শিতার আবর্তে না রেখে সমাজের বঞ্চিত সন্তানদের সামনে বৃহত্তর সমাজভাবের অনুকূল একটি বাস্তববাদী কার্যকরী শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করা, যার দ্বারা ব্যক্তি-সমাজ-জীবন-রাষ্ট্র-আন্তরাজ্য-আন্তর্জাতিক পরস্পর সম্বন্ধ ও বর্তমান যুগ ও জীবনের পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মায়। আইন-আদালত-শিক্ষা-ধর্ম-সরকারী শাসনযন্ত্রের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ স্থিতি এগুলির পারস্পরিক যোগ এবং এই সব-কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিকের তথা নাগরিকের অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মায়।

তরুণ উৎসাহী, আশাবাদী শিক্ষকদের যেন শিক্ষার এই নীতি তথা উদ্দেশ্য ও সে-উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হবার পথটি সম্বন্ধে উপায় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শিক্ষণ-শিক্ষায় NCERT প্রবর্তিত কেন্দ্রগুলির সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষণকেন্দ্রগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়। কর্ণাটক, হায়দ্রাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি স্থানের ভাষা-শিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে অন্য রাজ্য মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলি তথা শিক্ষণ-শিক্ষা কেন্দ্রগুলির যোগাযোগ অবশ্যকর্তব্য। শিক্ষকদের কর্মে নিয়োগের পূর্বে জেলা পরিষদের পক্ষে সেই জেলার সমস্ত প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সভা ডেকে শিক্ষানীতি কার্যকরী করার গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত হবে। পরে সর্বদা লক্ষ রাখতে হবে যাতে সুষ্ঠুভাবে সেই নীতি যথাযথ পালিত হয়। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণীয়, রাজ্যের বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, জনসংযোগ, খাদি গ্রামোদ্যোগ বুনিয়াদী শিক্ষা বিশ্বভারতীয় লোকশিল্প সংসদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এই বিদ্যালয়গুলির সরাসরি যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। নবীন শিক্ষকদের সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে যে, পার্শ্ববর্তী গ্রামের জেলা শহরের বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যেন নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষিত হয়। মাঝে মাঝে স্থানীয় বয়স্ক ব্যক্তিদের একত্র করে জেনে নেওয়া দরকার হবে তারা কি বিষয়ে জানতে চায়, তাদের ছেলে-মেয়েদের কী বিষয়ে শিক্ষা দিতে চায়, কী বিষয়ে শিক্ষা দিলে গ্রামের সমাজে কাজে লাগবে বলে তারা মনে করে ইত্যাদি। এইভাবে শিক্ষকদের জানতে হবে বিশেষ বিশেষ গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে বিশেষ কোন্ কোন্ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে কৃষি, মৎস্য চাষ, ফলের চাষ, ফুলের চাষ, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, গালার কাজ, কুমোরের কাজ, ছুতোরের

কাজ, মাটির পুতুলের কাজ, পট তৈরির কাজ, মিষ্টান্ন প্রস্তুতের কাজ ইত্যাদি শিক্ষার স্থান-বিশেষে বিশেষ চাহিদা আছে। বহু ধরনের হাতের কাজ, কারিগরী, শ্রেণী বিশেষের মন্ত্রগুপ্তি না থেকে যেখানে চাহিদা আছে সেখানে শেখানোর ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে নানা বিষয়ে পারদর্শী বহু লোক স্থানীয় বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে পারে। ব্লক ডেভেলপমেণ্ট বিভাগের সহায়তায় এইসব পারদর্শী ব্যক্তিদের সন্ধান পাওয়া সহজ। জেলা-শহরে বহু গান-বাজনা জানা ছেলে-মেয়ে আছে, বয়স্ক সংগীত শিক্ষক আছেন যাঁরা স্থানীয় প্রাথমিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে পারলে বাঁচার পথ খুঁজে পাবেন।

পূর্বে উল্লেখ করেছি প্রযুক্তির দিকটায় নজর দেওয়া অত্যাবশ্যক। বড় শহরে মফস্বল শহরে শিশু-কিশোরের সামনে জীবনের নানা দিকের, নানা অবস্থার উপকরণ থাকে, তারা অনেক-কিছুর সঙ্গে বাস্তবভাবে পরিচয়ের সুযোগ পায়, গ্রামে তা আদৌ নেই। অল্পসংখ্যক লোক বিশেষ জীবনের ছাঁদ, পরিমিত পরিবেশে এরই মধ্যে বেড়ে ওঠে গ্রামের শিশু-কিশোররা। শিক্ষকদের সেই জন্য নানা দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যকর্তব্য। বই-এর পাঠ তো বটেই, তদতিরিক্ত গান-বাজনা, সেলাই, রান্না বিবিধ শিল্প শিক্ষা, মাঠে-ঘাটে হাতে-কলমে কাজ, খেলাধুলা, ব্যায়ামের ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যুক্ত থাকা অবশ্যকর্তব্য। মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক ছবি দেখানো, (ভারতের বিভিন্ন স্থানের, দেশ-বিদেশের, বিভিন্ন সভা-সমিতি প্রকল্পের কাজের ইত্যাদি) নাটকের আয়োজন করা, বিভিন্ন ব্যক্তিকে আহ্বান করে কথা বলার আসরের ব্যবস্থা করা দরকার। অর্থাৎ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়টি মুখ্যকেন্দ্র হয়ে বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, গ্রন্থাগার, ইত্যাদি সহযোগী অঙ্গস্বরূপ হ'লে গ্রামজীবনে অচিরে পরিবর্তন আসা সম্ভব হবে। মনে রাখতে হবে, এইসব উদ্যোগী ব্যবস্থা বিভিন্ন বিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা সরকারী নির্দেশনার থেকেও জরুরী। গ্রামের মেয়েদের জীবনে সংগীত, সূচীশিল্প, হাতের কাজের সুযোগ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবে। ঘর-সংসারের নানা দায়িত্ব বহন ও সন্তান পালন অবশ্যকর্তব্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তদতিরিক্ত মানসিক বিকাশের সমূহ প্রয়োজনীয়তা প্রাচীন সামাজিকেরা বুঝতেন বলেই সেই মানসিক অবলম্বনের খোঁজে ধর্ম

অনুষ্ঠানে ব্রতনিয়মপালনে নারীসমাজকে প্রবৃত্ত করিয়েছিলেন। এ-যুগের জটিলতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা, সমস্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিম্ন কোটিতেও পুরুষ-নারী উভয় পক্ষের বিষয় সচেতনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। ব্যবহারিক শিক্ষার দ্বারা, রুচিশিক্ষা, কলাশিক্ষার দ্বারা সাধারণ ঘরের মেয়েদেরও মানসিক প্রসারের পরিণতির প্রয়োজন আছে, অন্যথায় বহু সামাজিক সমস্যার নিরসন অসম্ভব হবে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী বুদ্ধি বাস্তব দৃষ্টিও জাগা সম্ভব শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই। একদিকে সচ্ছল জীবনযাপনের ইচ্ছা, অপরদিকে ধর্ম সংগীত শিল্প নানাবিধ কর্ম সমাজ-সেবা রাজনীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রতি আগ্রহে জৈব প্রবৃত্তি দমনের উপযুক্ত রুচি বুদ্ধি জাগা সম্ভব, সন্তান ধারণের জৈব ইচ্ছা অবদমনে সহায়ক হতে পারে। ভাগ্যের উপর নির্ভর না করে ব্যবহারিক উপায় অবলম্বনের বাস্তব বুদ্ধি ও মানসিক প্রস্তুতি হওয়া সম্ভব শিক্ষার প্রচ্ছন্ন প্রভাবে। এইভাবে বিবাহের বয়স থেকে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অর্থাৎ প্রজননের স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকাকালীন সন্তান সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে অস্ত্রোপ্রচারেও আপত্তি উঠবে না মেয়েদের পক্ষে। মনে হয়, পুরুষরাও এ-বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হয়ে উঠবে নিজের ক্ষমতা সীমায়িত করায় বাধা হবে না, অস্ত্রোপচারের গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

আজ থেকে কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যেই সুফল লক্ষ করা যাবে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি সত্বর কার্যকরী করা সম্ভব হ'লে। যে-দলই যে-রাজ্যে সরকার গঠন করুক, এই দায়িত্বে সদ্যসচেতন ও সক্রিয় থাকা প্রয়োজন। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী কেন্দ্রের শিক্ষামন্ত্রী যে-দলমতের সমর্থক হোক, ব্যক্তি-অভিমতের প্রাধান্যে শিক্ষামন্ত্রকের নীতি সতত চঞ্চল হলে সাধারণ সত্য অবহেলিত হবে, অথচ সাধারণ কতগুলি সত্য মেনে নিতে না পারলে. ভারতবর্ষের জনজীবনের অবস্থার উন্নতি ও মানসিকতার পরিবর্তন সুদূর পরাহত। একথা স্মরণ রাখা ভালো যে সর্বপ্রকার উদ্যোগী তৎপরতা সৎ চেষ্টা বানচাল করে দেবার জন্য সমাজের মধ্য থেকেই অবাঞ্ছিত শক্তি সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, পরে অকৃতজ্ঞ সমালোচনা, অবজ্ঞা অস্বীকৃতি সেই সমাজের মধ্যে থেকেই আসতে পারে যাদের জন্য এই ভাবনা এবং প্রাণপাত ব্যক্তি প্রচেষ্টা ও সমবেত শুভ ইচ্ছা। কাজেই সরকারের পক্ষে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও শিক্ষকের বিদ্যালয়ের সর্বপ্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান প্রাণ রক্ষার্থে তীক্ষ্ম ও সজাগ দৃষ্টি রাখা অবশ্যকর্তব্য,

তেমনি শিক্ষক তথা শিক্ষাবিদ সম্প্রদায়ের পক্ষে সব-কিছু উপেক্ষা করে সমাজহিতৈষণাই অন্যতম ব্রতরূপে গ্রহণ করা সমীচীন। একথা সর্বজন-বিদিত যে শিক্ষাহীন উত্তেজনা মানুষকে বিবেকহীন কাজে ঠেলে দিতে পারে যদি তার সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যক্তিজীবনের অসাফল্য, আর্থিক কৃচ্ছ্রতা, ক্ষুধা-অনাহারের জ্বালা, তবে ফল হয় মারাত্মক। সামাজিক অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা-বিশৃঙ্খলা বিদ্বেষের অন্যতম প্রধান কারণ অর্থ-নৈতিক বিধ্বস্ত অবস্থা ও আনুষঙ্গিক শিক্ষাহীনতার কুফল।

এতদ্ব্যতীত জীবন-মানের বৈষম্য পর্যুদস্ত অবস্থা ব্যর্থভাব শিক্ষিত চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের যে কী হাল সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিয়ে সরকার শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষায় আনুকূল্য করতে উদ্যোগী হবেন। যে-কোন পর্যায়েই হোক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতন-মান তার বয়স-অভিজ্ঞতা শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত; প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা কলেজী বিদ্যালয়ের পার্থক্যে বেতনহারের পার্থক্য রাখা যুক্তিযুক্ত বলে বোধ হয় না। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতনহারের পার্থক্য থাকবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শিক্ষক-পদের প্রার্থী যদি এম-এ পাস হয় তা সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ হোক আর বিশ্ববিদ্যলেয়ের শিক্ষকতা হোক, তাতে বেতনহারের পার্থক্য রাখার কারণ কি? যদি স্ব-স্ব যোগ্যতায় বা সময়ের ব্যবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পাস শিক্ষক ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন বিদ্বজ্জন সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন, তবেই তার বেতনহারের উচ্চমান প্রাপ্তির যথার্থতা। অন্যথায় এম-এ পাস প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সঙ্গে সদ্য এম-এ পাস কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনহারের অসাম্য রেখে এবং সেই সূত্রে পূর্বাহ্ণে যোগ্যতা বিচার সম্পূর্ণ অর্থহীন। এই অর্থহীন অসাম্যের প্রকট পরিচয় আমাদের সমাজে বহুক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। ফল যে কতটা মারাত্মক তা সমাজবিজ্ঞানী মাত্রেই অবহিত আছেন। একথা আমরা সাধারণ সামাজিকেরাই বা কে না জানি যে একদিকে উচ্চ-শিক্ষিত মাধ্যমিক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকের মনে ব্যর্থতা, পরাজয়ের গ্লানিবোধ, আর-এক দিকে মধ্যম-শিক্ষিত গুণগত উৎকর্ষের অভাব আছে এমন লোকের আধিক্য ও তাদের হাতে শিক্ষার ভার— এই দুয়ের টানা-পোড়েনে প্রাথমিক-মাধ্যমিক-কলেজী শিক্ষা এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষা নিম্নমানের দিকেই গতিশীল। যদি উচ্চ শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ না পেয়ে গ্রামের প্রাথমিক কি মফস্বলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করতে বাধ্য হয় স্বাভাবিক কারণেই তারা ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট হতে পারে— বিশেষত বেতনহারের বৈষম্যের দরুন তাদের ব্যর্থতাবোধ জাগে। বেতনহারের সমতা রক্ষা করে, যোগ্যতার মাপ-কাঠি বিচার করে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক সম্প্রদায়ের মানসিক সুস্থতা অনেকটাই বজায় রাখা যায়। অবশ্য পরিবেশের পার্থক্য থাকবেই।

পাঁচ

গ্রামীণ বিদ্যালয়ের প্রস্তাবটি কার্যকরী করে তুলতে রাজ্য সরকারের বাৎসরিক কয়েক কোটি টাকা শিক্ষাখাতে অধিক ব্যয় করতে হবে। রাজ্যের বিত্তশালী সম্প্রদায়, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ব্যাঙ্ক, সম্পত্তি-শালী উচ্চকোটির নাগরিকেরা অনায়াসেই এই শিক্ষাপ্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে পারে।

প্রস্তাবিত শিক্ষা সমাপ্তির পর গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা আদৌ শহরমুখী হয়ে না ওঠে যেন। তারা গ্রাম-সমাজেরই সম্পদ— এই-দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর দরকার হবে। অর্থাৎ সেই উদ্দীপনা সৃষ্টিই হবে মুখ্য উদ্দেশ্য। শিক্ষণীয় বিষয়ের নির্বাচন, পাঠদানের পদ্ধতি এবং পাঠ্যপুস্তক রচনায় সর্বদা সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সজাগ থাকা প্রয়োজন। তবে এমন ব্যবস্থা থাকা চাই যে, তীক্ষ্ণধী, যথার্থ মেধাবী শিক্ষার্থী পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে প্রবেশের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা পায়। অন্যথায় সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি, মনীষার অপচয় হবার সম্ভাবনা।

এই সূত্রে একটি বিবেকী অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলবার প্রয়োজনীয়তা ও দিকদর্শনা পাঠক সমাজের উদ্দেশে তথা রাজ্য ও জাতীয় সরকারের উদ্দেশে রাখার চেষ্টা করা যাক। ধর্মে-শাস্ত্রে সর্বদাই লোভ অবদমনের বাণী উচ্চারিত, প্রবাদে আছে বারংবার, অসারতা প্রমাণের চেষ্টা যে, ধন-জন-যৌবনের গর্ব বৃথা। নিমেষেই কাল সর্বস্ব হরণ করে নিতে পারে, নেয়। কিন্তু ধনবিকার, জনগর্ব, যৌবনমত্ততা

থেকে মুক্তি কোথায়? মুক্ত কয়জন? সমাজে আছে রূপের বেসাতি, শক্তির দম্ভ, ধনের প্রচণ্ড লোভ, ধনের গর্ব, অহমিকা ঔদ্ধত্য, ভোগের অপরিসীম আকাঙ্ক্ষা। কোন্ ক্ষেত্রে সংযম আছে? আধুনিক ভারত-সমাজে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীর মতো ব্যক্তিত্বের প্রভাবও গোষ্ঠী-বদ্ধ হয়ে আছে— সমগ্র ব্যাপ্ত নয়। এ-যুগে পূর্ব-পশ্চিমের কিছুসংখ্যক মনীষী সমাজ মনোভাবের উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মনস্বী শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী তথা অর্থনীতিবিদ্‌গণ অনুকূল মনোভাবের সমর্থক। যতদূর বোঝা যাচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, আইন-কানুন অর্থনীতি ও সমাজ-কাঠামো সব-কিছুর সমন্বয়ী প্রভাবে একটা দেশে, সমাজ-চরিত্রে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাধারার পরিবর্তন ও অর্থনীতির যোগ্য বিন্যাসের সুষ্ঠুতা-উপযুক্ততায় সমাজে উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে আমূল পরিবর্তন মূলত সম্ভবপর হয়। সুতরাং সমাজ ও অর্থনীতির কাঠামোটার স্বরূপ সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের একটা সাধারণ পরিচয় থাকা দরকার। দুঃখের বিষয় জনসাধারণের কথা দূরে থাক, রাজনৈতিক কর্মী যারা নাকি স্থানীয় সমাজের মাতব্বর তাদের মধ্যেও সে-জ্ঞানের অভাব লক্ষ করা যায়। সাধারণের সুখ-দুঃখ অভাব-অভিযোগের সঙ্গে যেমন প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকে দলনেতাদের তেমনি থাকা দরকার সমাজ ও অর্থনীতির বিন্যাস সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা। শুধু ইডিওলজি বা ইজম্ যথেষ্ট নয়। অসন্তুষ্ট বা অজ্ঞ বা ক্ষুব্ধ মানুষকে রুষ্ট করে তুললেই ক্ষিপ্ত আন্দোলন কিন্তু মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ কোন স্থায়ী ও সুস্থ-সুষ্ঠু নতুন পরিকল্পনা গড়ে তুলতে পারে না। অর্থ-নীতিক বৈষম্য দূর করা বা অর্থনীতি কব্জা করা যায় না। শ্রমিকের শক্তিই মালিকের সমৃদ্ধির কারণ, মুনাফার মেরুদণ্ড। অতএব ঘেরাও বা ধর্মঘট করে কার্যসিদ্ধি বেতনবৃদ্ধি এ যেমন একঝোঁকা প্রচেষ্টা, তেমনি কৃষকদের ধর্মঘট জোতদার খুন, ব্যবসায়ী খুন, শিল্পপতি খুন, বাজারে মারধোর, চোরাগোপ্তা, ট্রেনে ছিনতাই, প্রতিকারহীন ভ্রষ্ট রাজনীতি। অবিমৃশ্যকারিতার নামান্তর। কৃষককে জমি চাষ না করার উসকানি, সর্বস্তরের কর্মী ও শ্রমিকের মধ্যে কর্মবিরতির প্রবর্তনা, পরোক্ষ যে সামাজিক বিপন্নতাই ডেকে আনে ইতিহাসে সেই ফলশ্রুতির নজিরই প্রধান। তাই সব দেশের সমাজেই সমাজ তথা অর্থনীতির বিন্যাস ব্যবস্থাটা সঠিক অনুধাবন করার চেষ্টা শুধু মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ.

থাকায় নয়, সর্বস্তরের মানুষের বুদ্ধিগম্য করে তোলার চেষ্টায় আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সাধারণভাবে সমাজের উচ্চকোটি বলতে আমরা বুঝি বিত্তবান সম্প্রদায়—কলকারখানা ইত্যাদি বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিক, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ধরনের সংস্থায় যুক্ত ধনী কারবারী, শিল্পপতি, শিল্পসংস্থা-ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক বা উপদেষ্টা, উচ্চপদস্থ সরকারী বেসরকারী বিভাগীয় কর্মচারী, ধনী লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বাধীন বৃত্তিজীবী, ইত্যাদি। এবং সচ্ছল শিক্ষিত সম্প্রদায়। সংস্কৃতিবান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উচ্চকোটির পর্যায়ভুক্ত কিনা আর্থিক মানের বিচারে—সে-বিষয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে। শ্রেণী-বিশেষের প্রতি বিদ্বেষ বা বিষোদ্গার না করে, কে বা কারা এবং কী-বিষয় দেশের সমাজের অর্থনীতির নিয়ামক—সে-সম্বন্ধে জনসাধারণের চেতনা সঞ্চারিত হলেই সমাজের অধিকতর মঙ্গল। দেশের সম্পদ—ব্যবসা-বাণিজ্য উৎপাদন-লেনদেন, এগুলি সম্বন্ধে একটি সাধারণ জ্ঞান, মোটামুটি ধারণা সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হওয়া আশু প্রয়োজন। অস্তিমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের কোন কিনারা করা সম্ভব কিনা সেই প্রত্যাশায় সাদামাটাভাবে সাধারণ সামাজিকের মনোভাব নিয়ে একটি বিবেকী বনিয়াদের প্রস্তাব দেওয়া যেতে পারে। সামাজিক হিতের জন্যই নানা ধরনের আইন-কানুন সমাজে প্রচলিত, সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের উদ্দেশ্যেই নানাপ্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রচার। তেমনি, যদি সম্ভব হয়, ব্যক্তিসম্পত্তি উচ্ছেদের বা অর্থমনস্কতা ভোগাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি সংযতকরণের প্রশ্ন তুলেই বহুদিনের নিষেধাজ্ঞা জারি করা। অবশ্য সকল সমাজেই আয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর নানা রকম লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বাবদ দেয় কর ইত্যাদি নির্ধারিত আছে। আবার কর ফাঁকি দেবার উদাত্ত সুযোগ রেহাই পাবার গুপ্তপথও বহুপ্রকার। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তে আনবার সৎ চেষ্টা কি নিম্নলিখিত উপায়ে করা যায় না?

যদি সমাজে প্রতি ব্যক্তির শ্রেণীর আয়-ব্যয়ের মাপকাঠিতে ধনসঞ্চয় ও সম্পত্তি দখলে থাকা বা সম্প্রসারের একটি সংগত মাত্রা নির্ধারিত থাকে, তদুপরি যদি প্রতি নাগরিকের পক্ষে আয়-ব্যয়-সঞ্চয়-সম্পত্তির অধিকার বা বিস্তৃতি ইত্যাদির বিবৃতি দেওয়া বাধ্যতামূলক জাতীয়-নীতি হয়, তাহলে প্রতিবৎসর সংবাদ সরকারের নখদর্পণে থাকতে পারে। এতদ্ব্যতীত ব্যক্তির কর্মগ্রহণের সময়, অবসর গ্রহণের সময় বা

দায়িত্বের অব্যাহতি প্রাপ্তির সময় উক্ত বিষয়ের ঘোষণা বিবৃতিদান আবশ্যিক নীতি হিসাবে গ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত। ব্যক্তির সংজ্ঞায় রাষ্ট্রপতি বা প্রধান, মন্ত্রিসভার সদস্য, শিল্পসংস্থা ব্যবসাকেন্দ্রের পরিচালক, উপদেষ্টা, আদালতের প্রত্যেক বিচারপতি, স্বাধীনবৃত্তিধারী আইনজীবী, চিকিৎসক, পূর্তকর্মী সকলেরই অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক হবে। দল, গোষ্ঠী, শ্রেণী, ধর্ম, গ্রাম-শহর-শিল্প-নগরে সর্বপ্রকার ব্যবধান-বিভেদ নির্বিশেষে প্রতি কর্মক্ষম উপায়ী-উপার্জনশীল নাগরিকের পক্ষে প্রযোজ্য হবে এই বিবৃতি দান ; তবেই মনে হয় ছলে-বলে-কৌশলে ফাঁকি দেবার প্রবণতা, অল্প সময়ের ব্যবধানে উৎকোচগ্রহণ, তহবিল তছরূপ করে অর্থসংগ্রহের ঐকান্তিক প্রবণতায় ভাঁটা পড়তে পারে। সঞ্চয়ের ঊর্ধ্বসীমা ও বিস্তৃতি, সম্প্রসারণের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারিত থাকায় ধনপুঞ্জীভূত করার গৃধ্নুতা দমিত হতে পারে। অধিকন্তু দেশের মাটিতে থাকাকালীন, দেশীয় কর্মক্ষেত্রে যুক্ত থাকাকালীন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশে অর্থস্থানান্তরে নিষেধাজ্ঞা জারি করে সুফল পাওয়া যেতে পারে। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় মাত্রেরই পক্ষে আয়ের কিঞ্চিৎ অংশ দেশে সঞ্চিত রাখা বাধ্যতামূলক ভারতীয় নীতি হতে পারে। এইভাবে উচ্চকোটির গগনচুম্বী স্ফীতি নিরোধের চেষ্টা, অপর পক্ষে নিম্ন আয়ের মানুষের উপর আর্থিক চাপ হ্রাসের চেষ্টা, সফল হতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে।

ছয়

মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসঙ্গ অবতারণার পূর্বে রাজ্য এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ পরিসংখ্যান বিভাগ এবং সংবাদ-পরিবেশন বিভাগ ইত্যাদির দ্বারা জনসাধারণের নিকট কীভাবে নানা বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হতে পারে, এবং তা উপকারে আসে ভেবে দেখা যাক। অর্থাৎ জনশিক্ষায় এইসব বিভাগের ভূমিকা কেমন হতে পারে চিন্তা করে দেখা যেতে পারে। সত্য কথা বলতে কি, খুব অল্পসংখ্যক অভিভাবকেরই সুস্পষ্ট ধারণা থাকে ৫/১০ বছর পরে ছেলে বা মেয়ে যদি শিক্ষা সমাপ্ত করে তাহলে কী ধরনের ভবিষ্যৎ সামনে। যদি বি-এ, এম-এ পাস করে তাহলে কী ধরনের কাজ কোথায় জোগাড় করতে সক্ষম হবে তা

অনেকেই আমরা অনুমানে সমর্থ হই না। অথবা যদি এম-এ না পড়ে বা পড়বার যোগ্যতা না থাকে, কি ছেলেমেয়েকে এম-এ পড়াবার মতো সামর্থ্য না থাকে তাহলে কি পড়া যুক্তিযুক্ত হবে, কী পেশার জন্য তৈরি হবে। কিংবা যদি ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার কি উকিল ব্যারিস্টার হবার জন্যই উচ্চাশা পোষণ করে তাহলে শিক্ষা সমাপ্তির পর সেইসব পেশার ক্ষেত্রে কীরকম চাহিদা থাকবে। আমরা সাধারণত সেরকম কোন বিশেষ চিন্তাভাবনা না করেই ছেলেমেয়েকে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাই। সাধারণ ঘরের অভিভাবকদের বিশেষ কোন প্ল্যান থাকে না, ছেলেমেয়েকে বিশেষ দিকে পরিচালনা করবার ক্ষমতারও অভাব দেখা যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ সমাজ পরিস্থিতির কোন স্পষ্ট ছবি বা ইঙ্গিত আমাদের সামনে ধরে দেবার ব্যবস্থা নেই। গতানুগতিকভাবে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা সমাপ্ত করে কলেজে ভর্তি হয়, কলেজের পাঠ শেষ হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার মধ্যে অনেক মেয়ের বিবাহাদি সম্পন্ন হয়। যাদের হয় না, হয় তারা চাকুরীর সন্ধান করে অথবা উচ্চশিক্ষার চেষ্টায় নিরত থাকে। ছেলেদের চাকরী-বাকরী না জুটলে সাধারণত বিবাহ হয় না, মোটামুটি শহরাঞ্চলে এইরকমই অবস্থাটা। তবে অবস্থাপন্ন ঘরে বা শিক্ষাদীক্ষাহীন নিম্ন-সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পবয়সে ছেলেদের বিবাহ হতে পারে। সম্ভবত যারা একটা কিছু নিয়ে বিদ্যা আয়ত্ত করে সেই বিদ্যার বিনিময়ে আয় উপার্জন বা চাকুরীর চেষ্টা মুখ্য (সচ্ছল শিক্ষিত অসচ্ছল উভয় সংসারেই) তাদের উপার্জনের উপায় বা আর্থিক প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত বিবাহাদি না হতেই দেখা যায়। তারাই উচ্চশিক্ষার্থে বা উপার্জনের উপায় না থাকাতে যোগ্যতা থাক্ বা না থাক বিশ্ববিদ্যালয়ে, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশাধিকারে বদ্ধপরিকর হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতা যে কর্মে নিযুক্ত ছেলে সেই কাজের দিকে ঝোঁকে। অথবা পরিবারে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পিতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা যে কর্মে কৃতী বা সফল, অনেকে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চায়। উচ্চশিক্ষিত বা সমাজের উচ্চকোটির কথা আমি বলছি না, তারা সবসময়েই সন্তানদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন, দেশের অবস্থা, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। যারা ততটা সচেতন নয় বা যাদের সীমাবদ্ধ

ক্ষমতা, ব্যয়সাধ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৫/৭ বছর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা-নিমিত্ত প্রেরণের সামর্থ্য নেই বা যারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কী হতে পারে সে-অনুমানে সিদ্ধ নয়, পারদর্শী নয়, তারা যাতে উপকৃত হয় এমন একটা সুব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাতে পারে উপরিউক্ত বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পরিস্থিতি কর্মখালির সংখ্যা এবং আগামী বছর কী অবস্থা দাঁড়াবে তার একটা আনুমানিক সম্ভাব্য ছবি উপরিউক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ইস্তাহারে থাকা দরকার। যার উপর নির্ভর করে সাধারণ অভিভাবকেরা আপন-আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী স্ব-স্ব সন্তানদের প্রবণতা অনুযায়ী তাদের কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত করতে পারে।

রাজ্যের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ পরিসংখ্যান বিভাগ, সংবাদ-সরবরাহ কেন্দ্র ইত্যাদি একযোগে উদ্যোগ সহকারে নিম্নলিখিত রূপ সংবাদ যাতে জনসাধারণের গোচরীভূত হতে পারে তার সহজ উপায় করতে পারে।

১। রাজ্যে কত প্রকার প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, কেন্দ্র, বিভাগ ইত্যাদি আছে, কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য-শিল্প প্রতিষ্ঠান, অপিস কাছারি, সরকারী-বেসরকারী নানাবিধ কর্মপ্রতিষ্ঠান, স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পুলিশ, ব্যাঙ্ক, খবরের কাগজের অপিস, ছাপাখানা, ইত্যাদি যাবতীয় কর্মপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, দোকান, ঔষধ ব্যবসায়, বিভিন্ন যানবাহন-বিভাগ, ভ্রমণ-বিভাগ, বেতার-টেলিভিশন কেন্দ্র, খেলাধুলা কেন্দ্র, হোটেল-রেস্তরাঁ ইত্যাদি সর্বপ্রকার কেন্দ্রে বা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত কর্মরত বিভিন্ন বিভাগের কর্মের সংবাদ দান ;

২। উপরিউক্ত সরকারী-বেসরকারী রকমারি কেন্দ্রে-বিভাগে-দপ্তরে সর্বক্ষেত্রে প্রতি বছর কত লোক নিয়োগের সম্ভাবনা সে-সংবাদ দান ;

৩। আগামী বছর বা পরবর্তী পাঁচ বছরে সে-সবক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্প্রসারণের ইঙ্গিত। আনুমানিক কতসংখ্যক কর্মী নিয়োগের সম্ভাবনা, তার ইঙ্গিত দান ;

৪। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য কোন খাতে ব্যয়সঙ্কোচ বা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে কিনা সে-বিষয়ে সংবাদ সরবরাহ ;

৫। কোন প্রতিষ্ঠানে, বিভাগে, কেন্দ্রে, সংস্থায় কি ধরনের কাজ হয়, সেইসব কেন্দ্রে ক্ষেত্র-বিশেষে কর্মীর কী ধরনের শিক্ষাগত বা গুণগত, শারীরিক শক্তিগত যোগ্যতা থাকা দরকার সেসব সংবাদ দান ;

৬। সর্বপ্রকার কর্মক্ষেত্রে বেতনহারের পার্থক্য নির্দেশ, বয়স-সীমার উল্লেখ ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহ ;

৭। ধরাবাঁধা চাকুরী ব্যতীত স্বাধীন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ কতটা, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সুযোগ আছে, রাজ্যের কোন্ কোন্ স্থানে সে-সুযোগ ঘটা সম্ভব, কোন্ কোন্ স্থানে কী-কী বৃত্তিজীবীর চাহিদা আছে, এবম্বিধ সংবাদ সরবরাহ ;

৮। দোকানপাট, হাটবাজার ইত্যাদির সংখ্যা কত, কোথায় কী আছে, কোথায় কখন হাট বসে, মেলা হয় ইত্যাদি। সেসব স্থানে লোক-সমাগম কেমন, কী ধরনের ব্যবসা-বাণিজ্য চলে সে-সংবাদ ;

৯। শিল্পাঞ্চলের যাবতীয় সংবাদ ;

১০। বড় শহরের কর্পোরেশন, ছোট শহরের মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগীয় কর্মব্যাপারে কর্মীর সংখ্যা— সম্ভাব্য কর্মখালির সংখ্যা— কী ধরনের কাজ সেখানে হয়, কী ধরনের যোগাযোগ সেখানে ঘটে, ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহ ;

১১। সর্বক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সংকেত দান।

এমনি বহুবিধ প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রতি বছর যদি পরিবেশন করার রেওয়াজ থাকে তাহলে জনসাধারণের পক্ষে সমাজ ও জীবনের চিত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়। সামান্য লেখাপড়া জানা মানুষের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছায়। শুধু কলকাতা শহরের সংবাদই যথেষ্ট নয়। প্রতি জেলা-শহরের ছোট বড় সব শহরের সংবাদ বিস্তারিত এবং যথাযথ-ভাবে পরিবেশিত হওয়া অত্যাবশ্যক। সেই সংবাদ গ্রামে গ্রামে পৌঁছানো দরকার। গ্রামের চাষী গৃহস্থ সাধারণ মানুষেরও জানা চাই গ্রামের জোতদার, গঞ্জের আড়তদার মহাজন ছাড়াও আর কার কাছে তারা খন্দকুটো নিয়ে যেতে পারে, উপযুক্ত দাম পেতে পারে, প্রয়োজনে টাকা ধার করতে পারে। যে জনমজুর খাটে, যে মুনিশ সেও যেন শুনতে পায়, গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুরুমহাশয়দের কাছ থেকে জেনে নিতে পারে, খেতে যখন কাজ থাকে না ঠিক সেই সময়টায় কোন্ অঞ্চলে মাটি কাটার কাজ হচ্ছে, কোন্ ব্যাপারী কোন্ হাটে গো-মহিষ নিয়ে যাবে, কোথায় কলকারখানার কাজে শ্রমিকের দরকার হবে— হয়তো সেসব জায়গায় তার কাজ জুটে যেতে পারে। এমনি বহুবিধ এবং বিস্তারিত

সংবাদ-সরবরাহ প্রভৃতির দ্বারাই উপরিউক্ত বিভাগগুলির কর্মতৎপরতায় সার্থকতা।

নানা জাতীয় সংবাদ শুধু সরকারী নথিপত্রে আবদ্ধ থাকলে জনসমাজের বুদ্ধি খেলে না। দলিল-দস্তাবেজী খাঁচ থেকে সর্বসাধারণের স্থলুক সন্ধানে কাজে এলেই সংবাদ সরবরাহের প্রগতি। বেতার, দৈনিক সংবাদপত্র, বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকা এই ধরনের সংবাদ পরিবেশন ও প্রচারের দায়িত্ব নিতে পারে— শুধুমাত্র কর্মখালির বিজ্ঞাপন, শেয়ার-মার্কেট বা সোনা-রূপার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির সংবাদ যথেষ্ট নয়, সাধারণের কাছে আরও সংবাদ পৌঁছে দেওয়া আবশ্যক। ডাকঘরে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, সরকারী দপ্তরখানায়, কোর্ট-কাছারিতে, ব্যাঙ্কে, হাসপাতালে নানা জাতীয় সংবাদ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য চার্ট করে টাঙিয়ে রাখা যায়।

এই ধরনের কাজের জন্য একদল শিক্ষিত লোকের দরকার হবে— বড় শহরের বিভিন্ন এলাকায় জেলা-শহরের প্রতি মৌজায়, রাজ্যের নানা অঞ্চলে, গঞ্জে, হাটে, গ্রামে ঘুরে-ঘুরে সংবাদ সংগ্রহ করা গ্রন্থনা করা গবেষণা করাই হবে তাদের কাজ। মার্কেট রিসার্চার, দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টার, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ এই ধরনের কাজে লিপ্ত, আমাদের দেশে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বা সংবাদ-পরিবেশন বিভাগে এই ধরনের কর্মী আছে বলে শুনি নি, এই ধরনের সংবাদ সংগ্রহ ও সমীক্ষায় ঐসব বিভাগ প্রবৃত্ত আছে বলেও মনে হয় না। এ ছাড়াও, জনসাধারণকে পরামর্শ দেবার ব্যবস্থা যদি ঐসব বিভাগে যুক্ত থাকে তাহলে উপকার হয়, তাদের অভিজ্ঞ মতামত সর্বসাধারণের গোচরীভূত হওয়া আবশ্যক। অন্তত এইসব মতামত ও সংবাদের উপর নির্ভর করে অভিভাবকদের সাধারণ বুদ্ধি পরিপুষ্ট হতে পারে।

আমাদের দেশে শিক্ষা কমিশন বসে, কিন্তু শিক্ষা গবেষণার স্থায়ী চেষ্টা বা সংস্থা আছে কি? শিক্ষাবিদগণ বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের সমীক্ষা বিভাগের প্রয়োজনীয়তা-কার্যকারিতা উপকারিতা সম্বন্ধে ভেবে দেখতে পারেন। শিক্ষা গবেষণা — সমীক্ষা বিভাগ ও উপরিউক্ত বিভাগগুলির সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারে। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হতে পারে— সমাজে বিভিন্ন শিক্ষার প্রভাব, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষা-নীতির প্রভাব অনুধাবন করা সমাজের মনোভাব— উন্নতি অবনতি

পর্যবেক্ষণ, শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করা শিক্ষাপদ্ধতির প্রণালীর ত্রুটি সফলতা পর্যালোচনা বিভিন্ন পাঠক্রমের সফলতা ব্যর্থতা কার্যকারিতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব নিরীক্ষণ, বিভিন্ন বৃত্তিশিক্ষা-শিল্পশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর কর্মক্ষেত্রে সফলতা, কৃতিত্ব ব্যর্থতা অনুধাবন, বিভিন্ন কর্মে রত ব্যক্তির কর্মদক্ষতা, কর্ম-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের মনোভাব ইত্যাদি জানা। এইসব পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ, সমীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে স্বতঃই শিক্ষাবিভাগ এবং শিক্ষা পরিষদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনানুগ কঠোর বা শিথিল নীতি গ্রহণ করতে পারে ; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষাপদ্ধতি ও রীতির পরিবর্তন হতে পারে। মধ্যশিক্ষা পরিষদ, বৃত্তিশিক্ষা পরিষদ (অস্তিত্ব আছে কিনা জানা নেই) বিশ্ববিদ্যালয় ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে পাঠক্রমের পরিবর্তন সংযোজন বিয়োগে এই ধরনের সমীক্ষা বিশেষ সহায়ক। এই গ্রহণ বর্জন পরিবর্তন, সংযোগ বিয়োগ, শিথিল ও কঠোর নীতি অবলম্বনের পথেই শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ প্রয়োজনের গতি অনুসারে খাপ খাইয়ে চললে সমাজ উপকৃত হয়। অন্যথায় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হতে থাকলে তার বহতা ও বৃদ্ধি সম্ভব হলেও ক্ষেত্র-বিশেষে অপ্রয়োজনীয় স্ফীতি নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনার ভার যাদের উপর তারা সক্রিয় ও তৎপর না হলে তাদের গয়ংগচ্ছ ভাব দেশের সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকেই প্রভাবিত করতে পারে, অবনতির পথে এগিয়ে দিতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের যথোপযুক্ত সংবাদ পরিবেশন-সরবরাহ, শিক্ষা গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ট্রেনিং কেন্দ্রে, বৃত্তিশিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী অনুপ্রবেশের সংখ্যা প্রতি বছর নির্দেশ করতে পারে। এইভাবে এক-দিকে যেমন শিক্ষাব্যবস্থায় উন্নতিসাধন সম্ভব, অপরদিকে কোন বিশেষ বৃত্তিতে, বিষয়ে অনাবশ্যক ভিড় কমিয়ে বৎসরান্তে উত্তরোত্তর বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি আয়ত্তে রাখার একটি বাস্তবানুগ চেষ্টা করা যায়।

সাত

ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা সীমায়িত ক্ষেত্রবিশেষেই সীমাবদ্ধ, তথাপি আশা হয় এই আলোচনায় উত্থাপিত ধারণা— লক্ষণ প্রশ্ন সমাধান, দিকনির্দেশ-

গুলি পাঠকসমাজের চিন্তায় কিছু খোরাক জোগাবে। হয়তো কতিপয় শিক্ষাবিদ উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার ব্যক্তিচিন্তার একদেশদর্শী দোষ পরিহার করে কিছু সমর্থনযোগ্য উপযোগী প্রস্তাব কাজে লাগাবেন— সেখানেই এই-জাতীয় আলোচনার সার্থকতা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাবশ্যক ভীড় অনেকটা হ্রাস পায় যদি একটি বিকল্প ব্যবস্থা সাধারণের জ্ঞাত থাকে, আয়ত্তে থাকে, এবং সম্মুখে ভবিষ্যতের কিছু আশ্বাস থাকে। অযথা সময় অর্থ এবং যুবশক্তির অপচয় নিবারণের একটি উপায় মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা এবং কেবলমাত্র যথার্থ তীক্ষ্ণধী মেধাবী শিক্ষার্থীর পক্ষেই উচ্চশিক্ষা সুগম করা। মনে রাখতে হবে, এই আলোচনায় (এবং পূর্ববর্তী আলোচনায়) প্রস্তাবিত সামগ্রিক শিক্ষা-নীতি পূর্ণভাবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাকে আওতায় আনবে এবং তা সর্বরাজ্যে প্রযুক্ত হবে। অন্যথায় সরকারী প্রকল্পে ব্যর্থতার সাধারণ দৃষ্টান্তের ন্যায় সমাজচেতনার উন্মেষ ঘটানোর উদ্দেশ্যে গৃহীত শিক্ষা-প্রকল্পও একটি ব্যর্থ প্রকল্পে পর্যবসিত হওয়াই স্বাভাবিক।

বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষার বিন্যাসে নিম্নরূপ সংযোগ সম্ভব কিনা চিন্তা করা যেতে পারে :

সর্বভারতীয় শিক্ষানীতির আওতায় পড়বে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সাধারণ শিক্ষা অর্থাৎ দশম শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর মাধ্যমিক (বা এগারো বারো শ্রেণী আজকাল যা হয়েছে) স্তরে সেইসব শিক্ষার্থীদেরই প্রবেশাধিকার দান যুক্তিযুক্ত হবে যারা উচ্চশিক্ষার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর বৃত্তি শিক্ষার্থে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশের যোগ্য, পিতামাতাও সন্তানের ব্যয়ভার বহনে সক্ষম। অবশ্যই এই শিক্ষার্থীগণ প্রথম বা দ্বিতীয় বিভাগের উচ্চস্তরে উত্তীর্ণ হবে। অন্যান্য শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বিকল্প ব্যবহারিক শিক্ষা-দানের জন্য একটি বিকল্প ব্যবহারিক শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা।

এই বিকল্প শিক্ষাস্তরে নানা বিষয়ক বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। সুপরিকল্পিতভাবে কলা, বিজ্ঞান, সূক্ষ্মকলা, কারিগরী-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবহারিক বিদ্যা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বন-সংরক্ষণ, যানবাহন ভ্রমণ, পাবলিক সার্ভিস, শাসন পরিচালনা, আইন, হস্তশিল্প, ছাপা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় অঙ্গাত্মক শিক্ষাক্রমের সংযুক্তি বাঞ্ছনীয়। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাপর্যায়ে এবং এই উচ্চ বিকল্প স্তরে ও উচ্চতর

প্রাথমিক → মাধ্যমিক → ১০ম শ্রেণীর পরবর্তী
বিকল্প স্তর (২।৩ বছরের শিক্ষাক্রম)
উচ্চতর মাধ্যমিক → উচ্চতম শিক্ষা
খাদ্যপ্রস্তুত ও সংরক্ষণ
ভ্রমণ বিষয়ক
কারিগরী
আর্টস
ক্রাফট্স
প্যারামেডিকেল
শিক্ষা
পরিচালনা-শাসন
ট্রেড
অঙ্কন
সঙ্গীত
নৃত্য
বিভিন্ন হাতের কাজ
ফটোগ্রাফী
ফার্মেসী
নার্সিং
সেনিটারী
গ্রন্থাগার
শিক্ষাসহায়ক
টেকনিশিয়ান
গ্রন্থাগারিক সহায়ক
সেক্রেটারী
ক্লার্ক
টাইপিস্ট
টেকনিক্যাল
খনিজ
বৈদ্যুতিক
কৃষি
বনসংরক্ষণ
পূর্ত
যানবাহন
হাঁস-মুরগা পালন
সার
গোপালন
ডেয়ারী
ফিটিং
প্রিন্টিং
টেলারিং
কার্পেন্টারী
ইত্যাদি
বহুবিধ
উচ্চতর মাধ্যমিক
বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিষয়ের সূচনা (বিজ্ঞান বিষয়ক—কলা বিষয়ক)
গ্রন্থাগার
জার্নালিজম
শিক্ষকতা
ইঞ্জিনীয়ারিং
মেডিকেল
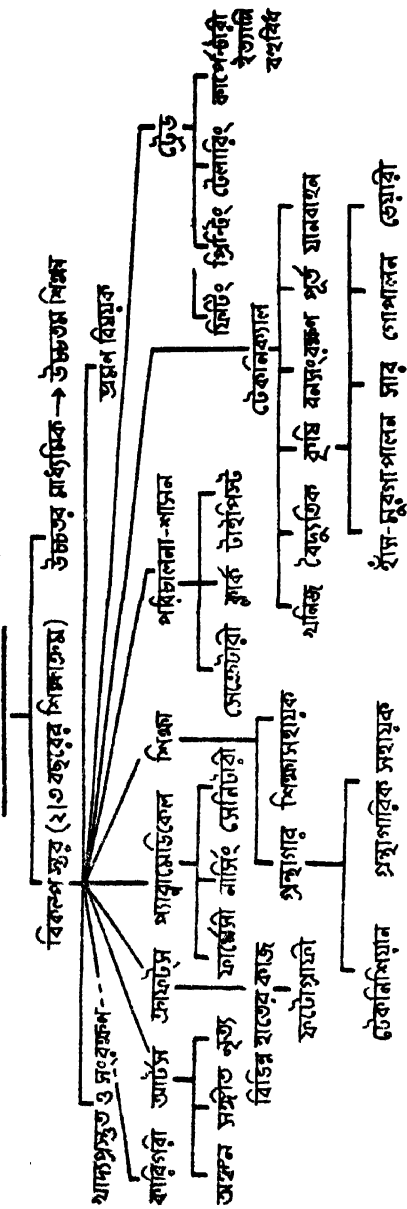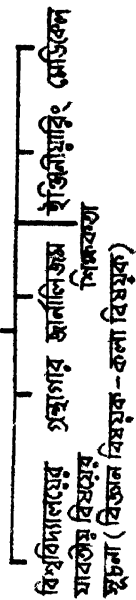
মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার প্রধান পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত বিভাগে বিমূর্ত ধারণার পরিবর্তে বাস্তবমুখী কার্যকারিতা ও প্রযুক্তির দিকেই প্রধান লক্ষ থাকবে, কিন্তু শেষোক্ত বিভাগে বিমূর্ত ধারণার আভাস দেওয়াই সর্বজন-গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে।

বিকল্প ব্যবহারিক শিক্ষার একটি অপটু ছক (ষাট পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) দেওয়া যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ উৎকর্ষের দিকে লক্ষ রেখে একটি সুপরিকল্পিত মডেল প্রস্তুত করবেন। দশম শ্রেণীর পরবর্তী এই বিকল্প শিক্ষাক্রমের কাল দুই-তিন-চার বছরের অধিক না হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর বয়স যদি ষোল-সতের হয় তবে পরবর্তী শিক্ষা সমাপ্ত করতে করতে তার বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। দেশে যত প্রকার সরকারী বেসরকারী ট্রেনিং কলেজ, প্রযুক্তিবিদ্যার কেন্দ্র ইত্যাদি আছে সেগুলি এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত।

এই বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ যদি জেলা-শহরে থাকে অর্থাৎ প্রত্যেক জেলার লোকসংখ্যা চাহিদার অনুপাতে বিভিন্ন কেন্দ্র যদি জেলা-শহরে স্থাপিত হয়, তাহলে স্থানীয় শিক্ষার্থী জেলা-শহরেই শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে।

দ্বিতীয়, প্রাদেশিকতা-বোধের মুক্তি ঘটানো ও সামাজিক সচলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কিছু করার সুযোগ মাধ্যমিক পর্যায়ে যথেষ্ট আছে। রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বদলীর ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের অনুকূল ব্যবস্থা করা, শিক্ষামূলক ছবি প্রদর্শন ও বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তৃতা ইত্যাদির অবকাশ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত সবরাজ্যে প্রত্যেক বড় শহরে শুধু নয়, অত্যাবশ্যকভাবে প্রত্যেক জেলা-শহরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরিজি ভাষার পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা সর্বভারতীয় শিক্ষানীতির অঙ্গীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে সামাজিক সচলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। একটি জেলা-শহরে পনেরটি বিদ্যালয়ে যদি পনেরটি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে তাহলে অন্তত পনের জন ভিন্ন রাজ্যের শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্পর্শে শিক্ষার্থী শুধু নয়, শহরবাসীও আসতে পারবে। এইভাবেই অপর রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি পেতে পারে। একে অপরের পরিচয় লাভে প্রাদেশিক মনোভাবও দূরীভূত হতে সহায়তা হবে।

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা ইত্যাদিতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের উপস্থিতি এবং মতামত বিশেষ মূল্যবান। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে নিরিবিলি ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে। অন্তত NCERT-র উদ্যোগে কোদাইকানাল, উটাকামণ্ড প্রভৃতি মনোরম পার্বত্য নগরীতে অনেকে সে-উদ্দেশ্যে সময়যাপন করার সুযোগ পান এটুকু জানা আছে। এই সুব্যবস্থা আরও বিস্তৃত হলে ভালো হয়। সর্বস্তরের উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট সে-সুযোগ পৌঁছলে শহরকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তির সম্ভাবনা দেখা দেবে। নানাজাতীয় পাঠ্যপুস্তকে কেবলমাত্র শহরকেন্দ্রিক অভিজ্ঞতার ফলে বৃহৎ ভারতসমাজ-সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে রচনা অনুল্লিখিত, উপেক্ষিত থাকে। স্থানগত, বিশেষ রাজ্যগত বিশেষ-বিশেষ সমস্যা ও সেইসব সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত সেই শিক্ষকরাই দিতে পারেন, যাঁরা সেইসব সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানেই সমাধানের ইঙ্গিত নিহিত।

আনুমানিক ৮৫ লক্ষ ভারতীয় গ্রামে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি অনুসরণের প্রাথমিক সোপানরূপে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী। স্মরণ রাখা কর্তব্য, শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের কারণ এই যে, শিক্ষা প্রসারের দ্বারা সমাজমানসের পরিবর্তন সম্ভব হলে তবেই অর্থনৈতিক বিন্যাস অবস্থার সুষ্ঠু পরিবর্তন-প্রচলন, কৃষি-উৎপাদনে অধিক মনোযোগ সংযোগ ও লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি তথা জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করা বা আয়ত্তে আনার চেষ্টা সম্ভবত কার্যকরী হতে পারে। প্রস্তাবিত পরিবর্তনের আদৌ উদ্দেশ্য নয় প্রচলিত কাঠামোটি ভেঙেচুরে বিধ্বস্ত বিশৃঙ্খলায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে উৎকট করে তোলা। বরং প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষাব্যবস্থা ও নীতির খোল-নলচে বদ্‌লানোর উদ্দেশ্যে গোড়া থেকে শুরু করাই এ-প্রস্তাবের লক্ষ্য।

আজকের পাঁচ-সাত বছরের শিশুর মনে যে ধারণার বীজ উপ্ত হবে তারই বিকাশ ঘটবে ধীরে-ধীরে দশ-পনের-কুড়ি বছরে, আর তখনই পূর্ণবিকাশের ফসল সমাজ ভোগ করবে। প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির প্রয়োগ শুরু হবে প্রাথমিক শিক্ষাপর্যায়ে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে আয়ত্তে আসবে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক ও মধ্যবর্তী বিকল্প স্তরটি। এইভাবে ধীরে-ধীরে ওই পাঁচ বা সাত বছর-বয়স্ক শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপ্ত করবে তখন পরিকল্পিত মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক

বা বিকল্প ব্যবস্থাটি গ্রহণে সমর্থ হবে।

প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি সফল হতে পারে দলমত ও গোষ্ঠীমত নিরপেক্ষ মনোভাবে-ভাবিত শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবীর চেষ্টায় শিশুশিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে এই শিক্ষাদানে উদ্দীপিত করে তুলবার সার্থক প্রচেষ্টায়। শিক্ষানীতি, শিক্ষা-প্রণালী তথা পদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সবই শিক্ষাধারায় অঙ্গীভূত, ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। এই সব-কিছুর পারস্পরিক প্রভাবে ও প্রবাহে সমাজ-চরিত্রের রূপ পরিগ্রহ।

বর্তমান আলোচনায় অভিপ্রেত— ন্যূনতম শিক্ষার আলো জনসমাজে বর্ষিত হোক, যে-শিক্ষার গূঢ় অভিপ্রায় সামগ্রিক সমাজবাদের উদ্বোধন। স্বাধীনতা-পরবর্তী তিন-চার দশক-ব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সরকারী বেসরকারী কার্যালয়ে-কর্মস্থলে গোষ্ঠীমত দলমত প্রচারের প্রাধান্যে যে-ক্ষতি সমাজে হয়েছে যতশীঘ্র প্রায়শ্চিত্ত শুরু হয় ততই মঙ্গল। শিক্ষা-ব্রতী, সমাজসেবী, রাজ্য ও জাতীয়-মন্ত্রকের কর্মচারী, এদের পক্ষে দলমত-গোষ্ঠীমতের ভারবাহী হওয়ার অবকাশ নেই, এবং তা সমাজ-হিতকর আদৌ নয়। দেশের শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী শাসন-বিভাগীয় কর্মীদের নিরপেক্ষ শিক্ষাদান কর্মচিন্তা ও কর্মনিষ্ঠাই স্বাধীন সমাজকে ভিন্ন চরিত্র দেয়। অন্যথায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় আত্মহত্যার শামিল। এই উক্তি বা বুদ্ধি সংকটে মাভৈ বাণী মাত্র নয়—সমাজের আত্মজিজ্ঞাসা-জাত উপলব্ধি। নির্ণীত উচ্চকোটির আত্মজিজ্ঞাসা ও নিম্নকোটির আত্ম-জাগরণ শিক্ষানীতির ফলশ্রুতি। পরন্তু, ব্যবহারিক অর্থে অর্থ নৈতিক, সমাজনৈতিক বিভিন্নমুখী প্রকল্প সফলতার ভিত্তিভূমি সেই ফলশ্রুতিতে। জনসাধারণের প্রত্যাশিত মানসিক পরিণতি যুগপৎ উচ্চশিক্ষার্থে উদ্-ভ্রান্তি আবেগাতিশয্যবশত প্রাদেশিক বৈর ও গোষ্ঠীবদ্ধ কূপমণ্ডূকতা দূরীকরণে সহায়ক। পরোক্ষে বেকারসমস্যা আয়ত্তিকরণ, একটি বিবেকী অর্থনীতির সূচনা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক তিরিশ হাজার গ্রামে ষাট থেকে নব্বই হাজার শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান সম্ভব, অনুরূপভাবে সমগ্র ভারতে আনুমানিক আশি-পঁচাশি লক্ষ গ্রামে অন্তত কমপক্ষে একশো সত্তর লক্ষ শিক্ষিত বেকারের সুরাহা হওয়া সম্ভব।

শেষ কথাটি শিক্ষাব্রতীর উদ্দেশে— শিক্ষাব্রতী নিরপেক্ষ সমাজকর্মী

সমাজ হিতৈষণা জ্ঞানদানই শিক্ষক তথা শিক্ষাব্রতীর উদ্দিষ্ট কর্ম। শিক্ষার সংজ্ঞাটি বড় ব্যাপক। একটি বিশেষ বিদ্যা আয়ত্তিকরণ, বিশেষ কারিগরী-দক্ষতালাভ, আত্মবৃদ্ধি, স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ চতুরতা, ধুরন্ধরতা বুদ্ধিতেই শিক্ষার সার্থকতা নয়, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশসাধনই শিক্ষা—একথা শিক্ষাব্রতী মাত্রই জানেন। যে-কালে, যে-দেশে জন্মেছি, বেঁচে আছি— সেই যুগ ও জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা, যে-সমাজে বাস করছি সে-সমাজ সম্বন্ধে সচেতনবোধ, অর্থাৎ এই সব-কিছুর সাধারণ ধারণা ও চেতনা শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। ব্যক্তির সামাজিক নির্ণীত বা চিহ্নিত স্থান, ব্যক্তির স্বযোগ্যতা প্রণিধানযোগ্য, ব্যক্তির দায়িত্বশীল কর্তব্যবুদ্ধির উপর সমাজ আশ্রিত, সমাজে ব্যক্তির কৃত্য ও দেয় কী, প্রাপ্যই বা কী, তা-ও অনুধাবনীয়। সর্বোপরি এই সমস্ত-কিছুর সমবায়ে ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য তথা পরিণত মনস্কতা লাভেই শিক্ষার সার্থকতা। শিক্ষা সমাজ প্রচলিত একটি পদ্ধতি-প্রণালী রীতি ব্যবস্থা যে-পথে বা মাধ্যমে এক যুগের চিন্তা-ভাব-ধারণা-সদ্ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষা, কর্মকুশলতা, নৈপুণ্য-জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। শিক্ষাব্রতী সেই পথের অন্যতম নিয়ামক, পথ-প্রদর্শক, তার গুরু-দায়িত্ব সমাজের অনেক আশা।

ধর্ম বনাম সংহতি

এই নিবন্ধে ধর্ম সমাজ-মানসিকতা গঠনে সহায়ক মনোভাব রূপেই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয়েছে।

বহুধর্ম বহুজাতির সমাজে ধর্মকে কেন্দ্র করে বিবাদ হয়, আবার ধর্ম-নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মবিযুক্ত শিক্ষা যে মানুষের কতগুলি গুণের সহজ বিকাশ ঘটতে দেয় না সে-কথাও অস্বীকার করা যায় না। তুলনায় স্বপক্ষে বিপক্ষে যুক্তি খাড়া করা যায়। কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় জনশিক্ষা-দর্শ এবং দেশের শতকরা ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের কথা ভেবে আলোচনার চেষ্টা, আমার বিবেচনায় ধর্ম সম্বন্ধে অনুল্লেখ এক্ষেত্রে অনুপযোগী, বরং ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপের সম্যক ব্যাখ্যার চেষ্টা নিরপেক্ষ মনোভাব-সৃষ্টির অনুকূল হতে পারে। যুক্তিবাদ বা রাজনৈতিক জঙ্গীবাদ সামাজিক সংহতি কতটা ত্বরান্বিত করবে বা ফল কতটা সুস্থ সুগম হবে তা অনিশ্চিত।

এমত অবস্থায় একটি বিপুল জনসংখ্যার দেশে যে-মনোভাবের দৃঢ়তা যে গুণগুলির প্রভাব সমাজে বিদ্যমান সেগুলি সমূলে উৎপাটন না করে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, বাস্তব নির্দেশের বিভ্রান্তি দূর করা এবং সুষ্ঠু চর্চাই অনেকাংশে সুফলদায়ী।

আপন সমাজকে যখন একটু তফাৎ থেকে দেখি তখন যে-জীবন-যাপনের ছাঁদটা আমার মনে ধরা দেয় তা কল্পিত বা ভিত্তিহীন বলে কেউ নস্যাৎ করবেন না এমন আশাতেই কলম ধরা। পুরাণ ইতিহাস, শাস্ত্র অধ্যয়নে বা ব্যাখ্যা শুনে অনেক সময়েই মন ভরে না। জীবনের বাস্তবতায় সত্যটি আবিষ্কার করতে মন চায়।

ইদানীং কয়েকটি দেশী-বিদেশী ধর্ম-অনুষ্ঠানে উপস্থিত, সভায় অংশ-গ্রহণ ও কয়েকজন ধর্মগুরু সন্ন্যাসীর সাক্ষাতের সৌভাগ্য হ'ল। ধর্ম-দর্শনের আলোচনা-সভায় বড় শুষ্ক কচকচি। বুদ্ধির শানিত বাক্যের বাদ-অনুবাদে নীটফল ইতরজনের ভাগ্যে জোটে না। গোষ্ঠীর মধ্যে সীমা-

বদ্ধ থাকে। বরং অনুষ্ঠানের ব্যাপারগুলি উপভোগ্য। মনের ভাব, বাহ্যিক প্রকাশের ভঙ্গি, ধ্বনি ও সুরের সমন্বয়ে প্রার্থনা, প্রতীকী উপস্থাপনা সজ্জা আভরণ নৈবেদ্য প্রস্তুতিকরণ আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি উপস্থিত সকলকেই আকর্ষণ করে রাখে। সভায় উপস্থিত থাকলে ব্যক্তিকে একমনে বক্তার বক্তব্য শুনতে হয়, অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলে মনোসংযোগ করে অনুষ্ঠানের পরম্পরায় অংশগ্রহণ করতে হয়। তথাপি তুলনামূলক বিচারে শুষ্ক বুদ্ধির চর্চা, বিমূর্ত প্রকল্পিত আলোচনা মুষ্টিমেয় ব্যক্তির মন জয় করে, অল্পসংখ্যকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ; কেননা বিষয়াধিকারের বেড়া ডিঙিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রবেশ ঘটে। এই শ্রেণীভেদটা অনুষ্ঠানে ঘটে না। অল্পকিছুক্ষণের জন্য হলেও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যে যৌথ অনুভূতি জাগে সেটা খুবই স্পষ্ট।

ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ দান এবং নামগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, কেউ বলেন পূর্ণের উপলব্ধি আত্মজ্ঞান ও নৈতিক উৎকর্ষের সাধনাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান গুরুরা মস্তিষ্কের চর্চা নয়, হৃদয়াবেদনের উপর গুরুত্ব দেন। ইসলাম গুরুরা ধর্মের নির্দেশ মেনে চলতে বলেন।

এইসকল প্রবচন থেকে যদি আমি ধরে নিই যে ব্যক্তির পারফেক্‌সন এই সাধনা মূলতই একমুখী, ব্যক্তির সামাজিক সত্তার যে একটা লৌকিক দিক বা কর্মকর্তব্যের দিক রয়েছে সেটা উহ্য— তাহলে হয়তো কিছুটা ভুল বোঝা হবে, কেননা এই সাধনা উদ্দিষ্ট হলেও কর্মযোগী মাত্রেরই মনুষ্যসমাজই সাধনক্ষেত্র। দান ও হৃদয়াবেদনের যে-ইঙ্গিত সেখানে স্পষ্টতই ব্যক্তির সামাজিক সত্তারই প্রাধান্য এখন শাস্ত্র ঘেঁটে এই ইঙ্গিত নির্দেশের প্রাচীনত্ব প্রমাণের চেষ্টা বা তুলনামূলক বিচার এ-নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন, আলোচনাসূত্রে সমাজশিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপনই মুখ্য।

লৌকিক জীবনের দিক থেকে আমরা স্বীকার করি মানুষের ধারণা, আদর্শবাদ দার্শনিকতা মানবিক চিন্তার ফসল এবং সে-চিন্তাশক্তির উন্মেষ বিকাশ সমাজের দান। অর্থাৎ কতগুলি বিশেষ গুণের, শক্তির অধিকার নিয়ে জন্মালেও সমাজের শিক্ষা মানব-শিশুর ধ্যান-ধারণা জাগিয়ে দেয়। পরিবার, সমাজ ধর্মের ধারণার বীজ উপ্ত করে। অর্থাৎ ব্যক্তি তথা সমাজ-মানসের চিন্তা ধ্যান-ধারণার উন্মেষ-বিকাশের একটা

বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত আছে। একথা সর্বজনবিদিত। আমরা ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণার যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করি। সজ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক জীবনের বাস্তবতা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির পরিণতি দেয়। আজ আমরা সব-কিছুতেই ভগবানের হাত বা আল্লার দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট থাকি না। অজানাকে জানবার একমুখী অদম্য সর্বস্ব নিবেদিত ভাব সাধারণ সংসারী গৃহী, অর্থের বিত্তের সাংসারিক সুখের অভিলাষী মানুষের মনে অটুট না হলেও আমরা হয়তো মানুষ হিসাবে বহুসদ্‌গুণের অধিকারী, আচার পালনে নিষ্ঠ, পরোপকারী, অধ্যয়নপ্রিয়, অতিথি-পরায়ণ, স্নেহপরায়ণ, ভক্তিপরায়ণ ইত্যাদি। নগরে বাস করেও আমাদের সমাজ চরম ব্যক্তিবাদী এখনো হয়ে ওঠে নি, নারী-পুরুষের যৌনসম্পর্কের শৈথিল্য ও সমাজের শ্রদ্ধা পায় না। প্রশ্ন এই যে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা ও রাজনৈতিক মতবাদের অভিযান গ্রাম শহর ও সামাজিক স্তর পরম্পরা নির্বিশেষে সমাজ-মানসে বহুযুগজাত সদ্‌গুণগুলি রক্ষার কতটা অনুকূল? আমাদের যে মূল্যবোধ জীবনদৃষ্টি, বন্ধনের নিবিড়তা, মর্যাদাবোধ, দায়দায়িত্ববোধ, সন্তুষ্টির মনোভাব এখনো অবশিষ্ট আছে সেগুলি মূলধন করে এমন কোন নীতি, আদর্শ কি শিক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োগ করা যায় না?

দেশ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা, সংবাদপত্র ও সংবাদবহনকারী অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ-মনে কতগুলি ভাব-ভাবনা উপ্ত করা বাঞ্ছনীয় নয় কি, যা পরবর্তী প্রজন্মের মানসিকতা সৃষ্টিতে গুরুতর ভূমিকা নেবে। আজকের মানুষ দারিদ্র্যমোচন ও আর্থিক অবস্থার সমতাবিধানের যে স্বপ্ন দেখছে তা বাস্তবে ঘটিয়ে তুলতে সমাজ-মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। যুগের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরস্পরের পরিপূরক না হলে সমগ্র সমাজে আর্থিক বণ্টনের ব্যবস্থা মনঃপূত হওয়া সম্ভব নয়। একথাও স্বতঃ-সিদ্ধ যে ভুখামিছিল হিংসাত্মক উত্তেজনা সশস্ত্রবিপ্লবের বিপর্যয় থেকেও দেশপ্রচলিত শিক্ষাসমাজ মানসিকতা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। তদুপরি একথাও সর্বজনবিদিত শক্তি তা সে ভোটের হোক বা অস্ত্রের হোক হয়তো দেশের রাজনৈতিক খোলসটা বদ্‌লে দিতে পারে কিন্তু সমাজের মানসিক প্রস্তুতি সংঘবদ্ধতা ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট না থাকলে স্বার্থ-দ্বন্দ্ববিরোধ, লোভ, পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব, অসৎকর্ম ইত্যাদি নানা জাতীয় অপরাধ চরিত্রহানি ডামাডোল আয়ত্তে রাখা সম্ভব নয়। রূঢ়

শক্তি প্রয়োগ বা শক্ত হাতে শাসন পরিচালনা কোনটাই যথেষ্ট নয়, বলপ্রয়োগ ও দমন শান্তির সমাজে কাম্য নয়। কাম্য নয় ব্যক্তির নির্বাধ স্বাধীনতা যা যথেচ্ছাচারের নামান্তর, নানা দেশের সমাজ পরিস্থিতিই তা প্রমাণ করে।

সময় এবং জীবনগতি প্রবাহের অভিজ্ঞতায় আমাদের এখন আর এমন মনোভাবের কর্ম বিশৃঙ্খলার পরিচয় দেওয়া শোভা পায় না যে সমস্যা সমাধানের জন্য কেবলি বিদেশী অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হতে হবে। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব থাকে নিজের দেশের সমাজের ঐতিহ্যের অনুগামী শিক্ষাসংস্কৃতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করে জাতীয় চরিত্রের তথা জীবনের স্বকীয়তা বজায় রাখা। যদিও একথা সত্য যে আজ গণ্ডিবদ্ধ জাতীয়তাবাদের যুগ অতিবাহিত, তথাপি রাজনৈতিক পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিগুমান, আগামী দিনেও এই বিশেষ অস্মিতাবোধ ও স্বাতন্ত্র্য ঘুচে যাবে এমন মনে করবার কোন কারণ ঘটে নি। ভারতীয়ের অস্তিত্ব রক্ষার্থেই এমন একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে যার ফলে শুধু ব্যক্তি-বিশেষ নয় সমগ্র ভারতীয় সমাজ আগামী বহু শতাব্দী পর্যন্ত প্রবহমান মানব-সংসারে স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

আমাদের ভারতীয় পরিচয়ের স্বরূপটি কেমন, সর্বভারতীয় সমাজ-বোধের অর্থ কি? কেনই-বা ব্যক্তির মনে নানা জাতীয় বিভেদের ধারণা জন্মায়, কেনই-বা ধনসম্পদ আহরণের প্রয়োজন ঘটে, কেন সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি, কেনই-বা ভোগের উন্মাদনা? আমি এই ব্যক্তির স্বরূপ কি, ব্যক্তিত্বের বিকাশের সংজ্ঞা কীভাবে নির্ণীত হবে—ধর্ম, রাজনীতি সমাজ-নীতি, অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ইতিহাস ইত্যাদির আলোকে বিশেষজ্ঞরা নানাদিক থেকে ব্যাখ্যা ও আলোচনা করে আমাদের শিক্ষিত করে তুলবেন। আমাদের ভেদবুদ্ধি, আঞ্চলিকতাবোধে উগ্রতা, ব্যক্তিবাদী-শিক্ষা, তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রাজনৈতিক দলাদলি, জনসাধারণের অজ্ঞতার সুযোগে ক্ষমতার অপপ্রয়োগ স্বার্থসিদ্ধি এবং এইসব দুর্বলতার সুযোগে বিদেশী চরদের গোপন ক্রিয়াকলাপ আমাদের পক্ষে যে কতটা ক্ষতিকর, বিশেষজ্ঞরা আমাদের অবহিত করাবেন। সমাজের আভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব, অবক্ষয় বিচ্ছিন্নতা, উগ্রব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব প্রতিরোধে পূর্বসূরি মনীষীদের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ করাই যদি সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত হয়

আমাদের তাই অনুসরণ করতে হবে। আজ হয়তো আর দীর্ঘসূত্রিতার অবকাশ সামান্যই আছে।

ইতিহাসের গতিতে আজ যে অবস্থায় আমরা উপনীত সেখান থেকে ফেরার পথ নেই। ইতিহাসের শিক্ষা ও জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের যদি দূরদর্শিতা দিয়ে থাকে তাকে আমরা বুঝি যে ভারতীয় শিশু তার জন্ম হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ জৈনধর্মাবলম্বী যে-কোন পিতামাতার কোলেই হোক না কেন তাকে একটি বিশেষ জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তুলবার দায়িত্ব সমাজ প্রচলিত জনশিক্ষা ব্যবস্থার। কাজেই যুগপৎ গবেষণা ও আলোচনার পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একান্ত আবশ্যক। আধুনিক চিন্তার নিদান এই যে, মানুষের আদর্শ ধারণা বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার্য। যথানীতিধর্ম আধ্যাত্মিকতাবোধও কোন দৈবী প্রেরণা প্রসূত নয়। নীতি, ধর্মভাবনা, জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ—এ সবই ঐতিহাসিককালে যুগজীবনের প্রয়োজনে উদ্ভূত। অর্থাৎ মানবের যাবতীয় চিন্তাচেতনার পরিপ্রেক্ষিত বাস্তব-জীবন, কেননা জৈব অস্তিত্বের আধারেই চৈতন্যের উদ্বোধন। এই দিক থেকে বিচার করে দেখলেও অস্বীকার করা যাবে না আমাদের সমাজে এমন মানসিক উপাদানের সংযোগ আছে যা উপযোগী লক্ষ্য নির্দেশের অনুকূল। যেমন, ধর্মভাব। যা সীমাবদ্ধ সমাজ ধারণায় একমাত্র ব্যতিক্রম, যা ব্যক্তিকে বৃহৎ সমাজের সঙ্গে পরিচয় করায়। ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার চেয়েও অধিক প্রয়োজন ধর্মের অন্তর্নিহিত শিক্ষার তাৎপর্য গ্রহণের।

হিন্দু আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে ধর্মজগতে যেমন বহু ভাবের চিন্তার বিশ্বাসের রীতি পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক সমন্বিত আদর্শের প্রতিফলন জনমানসে ও আচার-আচরণে, উৎসবে অনুষ্ঠানে, ক্রিয়াকলাপে, তেমনি রাজনৈতিক চিন্তায় ও বাস্তব জীবনে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যদি একটি সমন্বয়ী স্থায়িত্ব আসে যা বর্তমানের অবর্ণনীয় আর্থিক বিভেদ ঘুচিয়ে নতুন সমাজ কাঠামো দিতে সমর্থ হয় তবেই হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভয়ার্ত মনোভাব সৃষ্টি না করে আমাদের অনমনীয় শক্তির অধিকারী করতে পারে।

ধর্ম কি? সাধারণ মানুষের মনে এ-ধরনের প্রশ্ন জাগে না। আমরা কতগুলি আচরণ করি। শৈশব থেকে যে আচার আচরণ উপদেশ নির্দেশের শিক্ষা পাই অভ্যাস বশে তা মেনে চলি। কিন্তু পরিণত বয়সে

ব্যক্তিজীবনে বা সমাজে দেশে বা বিদেশে যদি বিবাদ বা সংঘাত দেখা দেয় তখনি সেই দ্বন্দ্ব বিরোধ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় কেন এমন হয় ?

আমরা বুঝি ধর্ম সামাজিক ঐক্যের ভিত্তি স্বরূপ। জনমানসের বিকাশের একটি স্তরে এই ঐক্যের বোধ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ-ব্যাখ্যা বাহ্য, কারণ ধর্ম বলতে কি বোঝায় সে-তত্ত্ব স্পষ্ট হ'ল না, বরং ধর্মের প্রভাবের স্বরূপ নির্দেশ করা হ'ল।

কোন দার্শনিক বলেন ধর্ম মূলত একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি, জগৎ ও জীবনকে একটা বিশেষ আঙ্গিকে দেখা। এই ব্যাখ্যা অনেকটাই আমাদের সমর্থন পায়। আমরা অলৌকিক, দৈবিক অপ্রাকৃত একটি শক্তির ক্রিয়া, জগৎ ও জীবনের উৎস বিলয়ের যে চক্রাবর্তনের ধারণা তারই সঙ্গে যেন মিল খুঁজে পাই।

তথাপি সম্যক পরিপূর্ণ অর্থবোধ হয় না। বিশেষ কতকগুলি ভাবের দ্যোতনা বিশেষ-বিশেষ ধর্মাবলম্বীর মনে থাকে, সেই দিকটির উল্লেখ না থাকলে যেন আমাদের অর্থবোধে বাধা ঘটে। এই বিশেষ ভাবগুলির প্রেরণাতেই এক-এক ধর্মাবলম্বীর সমাজে জীবনদৃষ্টির খানিকটা সমতা দেখা যায়। অবশ্য আধুনিক মনের জটিলতা শুধু ধর্মভাব দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। বাহ্যিক দিক থেকে বিমূর্তভাব, ধারণা বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, প্রকাশভঙ্গি, পূজা-উপাসনা, সাধনা মর্ম উপলব্ধি, অনুভব—এইভাবে যতই ব্যাখ্যা হোক যেন অন্তরঙ্গ স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করে না, আমরা তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারিনে। তাই একদল বলে ওটা কিছু না, ভাঁওতা। ধর্মগুরু বলেন, ধর্ম একটি পন্থা অবলম্বন করা, একটি নির্দিষ্ট জীবনচর্চা, হয়ে ওঠাই ধর্ম। মরমী বলেন, সাধনা, মর্ম উপলব্ধিই ধর্ম। ভক্তের কাছে ভক্তির যা আলম্বন তাতে সর্বস্ব নিবেদন আত্মসমর্পণই ধর্ম। জ্ঞানী বলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপলব্ধিই সার কথা। ধর্মগুরু নির্দেশ দেন একটি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে নির্দেশিত আচার পালন করে কায়মনবাক্যে সৎ, সন্তুষ্ট জীবনযাপন করা, সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করা, নিরুদ্বিগ্ন অবিচলিত চিত্তে মহৎভাবের অনুসরণ অপরের প্রতি সমব্যথী হয়ে জীবনযাপনই ধর্ম। এই ধরনের ব্যাখ্যা ক্রমে আমরা ধর্ম-সম্পর্কিত বহু বিষয়ের সম্মুখীন হই। দৃঢ় বিশ্বাস কী বিষয়ে, নির্দিষ্ট পথের নমুনা কী, নির্দেশিত আচার বলতে কী বোঝায়,

ঈশ্বর, দৈব, অলৌকিক শক্তি সাধনমার্গ অন্তিম প্রাপ্তির আদর্শ ধর্ম-ব্যবসায়ী, প্রচারক, গুরু, ব্যাখ্যাতা প্রতিষ্ঠান, মঠ, মন্দির, মসজিদ, শাস্ত্র উপদেশ আনুষঙ্গিক বহুবিধ বিষয় যা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, বরং জটিল হয়ে ওঠে।

সাধারণ গৃহী মানুষের অধিকাংশের কোন বিশেষ সাধনা ও অন্তিম প্রাপ্তির আদর্শ সম্বন্ধে সঠিক চেতনা আছে কিনা বোঝা দুষ্কর। কারণ এই ব্যাপারটা এতই ব্যক্তিগত আত্মগত যে বাহ্যিক অনুশীলন বা ব্যবহারের মাহাত্ম্য ছাড়া বিচার করার কিছু উপায় নেই। বিশেষ-বিশেষ সমাজের যে বাঁধাধরা অনুশীলন পদ্ধতি, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান উৎসব ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাতে এক সমাজের সঙ্গে অপর সমাজের বিরোধের কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না, একের অনুষ্ঠান অপরের পীড়ার কারণ হওয়া উচিত নয় যদি না তা স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায় বা বিশেষ অভিসন্ধি-প্রসূত হয়।

এ-যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শুধু ব্যক্তি বা ধর্মপ্রতিষ্ঠান নয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থারও দায়িত্ব যাতে সর্বস্তরের মানুষের মনে এমন একটা চেতনার উদ্বোধন হয় যে, শুধুমাত্র কতগুলি রীতি আচার পালন অনুষ্ঠান উৎসবে অংশ গ্রহণ বা বিশেষ পদ্ধতিতে ঈশ্বর উপাসনা যথেষ্ট নয়— ধর্ম ব্যক্তির চিত্ত উন্নতি, চরিত্র গঠন আত্ম উপলব্ধির সাধনা, পূর্ণতার ভাব রস উপলব্ধি তো বটেই, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি গড়ে তোলারও সাধনা, ঈশ্বর জগৎ জীবনের প্রেক্ষাপটে ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তি-জীবনের অবস্থিতির স্বরূপ, সব-কিছুর ভিতর দিয়ে অনন্তের অন্বেষণই ধর্ম। ধর্মগ্রন্থগুলি যুগোপযোগী মানবিক ভাষায় যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী মানবের চিরন্তন অন্বেষণের পন্থা লিপিবদ্ধ করে যায়। সমাজের সাধারণের পক্ষে সহজ হয় একটা বাঁধা পথ, আমরা সহজ পথ ধরে চলতে অভ্যস্ত হই, সূক্ষ্ম গূঢ় রহস্যটির মর্ম কোন ব্যক্তি বা একদল অগ্রসর ব্যক্তির মনেই উদ্ঘাটিত হয়। তাঁদের প্রবর্তিত মত পথের ব্যাখ্যায় আমরা একটা সহজ পথ ধরতে পারি যেটা দেশ কাল সমাজের একটা পরিচয়ের সীমায় বিশেষ রূপে প্রতিভাত।

ভারতীয় চিন্তায় স্থায়ীভাব ধর্ম। অর্থ কাম মোক্ষ এক-এক যুগে বা সমাজের এক-এক স্তরে প্রাধান্য লাভ করলেও ধর্ম জীবন-যাপনই ভারতীয় জীবনদৃষ্টির সার কথা। ধর্ম এই শব্দটির ব্যঞ্জনা ভারতীয়

ভাষায় বিশেষ ব্যাপক। পাশ্চাত্ত্য 'রিলিজিয়ন' শব্দের সঙ্গে আপাত-আপেক্ষিক সমার্থকতা থাকলেও যখন আমরা বলি কুলধর্ম, যুগধর্ম, নারী-ধর্ম, স্বভাবধর্ম, জীবনধর্ম, জীবধর্ম ইত্যাদি, তখন ধর্ম শব্দের অর্থ ব্যঞ্জনা ব্যাপক হয়ে পড়ে। অবশ্য রিলিজিয়ন শব্দটিও ওয়ার্ল্ড রিলিজিয়ন, কমিউনিটি রিলিজিয়ন ইত্যাদি যুগ্ম শব্দে ব্যবহার আছে, কিন্তু ধর্ম শব্দটির মতো ব্যাপক ব্যঞ্জনা লক্ষ করা যায় না। মনে রাখতে হবে, এই শব্দার্থ আধুনিক কালেরই সৃষ্টি নয়। ধাতু অর্থ যা ধরে রাখে। অর্থাৎ ধর্মই সমাজকে ধরে রাখে। মহাভারতের যুগের দু'একটি প্রসিদ্ধ বাক্যাংশ উদাহরণ রূপে দেখা যেতে পারে। অর্জুন বলছেন—

উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।

কেন উপনিষদের শান্তিপাঠে ধর্ম শব্দটির উদাহরণ নেওয়া যাক।

মাৎহং ব্রহ্ম নিরাকুর্যাংমামা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ···
তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু॥

এখানে ধর্ম শব্দটি আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, একত্বের জ্ঞান উদ্দেশক অধ্যাত্ম বিদ্যাকে উল্লেখ করছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে স্মরণ করে কীর্তনের প্রারম্ভে গাওয়া হয়—

সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ···বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্মপালৌ বন্দে
জগতপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

এই প্রসঙ্গে ধর্ম শব্দটি বিশেষ অর্থবহ। বাংলাসাহিত্যে এর ভূরি-ভূরি নিদর্শন আছে। মুখের কথায়ও আমরা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করি। শব্দের ব্যঞ্জনাময় ব্যাপক অর্থে বিশেষ ভাষাভাষীর সমাজের দেশের নিজস্ব আন্তরিক সম্পদ, আভিধানিক অর্থের সংকুচিত পরিসরে সংজ্ঞার্থ ধরা কঠিন হয় অপর ভাষীর পক্ষে। ভারতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃতের স্তনরসে পুষ্ট উত্তরাধিকার সূত্রে এই ভাব-সম্পদের অধিকারী। শুধু সংস্কৃতের আত্মজা দুহিতা ভাষাগুলি সম্পর্কে নয়, অপর ভাষাগোষ্ঠীর সম্পর্কেও প্রযোজ্য। আবার ভাষা-ব্যবহারের দিকটা কেবলমাত্র বিশেষ ধর্মাবলম্বীর সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, সকল ধর্মাবলম্বীরই সে-ভাষায় সমান অধিকার। সমাজ-ঐক্যের এই একটা স্থায়ী উপাদান।

অপর দিকে ধর্ম বলতে সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ আচরণের সীমাবদ্ধতা, সংজ্ঞার্থের গণ্ডি, আপেক্ষিকভাবে যা আমাদের চিহ্নিত করে,

জীবনচর্চায় একটা বিশেষত্ব দেয়, বাহ্যিক কতগুলি প্রকাশভঙ্গি আমাদের জীবনে আনুষঙ্গিকভাবে দেখা দেয়। কতকগুলি বিশেষ চিন্তাভাবনা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তির অন্তরে গভীরে গহনে গোপন অনুরণন সৃষ্টি করে যা সুস্থ অন্তর্লীন মানসিক আবেগ, সংবেদনশীল গূঢ় মানসিক ক্রিয়া, যা বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়— এই কারণে অপর গোষ্ঠীর পক্ষে তা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। কিন্তু এই পার্থক্য এমন নয় যে আমরা পরস্পর পাশাপাশি শান্তিতে বাস করতে পারি নে। ধর্মের ভিত্তিতে ভূমি ভাগ-বাঁটোয়ারা হলেই যে জাগতিক জীবনের সকল সমস্যা নিরসন হবে এই চিন্তার বাতুলতা প্রমাণে আমাদের পাশাপাশি তিনটি দেশের বর্তমান অবস্থাই যথেষ্ট। আমাদের আর অজানা নেই যে এই রাজনৈতিক বিচ্ছেদ, অর্থনৈতিক অস্থিরতা সাম্রাজ্যবাদের গূঢ় অভিসন্ধিপ্রসূত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির মতো আমরাও আভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ববিরোধে পরস্পর-বিবদমান হয়ে নিরন্তর ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাই তারই সুগভীর চক্রান্ত ধনতান্ত্রিক-যন্ত্র ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অগ্রগামী পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলির। যেন এই ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ সর্বদা বিবাদে নিরত, সমস্যায় জর্জরিত, দারিদ্র্যে হতশ্রী, বিভেদে প'যুদস্ত বিভ্রান্ত নিয়ত দুর্বল পরমুখাপেক্ষী বিদেশী-সহায়তা-নির্ভর হয়ে থাকি তারই অনুকূল ব্যবস্থা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ, বিভিন্ন ধর্ম ও গোষ্ঠীর মধ্যে নিরন্তর দ্বন্দ্বের ইন্ধন যোগানো, আঞ্চলিক মনোভাবের তীব্রতা সৃষ্টি করা, সর্বোপরি ব্যক্তিবাদী শিক্ষা-দর্শের প্রেরণায় আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় ইন্ধন দেওয়া।

একটা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের বুদ্ধিগোচর হয় কেন আজকের যুবসমাজে একভাগের নঙর্থক প্রবণতা আর-এক ভাগের ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক বহুবিধ কারণের মধ্যে দেশপ্রচলিত শিক্ষাদর্শও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও শিক্ষার আদর্শরীতি আমাদের ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার দিকেই অগ্রসর করে। উন্নত ব্যবস্থাসম্মত, নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রশিল্পে প্রাগ্রসর ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থার জীবনের ছাঁদে আমাদের আদর্শ, অথচ আমাদের সামাজিক বাতাবরণ ভিন্ন আর্থিক অবস্থা অগ্রসর নয়— আমরা অনুকূল অবস্থালাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস, সমাজজীবনের সমস্যা সেই অনুকূল জীবন মানের আদৌ সহায়ক কিনা সমাজতাত্ত্বিকরা আমাদের অবহিত করাবেন।

শিক্ষাবিদ মনস্তাত্ত্বিকেরা আমাদের অবহিত করাবেন কেন আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনমানসে সম্ভাব্য-ভবিষ্যতের লক্ষ্য, আদর্শ, অনুকূল অবস্থার চিত্র দেয় না, আমাদের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করায় না, আমাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্য ধারণা আমাদের মনে স্পষ্ট নয় কেন। শিশুর মনে অপূর্ণতা-দোষতুষ্ট সেকুলার সমাজের অস্পষ্ট ছবি, আর-এক দিকে নগরজীবনের বাতাবরণে আধুনিক পিতামাতার ইংরিজী নবিশ পাশ্চাত্ত্য সমাজমুখী করে তোলার প্রাণান্ত প্রয়াস, কেননা সেই পন্থাই আর্থিক সোপানে আরোহণের প্রকৃষ্ট পন্থা। এই দুয়ের টানা-পোড়েনে পরবর্তী প্রজন্মে জনমানসে ভাবের সমতা-স্থাপন সুদূর পরাহত। নতুন অর্থনৈতিক বিন্যাস ব্যবস্থার সঙ্গে এই ভাবের ঐক্য একান্ত বাঞ্ছনীয়—ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের যৌগিক উপাদানের মিশ্রণে সমাজ সংহতির একটি আদর্শ যদি মনে গেঁথে যায় বুদ্ধির বিকাশ পরিণতি ও পূর্ণব্যক্তিত্ব লাভের দিনে একটি ভাবের ঐক্যও স্থাপিত হতে পারে। যেদিন দেশের মাটি ফল জল—দেশের মানুষের প্রতি মমত্বে সমাজের সেবায় আপন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই, বিদেশে ভিক্ষাবৃত্তির জন্যে লালসা প্রশমিত হবে।

ধর্ম ও ভাষার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। ধর্মের উপদেশ, ধারণা, পদ্ধতি বা প্রকাশভঙ্গি সম্বন্ধে দু-চার কথার অবতারণা করা যাক। বেদান্তসূত্র বলছেন, জন্মান্তর-সঞ্চিত সংস্কার বশে সিদ্ধিলাভ ঘটে। অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রমধর্ম শুধু নয়, স্বভাব নিয়ন্ত্রিত প্রেরণা ব্যক্তির জীবনকে একটা নির্দিষ্ট গতি দেয়। ধর্মশাস্ত্র বলছেন, ১০টি সাধারণ ধর্ম সকলের আচরণীয়। এই সাধারণ শিক্ষা বিশেষ ধর্মের গ্রন্থে আবদ্ধ বলেই অগ্রাহ্য, এমন সংকীর্ণতা সম্ভবত সমাজে এখন ততো তীব্র নয়। এখন বর্ণধর্মের প্রাধান্য হিন্দু সমাজেও শিথিল। আশ্রমধর্মের আদর্শ কতটা দৃঢ়, অপর ধর্মাবলম্বীর মনে এই আদর্শের প্রভাব আছে কিনা অনুসন্ধানযোগ্য। শাস্ত্রে অবশ্য নির্দেশ আছে উপদিষ্ট জ্ঞান কখনো তপস্যাহীন ব্যক্তিকে বলবে না, এমনকি তপস্বী হলেও গুরু ও ঈশ্বরে ভক্তিহীন ব্যক্তিকে বলবার প্রয়োজন নেই। ভক্ত ও তপস্বী হলেও যদি শুনতে না চায় কখনো বলবে না। আমি এমন একজন প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি নই যে শাস্ত্রনির্দেশ অমান্য করতে ইঙ্গিত দেবার অধিকারী। আমি ব্যবহারিক দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের আদর্শের প্রতি

অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ তথা সমর্থনযোগ্য মনোভাব-সৃষ্টির উপায় ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি উপস্থাপন করছি মাত্র। কারণ, যদি সমাজের শিক্ষা, বাতাবরণ পরিবারের শিক্ষা সংস্কৃতি শিশুর জীবনকে প্রস্তুতি না দেয়, বাহ্যিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য পরবর্তী জীবনেও ততোটা উপলব্ধি হতে বাধা পায়, প্রতিবেশী পরস্পরের প্রতি হার্দ্য মনোভাব সৃষ্টিতে বাধা পায়। মানুষের ধর্মের ধারণাটা অগ্রাহ্য করলেই পূর্ণ মানসিক বিকাশ ঘটল, এমন মনে করবার কারণ নেই। আচারের শাসন-মুক্তি আমাদের অনেকটা ঘটেছে কিন্তু নগরকেন্দ্রিক নবজাগরণ তার একমাত্র কারণ নয়। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই সমাজের অভ্যন্তরে ক্রিয়া একটা শুরু হয়েছিলো। আউল বাউল গুরু ফকিরেরা আলোড়নের একটা নিস্তরঙ্গ ধারা বহন করে চলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাবে সমাজ-মন অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। রামমোহন থেকে সুরু করে অন্যান্য মনীষীদের কথা তো সবজনবিদিত।

তবে প্রায়-সময়েই আমাদের একটা ভুল হয়, আমরা শুধু নগরের জীবনটাতেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখি; জনসমাজের ধারণাই তাতে আংশিকভাবে খর্ব হয়, নগরজীবনেও কেবল শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মধ্যবিত্ত বিত্তশালী উচ্চ কোটির সমাজকেই মনে রাখি, অতিসাধারণ কেতাবি-শিক্ষাহীন বা ইস্কুল কলেজের শিক্ষাদীক্ষাহীন মানুষের কথা বিস্মরণ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক, মূর্তিপূজার ব্যাপারটা। অহিন্দুর কাছে শুধু নয়, হিন্দুসমাজেও যাদের জীবনদৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত তাদের কাছে মূর্তি বা প্রতীক উপাসনা আচার-অনুষ্ঠান পূজা-অর্চনা সম্পূর্ণ নিরর্থক—তুচ্ছ পুতুলপূজার নামান্তর। অথচ বিশ্বাসীর কাছে এর মূল্য অপরিসীম; কাজেই পূর্বজন্ম পরজন্মে বিশ্বাস, মূর্তিপূজা, বিশেষ আচার-আচরণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক ব্যাপার হিন্দুসমাজের বিশেষ পরিচয়, আঞ্চলিক রীতিনীতি এগুলি বিশেষ গোষ্ঠীরই একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। হিন্দুসমাজ কদাচ তা অপরের প্রতি আরোপ করে না। এই ধরনের পরিচয়ের সীমাবদ্ধতা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় থাকা বাঞ্ছনীয় আমরা স্বীকার করি। কিন্তু হিন্দুর চিন্তাচেতনায় জীবনদৃষ্টিতে এমন কতগুলি ব্যাপকতা বিশ্বজনীন-ভাব আছে সেই মহৎ ভাবের দ্যোতনা অহিন্দুর পক্ষেও প্রেরণালাভের যোগ্য। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মের উপদেশ মর্মকথা দর্শন ধ্যান-ধারণা জীবনদৃষ্টির আলোকে গোটা সমাজ-মনকে শিক্ষিত করে তোলার

একটা চেষ্টা থাকা সমগ্র সমাজের পক্ষেই কল্যাণকর। যাতে আমরা পরস্পরকে জানি বুঝি ও নৈকট্য অনুভব করি, ফলে ঐক্যসচেতনতা জনমানসে দানা বেঁধে উঠতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ কেবলমাত্র বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে ঐক্যবন্ধনের যে রাজনৈতিক চেষ্টা তা অনেকাংশেই ক্ষণস্থায়ী, ভিত্তিও দৃঢ় নয়। ভাষা-ধর্ম-ঐতিহ্য-ইতিহাসের শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজনের দিক এবং দেশকালগত রাষ্ট্রীয় পরিচয় সব-কিছুর সমন্বয়ে যখন আমরা সাধারণ শিক্ষা পাবো তখনি আমাদের ভারতীয় জনমানসে ঐক্যবন্ধনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হবে।

যদিও আজকের কোন দেশ, সমাজই বাইরের সংস্রব এড়িয়ে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে বাঁচতে পারে না, তথাপি কিছুটা সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন আপন সমাজের স্বার্থেই। তুলনামূলক বিচারে স্পষ্ট হয়, জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয় আত্মসন্তোষ, বহির্গমনের আত্যন্তিক ব্যাকুলতা প্রশমনের শিক্ষা দেশের জনসাধারণের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। পরস্পরকে জানা শুধু নয়, ভালোমন্দের বিচার ও গ্রহণ-বর্জনের শিক্ষাটা অতিশয় প্রয়োজনীয় শিক্ষা। একটি মানসিক সমতা সৃষ্টির জন্যই নিজের পিতামাতা সহোদর পরিবার আত্মীয়মণ্ডলীর বাইরে যে-সমাজের মানুষ তাদের পরিচয় ও সম্পর্কের সূত্রটি শিশুর মনে ধরিয়ে দেবার অনুকূল ব্যবস্থা থাকা দরকার। শুধু কতগুলি নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চললেই যে দেশ ও সমাজের প্রতি আনুগত্য ভালোবাসা জাগে তা বলা যায় না।

অবশ্য একথা সত্য যখন সারা বিশ্বের সংবাদ আমাদের ঘরে এসে পৌঁচচ্ছে, সম্পদশালী দেশের মানুষের জীবনযাত্রা দেখবার সে-সম্বন্ধে জানবার সুযোগ ঘটছে, সেসব দেশের ভ্রমণকারীরা আমাদের দেশে আসছে, তখন তাদের ঐশ্বর্য, জীবনযাত্রা, জৌলুষ, আর্থিক ক্ষমতা আমাদের দিশাহারা করে দেয় ; স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিজীবনে সেই সচ্ছল অবস্থা-লাভের আশায়, ভোগবাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ পাবার জন্য আমরা মরীয়া হয়ে উঠি। কেননা আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনের উদ্দেশ্য সুখের ধারণা সেই-মতো। অল্পসংখ্যকের ভাগ্যে সুযোগ জুটেও যায়।

অথচ শৈশব থেকে আমাদের মন যদি অন্যভাবে প্রস্তুত হয়, যদি আমরা বুঝতে শিখি গোটা দেশের মানুষের সে-সুযোগ কোনদিন আসবে

না, ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল নিজের দেশ নিজের সমাজকেই সর্বতোভাবে বুদ্ধি বিবেচনা কর্মশক্তি সামর্থ্য দিয়ে সেবা করা ; তাহলে হয়তো মানসিক দৈন্য অনেকটা হ্রাস পায়। অবশ্য সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি সেই মানসিক অবস্থা সৃষ্টির অনুকূল থাকা চাই, সেকথা বলাই বাহুল্য। অর্থনীতিবিদরা বলতে পারেন বিশ্বের জনসংখ্যা ও ভূমির অনুপাতে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ও ভূমির যে অনুপাত উৎপাদন ও সম্পদের অনুপাত সেই নজীরে সমগ্র সমাজের জীবনযাত্রার মান কী পর্যায়ে কতটা উন্নত হতে পারে যদি সুদূর ভবিষ্যতে সমবণ্টনের ব্যবস্থায় পৌঁছতে পারি। বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই বলা সম্ভব, কীভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই কর্মবিনিয়োগ সম্ভব। তাঁদের পক্ষেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব বৈদেশিক অর্থবিনিয়োগ, বহির্গমনের ব্যাকুলতা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতির মনোভাব সৃষ্টির প্রতিকূল কিনা ; বহির্গমনের উপযুক্ততা বিবেচনায় ব্যক্তির স্বার্থ ই অগ্রগণ্য হবে না, সমষ্টির স্বার্থ ও বিচারের অপেক্ষা রাখে, যদি আমাদের লক্ষ্য হয় জনজীবনের সমগ্র সমাজের উন্নতি। সমাজ-তত্ত্ববিদ আমাদের অবহিত করতে পারেন নানা সমস্যা সম্বন্ধে। আজ আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য দান দয়া দাক্ষিণ্য নির্ভর সমাজ-মানসিকতা আর সম-আর্থিক বণ্টনের সামঞ্জস্যের মানসিকতায় কিছুটা তফাত আছে। এই মানসিকতা সৃষ্টির জন্যই বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ সেই মনোভাব সৃষ্টির সহায়ক নয়। নিরুপায়ভাবে মানুষ হয়তো কিছুটা মেনে নিতে বাধ্য হয় কিন্তু এই পথে সমাজের মানসিক চেতনার ঊর্ধ্বায়ণ ঘটা আদৌ সম্ভব নয়।

যে বিপুল জনসমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামজীবন আর ফিরে পাবে না, আত্মমগ্ন দিব্য ভাবনায় যারা নিমগ্ন নয়, যাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা সম্ভব নয়, যাদের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষের ধারণা হারিয়েছে, যারা জাগতিক জীবনের নিরন্তর দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ, তাদেরই একটা পথ খুঁজে নিতে হবে একটি বিশেষ মনোভাব সৃষ্টির শিক্ষা। শিক্ষার আদর্শই সে-পথের অনুসন্ধান দিতে পারে। বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের উত্তেজনা অনেকটা ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের মতোই শাঁখের করাত।

বহুজাতি, বহুধর্ম, বহুভাষায় সমৃদ্ধ ব্যষ্টি-জীবনের ব্যবহারিক উন্নতির পথে হয়তো বিশেষ ধর্মের মতো পথের ভূমিকা গৌণ। কিন্তু ব্যক্তি-

জীবনের প্রস্তুতির ক্ষেত্রেই ধর্মের মুখ্য ভূমিকা। তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতে হবে ব্যক্তির মনোবিকাশে গভীর দিকটির নির্দেশ কোন্ ধর্মে সুস্পষ্ট, ক্রমবিকাশের পথটি সুচিহ্নিত, সাধনালব্ধজ্ঞান আত্মিক উন্নতির একান্ত সহায়ক। জনশিক্ষায় সেই মতো পথের পরিচয় ও ব্যাখ্যা থাকা বাঞ্ছনীয়। ধর্ম যে শুধু নিয়ম রক্ষা আচার পালন ও বিশেষ প্রকাশভঙ্গি -সর্বস্ব নয়, ধর্মের অন্তরঙ্গ রূপটির পরিচয় ধরে দিতে হবে। অধিকন্তু আমাদের অবহিত হতে হবে নানা বিষয়ে—

আধুনিকতা, আধুনিক মনোভাবের যাথার্থ্য, ভারতের
সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাস,
সমাজ পরিবার ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের স্বরূপ,
সামাজিকের তথা প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্ক দায়দায়িত্ব,
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পারস্পরিক সম্বন্ধ,
সমাজ-সংহতির প্রকৃত অর্থ,
নীতি, ধর্ম, কর্তব্যবোধের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত,
সামাজিক সমবায় ও সমতার অর্থ,
ভারতীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনদৃষ্টির স্বরূপ,
জীবনের মূল্যবোধে আশা-আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তিসত্তা ও
সমাজ-সত্তার স্বরূপ নির্ণয়,
সামবায়িক জীবনদৃষ্টির উদ্বোধন কী অর্থে,
কী অর্থে উন্নয়ন,
প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা তথা নিষ্ফল

প্রলয়ঙ্করী সংঘর্ষের স্বরূপ— এই ধরনের নানা বিষয়ের ধ্যান-ধারণা চিন্তাভাবনার নিরিখে সমাজ-মানসে একটা চেতনার স্তরে পৌঁছতে পারে। শুধু বিমূর্ত ধারণা নয়, বাস্তব ধারণা সঞ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন। একটা শুভ কল্যাণকর পন্থা, যা বিপুল জনসমাজের দৃঢ় আন্তরিক মনোবল সৃষ্টির সহায়ক, যা যুগপৎ দুষ্ট আঞ্চলিকতা, ক্ষতিকর প্রশাসনিক আমলা-তান্ত্রিক দুর্নীতি দূর করতে পারে, যা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল-শক্তিকে দমিত করে জনসমাজের আত্মপ্রত্যয় দেয়, পরিবর্তিত আর্থিক-ব্যবস্থার সমর্থনে মানসিক প্রস্তুতি দিতে পারে।

শিক্ষাদর্শের প্রবর্তনা বিষয়ে উপরিউক্ত বক্তব্যের সারবত্তা পাঠকরা বিচার করবেন। প্রসঙ্গত কয়েকটি বিষয় জরুরী— বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন

ধর্মাবলম্বীগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক স্তরের মানুষের মনোভাবের হদিশ নেওয়া, তাদের ইচ্ছা আশা-আকাজ্ক্ষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া। এই দুই দিকের বিচারেই সর্বভারতীয় সমাজের পক্ষে উপযোগী একটি জনশিক্ষাদর্শ প্রবর্তনের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল।

জনশিক্ষায় বিষয়-নির্বাচনের গুরুত্ব

সমাজ-মানস পরিবর্তনের অন্যতম সহায়ক শিক্ষা। দরিদ্র জনসাধারণ, কোনোভাবে টিকে থাকার চেষ্টা যাদের, আজকের যুগে তাদেরও পারিপার্শ্বিক জীবন সম্বন্ধে সামান্য-কিছু সংবাদ জানা দরকার। গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশের জাতীয় সরকার যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালাক, পাশাপাশি শিক্ষাবিস্তার যদি না চলে, অর্থাৎ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য-উপকারিতা-প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের যদি ধারণা না জন্মায় তবে বহু সৎ প্রচেষ্টাই বিফল হওয়া স্বাভাবিক। সর্বভারতীয় সামাজিক ঐক্য, জাতীয় জীবনের বনিয়াদ, সেইটি গঠনের উদ্দেশ্যেই একটি জাতীয় শিক্ষানীতি আবশ্যক। বর্তমান নিবন্ধে এই বিষয়েরই অবতারণা। শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান-পদ্ধতি বা রীতি, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ক্রিয়া-কলাপ এই নিবন্ধে অঙ্গীভূত নয়। বিশেষ কতকগুলি বিষয়ের সংযোজনের প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধেই দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা আছে।

প্রথমার্ধে একটি বিষয়ের অবতারণা ও আনুষঙ্গিক সমস্যা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। দ্বিতীয়ার্ধে অপরাপর বিষয় সংযোজনে জনশিক্ষার সামগ্রিকতা সম্বন্ধে আলোকপাতের চেষ্টা। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভালো যে, পূর্বসূরি অনেকেই বহুভাবে নানাপ্রসঙ্গে এ-বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। আমি যা বলতে চেয়েছি হয়তো সকলেরই তা জানা আছে। তথাপি, সম্ভবত নতুনত্বের দাবী এই প্রস্তাবনা। ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ-সম্বন্ধে একটি নিঃসংশয়িতবোধ জাগানোর প্রয়োজন জাতীয়জীবনে অনুভূত হচ্ছে— সে-বোধ আপামর জনসাধারণে জাগরণ প্রয়োজন; সমাজ-মানসিকতা পরিবর্তন, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির উদ্বোধনের জন্য জনশিক্ষা তথা দেশের প্রারম্ভিক শিক্ষাব্যবস্থাকে কিছুটা ঢেলে সাজার দরকার— এই দায়িত্ব জাতীয় সরকার অবিলম্বে গ্রহণ করুক।

যদিও সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেই অর্থাৎ প্রচলিত সাধারণ প্রারম্ভিক শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধেই আলোচনা, তথাপি আমার চিন্তায় যে শ্রেণীর

মানুষেরা ভীড় করে আছে, তাদের জীবনের দু'একটা উদাহরণ মুখবন্ধে রাখি :

(১) অন্ধ্র প্রদেশের একটি গ্রাম। শহর থেকে অনের দূরে—রেলস্টেশন, মোটর বাস বহুদূর। খেত-খামার, মোষ-গরু-ছাগল নিয়ে প্রায় শ' পাঁচেক মানুষের বাস গ্রামে। এখানে কোন বিদ্যালয় নেই, নেই কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা। মহাজনের বাস মহকুমা-শহরে, বৎসরান্তে তার প্রতিনিধি এসে শস্য সংগ্রহ করে শহরে চালান দেয়। অবশ্য এদের আছে মোষের গাড়ি। এমনি বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ, শিক্ষা-চিকিৎসার ব্যবস্থাহীন অগণিত গ্রাম আছে বিভিন্ন অঞ্চলে। এইসব গ্রামবাসীর মানবিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত, তারা কি সভ্য সুস্থজীবনের এক-কণা ভাগ পেতে পারে না ?

(২) সুদূর দক্ষিণে, উত্তরে বা পশ্চিমে যাবার দরকার নেই। মহানগরী কলকাতার ১০০ মাইল দূরে তেহট্ট থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। শ্যামনগর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূমের খরা সর্বজনবিদিত। এ-অঞ্চলেও গ্রীষ্মের দাবদাহ কম নয়। নদীনালা শীর্ণ শুষ্কপ্রায়। নলকূপ ভরসা। বাস-যোগাযোগ আছে। বিদ্যালয় আছে। একদা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিলো। খন্দের আড়ত আছে। পূর্ববঙ্গের সীমান্ত দূরবর্তী নয়, সুতরাং দেশভাগের পরবর্তীকাল থেকেই নানা চোরাকারবারের চলও এসব অঞ্চলে আছে। নেই একটি চিকিৎসালয়। গ্রীষ্মের দাবদাহে জ্বরোত্তপ্ত শরীরের গ্লানি নিয়ে বৃদ্ধ হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকের ডিস্‌পেনশারিতে বহু নরনারী শিশু বৃদ্ধের সঙ্গে অপেক্ষমান ছিলাম। রোগযন্ত্রণার উপশমে দু-চার ফোঁটা ঔষধের দাবীও কি এই হতভাগ্য দরিদ্র গ্রামবাসীদের নেই ? এরা কি চিকিৎসা লাভেরও অযোগ্য ?

স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয় নি, বিদেশী সরকারের দায়দায়িত্বও ছিল না সাধারণ মানুষের সুস্থ জীবনের জন্য। ঐ জেলারই আর-একটি গ্রামে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করি, তাতেই বোঝা যাবে বাহ্যিক সামান্য কিছু পরিবর্তন সূচিত হলেও যথার্থ উন্নয়ন গ্রামাঞ্চলে হয় নি বললেই চলে। এখনও পর্যন্ত।

তখন মোটর, বাস ছিল না, গরু-মোষের গাড়িতে গ্রামবাসীর যাতায়াত। জেলাশহর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া হ'ত। শহর থেকে

গ্রামে এসে একটি তিন বছরের শিশু হঠাৎ আমাশয়ে আক্রান্ত হ'ল, সম্ভবত পানীয়জলের দরুন। সন্ধ্যায় নয় মাইল দূরে আসান্‌নগরে গোমস্তামশাই গেলেন ঔষধ আনতে। বৃষ্টিবাদলার রাত কোনভাবে অতিক্রান্ত হ'ল, পুবের আকাশ ফিকে হবার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত-কাতর পিতামহী উপযুক্ত রক্ষী সহযোগে শিশু-কিশোরী দুটি ভ্রাতাভগ্নীকে শহরে রওনা করে দিলেন।

৩৪/৩৫ বছরের ব্যবধানেও গ্রামগুলির দুরবস্থা বিশেষ দূর হয় নি। তবু ভালো, পশ্চিমবঙ্গে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে বহু অঞ্চলেই সেদিক থেকেও ঘাটতি আছে।

(৩) কিছুদিন আগে সল্টলেক সিটি থেকে বাসে উত্তর কলকাতা অভিমুখে চলার পথে মানিকতলা মেন রোড ছেড়ে আমরা খালের পাশ দিয়ে রাজাবাজারে পড়লাম— এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের দৃশ্য মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলল। শহরের এই দারিদ্র্য ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর জঞ্জালময় পরিবেশ বিভীষিকার মতো। গ্রামের দারিদ্র্যে রিক্ততা আছে, ক্লেদ নেই অতটা : হয়তো প্রতিদিনের যাতায়াতে অনেকের কাছেই এ-দৃশ্য গা-সওয়া। তবু কেউ-কেউ নিশ্চয় চিন্তা করে এইসব চিত্র চরিত্র সকলেরই পরিচিত। জানি আদর্শ-সমাজ, রামরাজ্য কোনদিন স্থাপিত হবে না। তথাপি আশা হয় আগামীদিনে যারা শাসনভার প্রাপ্ত হবে, বা নির্বাচিত হয়ে দখল করবে, যারা আমলাতন্ত্রে থাকবে, অপরাপর কর্মসংস্থানে ভারপ্রাপ্ত থাকবে, কর্মরত থাকবে, বিভিন্ন দক্ষতায় কাজ করবে তাদের শিক্ষাদীক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি মনোভাবে যেন সমতা থাকে, দেশের জন্য দশের জন্য কল্যাণ-ভাবনায় মন প্রসারিত থাকে, যেন ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে ওঠে তারা, সমগ্র সমাজ ও দেশ-হিতৈষণাই যে মানবজীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্য, এই বোধ যেন সম্পূর্ণ লোপ না পায়।

রাজ্য-সরকার ও জাতীয়-সরকার একযোগে এই সহযোগী শিক্ষা-প্রসার ব্যবস্থায় উদ্যোগী হোন, এই আমরা কামনা করি : একজন রাজ-নৈতিক শক্তিহীন, নেতৃত্বদানে অসমর্থ নগণ্য সামাজিক তার মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করে অপরাপর সামাজিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সেই পথে জাতীয়-সরকারের উদ্দেশে আর্জি পেশ করা ছাড়া আর কি করতে পারে? সমাজ এবং জীবনের যুগোপযোগী প্রয়োজনে সমাজের শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যবিষয়ে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সূচিত হয়। যে-সমাজে সেই পরিবর্তনের

গতি অত্যন্ত ধীর, বিশেষ অর্থ নৈতিক-বিন্যাস ও অপরাপর স্তর-বিন্যাসের ফলে সমাজে সর্বস্তরে শিক্ষা পৌঁছায় না, সে-সমাজে সমসাময়িককালে নানা বিশৃঙ্খলা দৃশ্যমান।

বর্তমান যুগে অর্থের মাপকাঠিতেই ব্যক্তির যোগ্যতা বিচার, কারণ অর্থের বিনিময়েই জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কেনা যায় ধনিক অর্থনীতির বিন্যাস ব্যবস্থায়। ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ, বুদ্ধি, চিন্তা, মনীষাও যেন স্তিমিত, যদি না অর্থের মান থাকে। ব্যক্তির স্বেচ্ছাবৃত্তি গ্রহণের দ্বার মুক্ত, ইচ্ছা নির্ভরতা আজ ব্যক্তি-জীবনের বনিয়াদ। ব্যক্তিকে সেজন্য বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন করা অত্যাবশক। শহরজীবনের উপযোগী, বিভিন্ন শিল্প, যন্ত্র, পেশা ইত্যাদির উপযোগী প্রয়োজনানুরূপ শিক্ষা। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সুযোগ থাকলেই সুবিধা থাকে না। দ্বার মুক্ত হলেই গ্রহণ সম্ভব হয় না সকলের পক্ষে। কাজেই যেসব অনুন্নত, দরিদ্র লোকভার পীড়িত দেশগুলি সমগ্র সমাজের প্রাথমিক প্রয়োজনই মেটাতে পারে নি আজ পর্যন্ত, তাদের উন্নতি আদৌ পাশ্চাত্ত্যের পদানুসরণ করে কোনদিন হবে কিনা বলা শক্ত। প্রথমত, যারা প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ধনী নয়, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন যেখানে ব্যাপক ও সমৃদ্ধিসূচক নয়, সমাজের অধিকসংখ্যক ব্যক্তি অজ্ঞ, অনগ্রসর, স্বাস্থ্যহীন, অর্থহীন, স্বাস্থ্য-পরিচ্ছন্নতা-প্রজনন সম্বন্ধে মাথা ঘামায় না, আইনকানুন-অধিকারপ্রাপ্য সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহল নয়, দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামো ব্যবসা-বাণিজ্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সামাজিক অর্থ নৈতিক পরিবেশ ইত্যাদি সম্বন্ধে খবর রাখে না, সে-সমাজের উন্নতি ঠিক পাশ্চাত্ত্য ধাঁচে হওয়া সম্ভব নয় এবং সে-সমাজে স্বতই বিশৃঙ্খলা, পরস্পর রেষারেষি ও শোষণ বিদ্যমান থাকবে, একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষত ঐতিহাসিক কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সত্ত্বেও ভারতবর্ষের সমাজে নানা জাতীয় সমস্যা— অর্থ নৈতিক গুরুতর অসাম্য, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, বেকার সমস্যা, উৎপাদন ঘাটতি, আঞ্চলিক রেষারেষি, খনিজ সম্পদের অকুলান, নিত্যনৈমিত্তিক গোলযোগ ইত্যাদি, কাজেই এ-সমাজের উন্নতি পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে কতটা হবে সেটাও যেমন সংশয়ের বিষয়, তেমনি এ-সমাজের মানসিকতা উত্তরোত্তর পাশ্চাত্ত্যের অনুকূল হলেই বা সমাজ-অগ্রগতি কতটা ত্বরান্বিত হবে সেটাও একটা বিতর্কের বিষয়। আবার উন্নতির ধারণাও সকলের একরকম নয়। ব্যক্তিত্বাভিমানী

উচ্চশিক্ষিতের, ধনীর জীবনযাত্রার মানের ধারণা উন্নতির ধারণা এক-রকম, মধ্যবিত্তের একরকম, বিশেষ-বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিকগোষ্ঠীর এক-একরকম, অর্থনীতিবিদ্ সমাজতাত্ত্বিকের একরকম, আর দরিদ্রের আশা একরকম। সুতরাং কোথাও মিল নেই। সকলের সন্তোষও সম্ভবত কোনো সমাজে নেই।

আজকের যুগে সামাজিক-সংহতি বিশ্লিষ্ট। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইনকানুন ইত্যাদির যে-শাসনে আমাদের গোটা দেশের বন্ধন এবং যে-শিক্ষা আমাদের মানসিকতা গঠন করছে— এসবই একদিকে যেমন আমাদের দৃষ্টিকে করছে বহির্বিস্তারী, অপরদিকে আমাদের মনকে, স্বভাবকে করছে আত্মকেন্দ্রিক। দৃষ্টির বহির্বিস্তার স্বার্থঅনুসন্ধানে। আজকের অবস্থা, আজকের জীবন, পরিবেশ, পরিস্থিতি, যেন আমি আর আমার নিকট-পরিবার, এই পরিসরের বাইরে সমাজ-সংসার যা আছে সেদিকে ব্যক্তির কোনো দায়দায়িত্ববোধ করতে শেখায় না। বিশেষত আমাদের শিক্ষা বড় সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখে, জীবন-নীতি সমাজবোধ ও চরিত্রগঠন আজকের formal schooling-এ নেই। কারণ শিক্ষার অর্থ এতদূর সংকুচিত হয়েছে যে আমরা এখন মুখ্য উদ্দেশ্য বলতে বুঝি একটি কার্যকরী বিদ্যা, পেশাদারী বিদ্যা আয়ত্তী-করণ, এবং সেই বিদ্যার বিনিময়ে অর্থসংগ্রহ ও সচ্ছল জীবনযাত্রা।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে এই ধরনের দক্ষতাঅর্জন এযুগে অবশ্য প্রয়োজন। প্রশ্ন, ব্যক্তির ব্যক্তিবাদও বিশ্লিষ্ট মনোভাব আমাদের মতো সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে কতটা সমর্থনযোগ্য? সমাজ-সংহতির দিকে দৃষ্টি রেখে এই মনোভাব কতটা আদৃত? দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভারতের মতো সমাজে যদি ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সমাজ-মানসিকতা পরিবর্তন একান্ত ও অনিবার্য প্রয়োজন রূপে বিবেচিত হয়, তবে কী উপায়ে তা কার্যকর হবে?

এখন দুটি পথ আমাদের কাছে উন্মুক্ত: বলপ্রয়োগের পথ ও শিক্ষার দ্বারা সমগ্র সমাজের মানসিক প্রস্তুতির পথ। এই দুয়েরই সার্থকতা ব্যর্থতা নির্ভর করে সমাজ-চরিত্রের উপর। বলপ্রয়োগের পথে ভারতবর্ষ কতটা অগ্রসর হবে বা সার্থকতা অর্জন করবে বলা শক্ত। রাজনৈতিক ঘুঁটি চালাচালি ও সন্ত্রাসবাদ খুনজখম দুই-ই ইদানীংকালে ভারতবর্ষে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। বিকল্প থাকে শিক্ষার দ্বারা সমগ্র

সমাজের দৃষ্টি-পরিবর্তন। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধনের সন্তানের জন্য অর্থাৎ আগামী প্রজন্মের উপযোগী একটি জাতীয় শিক্ষানীতি যা সমগ্র সমাজকে সংহতি দিতে পারে, পারস্পরিক সমঝোতা দিতে পারে; দরিদ্রের প্রতি, অসহায়ের প্রতি, অজ্ঞ অপারগের প্রতি সহানুভূতি দিতে পারে এবং সেই দারিদ্র্য-অসহায়তা-অজ্ঞতা-অপারগতা দূরীকরণে সক্রিয় দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করায়।

শিক্ষানীতি পরিবর্তনে, পাঠ্যবিষয়ের কিছু সংযোজন বিয়োজনের দ্বারা ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজ-মানসে পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি জাগতে পারে। এই স্থায়ী সুফলদায়ী ব্যবস্থা বিপ্লবেরই নামান্তর। আধুনিক যুগে যে-দাবীর ধুয়া সর্বত্র প্রবল উন্নত— অনুন্নত দেশ নির্বিশেষে, সেই ধুয়া যথার্থ কার্যকরী নয়। সাময়িক দাবী কিছুটা মিটতে পারে, কিন্তু সমাজে পারস্পরিক সমঝোতা আদৌ জন্মায় না। ব্যক্তির দায়িত্ববোধই চরিত্রের বনিয়াদ— স্বদায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা— পরিবার ও সমাজের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব। পারস্পরিক কর্তব্য দায়িত্ববোধই মানব-সমাজের একটি মূল উপাদান। মানবের ভাষাসমূহে রাজা-প্রজা-কর্মী, গুরু-শিষ্য, সন্তান-পিতা-মাতা, বন্ধু-আত্মীয় দেশবাসী, পতি-পত্নী ইত্যাদি বহুবিধ সম্বন্ধজ্ঞাপক সকল শব্দগুলি স্বতই সংকেত দেয়, ব্যক্তি-গৃহ-পরিবার ও সমাজ-জীবনের বন্ধনের আদানপ্রদানের মূলে কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, দাবী বা জবরদস্তি নয়।

ভারতবর্ষে দরিদ্র কায়িকশ্রমিকের, দরিদ্র চাষীর মজুরের সন্তানের কোনপ্রকার শিক্ষাই বাধ্যতামূলক নয়। সব রাজ্যেই মোটামুটি অবস্থাটা একরকম। যে-শ্রেণীর লোকেরা শিক্ষার মর্ম বোঝে না বা যাদের পক্ষে শিক্ষা ব্যয়সাধ্য, সময়সাপেক্ষ, তারা তাদের সন্তানদের সে-শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠায় না। সরকারিভাবে শিক্ষা কোন বয়স পর্যন্ত সমাজের সকল শিশু অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য আবশ্যিক নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি বহু অঞ্চলের, বহু গ্রামে বিদ্যালয়ের বালাই নেই। শহরেও, অনুমান করা যাক, মেথর-ধাঙড়-ঝাড়ুদার, ফুটপাতে বসবাসকারী, কুলি-মজুর, মাটিকাটা বা কনস্ট্রাকসনে কাজ করা মজুর, ভিক্ষুক এদের সংখ্যা কম নয়, নারীপুরুষ একত্রে বাস করে, সন্তান হয়— এদের জীবন-যাত্রা কী রকম, বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, প্রাকৃতিক কর্মের জন্য ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রয়োজন। কে এই হতভাগ্যদের জন্য ব্যবস্থা করবে—অবশ্যই

জনস্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে সরকারই অগ্রণী হবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শিক্ষার ভারও সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় constitution-এ স্বীকৃত অধিকারগুলি প্রহসনের নামান্তর।

আমার প্রাথমিক বক্তব্য ভারতীয় সমাজের উপযোগী একটি জাতীয় শিক্ষানীতি। উচ্চ-নীচ সম্প্রদায় ভেদে formal-informal schooling নির্বিশেষে পেশাদারী, কারিগরি skill training যে-ধরনের পরিকল্পনাই হোক না কেন, এবং গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রে যত কট্টর secular ideology থাকুক না কেন, সর্বভারতীয় শিক্ষায় প্রারম্ভিক পর্যায়ে অর্থাৎ প্রাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত আপামর জন-সাধারণের শিশু-কিশোর-যুবশিক্ষার ক্ষেত্রে অপরাপর পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে দেশের ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয় পাঠ দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তদুপরি স্বাস্থ্য-বিধিশিক্ষা, আভ্যন্তরিণ পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিবেশ-পরিস্থিতি, জীবন ও প্রকৃতি পরিচয় সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান আবশ্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধর্ম ও সংস্কৃতি শিক্ষার বাঞ্ছনীয়তা এই কারণে যে, সমাজ-সংহতি রক্ষায় এই শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, যারা দেশের উপরিতলের অল্পসংখ্যকের মধ্যে পড়ে না, পাদদেশের বৃহৎ জনতার অন্তর্ভুক্ত নয়, মধ্যভাগের শিক্ষিত নির্বিবাদী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের যে অংশ আঘাত দমন-প্রতিদমনে আস্থা রাখে না, যারা আজও লুব্ধ স্বার্থপরতায় বিবেক জলাঞ্জলি দেয় নি, সমাজে একটি সাম্য-শৃঙ্খলা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, কর্তব্য, দায়িত্ববোধের স্থিতাবস্থা যাদের কাম্য, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ের উন্মাদনা যাদের মধ্যে তীব্র নয়, সেই জনগণই আশা করে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সমাজ পরিবর্তনের একটি অন্যতম উপায়। সে-ব্যবস্থা কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের আয়ত্তাধীন হওয়া ভবিষ্যৎ সামাজিকের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ নয়; তথাকথিত পাশ্চাত্ত্য অনুসৃত নীতিও সর্বদা সুফলপ্রদ নয়। শিক্ষিত অশিক্ষিতের যে দূরত্ব, শিক্ষিতের মনোভাবে যে তীব্রব্যক্তিস্বাদিতা পাশ্চাত্ত্য সমাজ ও জীবনমুখাপেক্ষিতা, ধনপুঞ্জীভূতকরণের যে তীব্র আশ্লেষ, দেশ ও সমাজের প্রতি যে-অবজ্ঞা ঔদাসীন্য, স্বকার্যসিদ্ধির জন্য আজকের দিনে সামাজিকের নীতি-দুর্নীতির ভেদরহিত, যে-বিকৃত মনোভাব— সমাজের এই বহুতর মানসিক জটিলতার অন্যান্য বহু

কারণ থাকলেও ধর্মবিযুক্ত-সংস্কৃতি, পরিচয়হীন সমাজ, পরিচয়হীন শিক্ষানীতির বহুকাল অনুসরণও দায়ী, একথা অস্বীকার করা যায় না।

আধুনিক উগ্র ব্যক্তিবাদী, অপরাপর প্রগতিশীল বা রাজনৈতিক ইনটেলেক্চুয়ালগণ ধর্ম শব্দটি শুনেই আতঙ্কিত হতে পারেন। কিন্তু সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠই হয়তো নিত্য ও আপেক্ষিক সত্য সমন্বিত মানব-জীবনাদর্শে আস্থাবান। কোন তাত্ত্বিক জটিলতায় প্রবেশ না করে খুব সাধারণভাবে মন্তব্য করা যায় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আস্থা ও অনাস্থা-অবিশ্বাস নিয়েই মানবতাবাদী ও ঈশ্বরবিশ্বাসীর স্বাতন্ত্র্য। মানবতাবাদী মানবজীবনের আপেক্ষিক সত্যের ঊর্ধ্বে যাওয়া নিরর্থক মনে করেন। কিন্তু স্বতই মনে হয় দেশ-কাল-সমাজ-নিরপেক্ষ মানবতাবোধের উদ্বোধনের জন্যই দেশ-কাল-সমাজ অতিরিক্ত বিশ্বচরাচর-ব্যাপ্ত একটি অস্তিবাচক ধারণা প্রয়োজন। সর্বমানব কল্যাণের দৃষ্টিও এই পথে সহজে জাগে। কল্যাণ ও মঙ্গলের ধারণা একটা আবেগ বা ভাবালুতায় পর্যবসিত না হয়ে যদি ধীর-স্থির একটি প্রত্যয়ে উপনীত হয় তাহলে ব্যক্তি-গোষ্ঠী-সমাজ-দেশ ও বিশ্বকল্যাণের পথে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া যায়।

একথা স্বীকার্য যে, শিশু-কিশোর-যুবকের মনে সত্য ন্যায়নীতি মূল্যবোধের বীজ উপ্ত না হলে চরিত্র গঠনে বাধা হয়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য— ব্যক্তিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ঠিক কী, কিসের জন্য মানুষের নিরন্তর প্রচেষ্টা, শুধুই কি আত্মস্বার্থ সংসারগতি ? অন্নময় দেহের ক্ষুধা ? বোঝার ভুলে, দিক্‌বিভ্রমে ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনে বহু অযৌক্তিক অসাম্য দ্বন্দ্ববিরোধ জটিলতা, ঈর্ষা, হতাশা সৃষ্টি হয়। পরিণত মানবের আত্মিক মানসিক সমতা বিকাশের উদ্দেশ্যেই শৈশবে-কৈশোরে চিন্তাশক্তি উন্মেষ ও বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে সকল সভ্যসমাজের দায়িত্ব অনুকূল শিক্ষা দ্বারা মানসিক বিকাশ ও পরিণতির পথে চালিত করা।

এখানেই প্রশ্ন জাগে, গণতান্ত্রিক ভারতরাষ্ট্রের জাতীয় উদ্দেশ্য কী এবং কীভাবে তা কার্যকরী করবার জন্য সমাজ বদ্ধপরিকর ? সমাজ-কল্যাণই জাগতিকভাবে যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে শিশুর মনে সেই আদর্শের বীজ বপন করে দিতে হবে না কি ?

সকল ধর্মের মূল প্রশ্ন একই। মানবজীবনের পরিচয় ও উদ্দেশ্য অনুসন্ধান— ব্যক্তি সমাজ ও বিশ্বজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। যদি এই

বিষয়েরই শিক্ষা, সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থায় অনুপস্থিত থাকে তাহলে দরিদ্র অনগ্রসর, অসম অর্থনৈতিক বণ্টনের সমাজে potential humanity অবজ্ঞাত হওয়াই স্বাভাবিক। ধনিকসমাজের বিন্যাসে বুদ্ধিগত, বৃত্তিমূলক পেশাদারী বিদ্যা দক্ষতারই অগ্রাধিকার। কিন্তু শিশুর শারীরিক-শক্তি বুদ্ধি স্ফুরণের সঙ্গে-সঙ্গে অপরাপর পরিপূরক সমন্বয়ী-শিক্ষাদানে অসঙ্গতি থাকলে পরবর্তীকালে চিন্তা, আবেগ, অনুভূতির পরিণত বিকাশে বাধা হবে। আমরা সকলেই বুঝি সমাজে আর সংহতি নেই। চরিত্রগঠনের শিক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরেই ভার বর্তায়। যদিও আজকের যুগে বংশ-পরম্পরা আর গুরুত্ব পায় না—অর্থনৈতিক-সামাজিক-গৃহ-পরিবার পরিবেশ প্রতিবেশের গুরুত্ব সমধিক। এই পরিবেশের অসাম্য দূর হওয়া সম্ভব নয়। ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষার সুযোগের সামর্থ্যের তারতম্য আছে। শিক্ষিত অশিক্ষিত অভিভাবকের আশা-ইচ্ছা-উদ্দেশ্য-মূল্যবোধের সামূহিক চিন্তা-জীবনদৃষ্টির আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। কিছুই রাতারাতি দূর হবার সম্ভাবনা নেই।

একজন অশিক্ষিত চাষী বা শ্রমিকের সন্তান আর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা বিত্তবানের সন্তান যদি একই নীতির আওতায় আসে, তবে গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে সন্দেহ নেই। চাষী বা শ্রমিক-পিতামাতা ভাষাশিক্ষা-ধর্মবোধের শিক্ষা, দেশ ও সমাজের পরিচয়, মহৎ ব্যক্তির চরিত্রপাঠ ইত্যাদি সম্বন্ধে যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলতে পারে। তাদের ইচ্ছা হয়তো চাষের কাজ শিক্ষা, মোটর গাড়ির চালক হওয়া, কী কারখানায় হাতুড়ি পিটে টাকা রোজগার। আবার ধনী বা মধ্যবিত্তের প্রশ্ন হতে পারে, এসব অযথা সময়ের অপচয়, কার্যকরী বৃত্তি শিক্ষা কী পেশাদারী বিদ্যাদক্ষতা অর্জনই জীবনের লক্ষ্য।

আমাদের বিবেচনায় এই যৌক্তিকতার প্রশ্ন উত্থাপন ও তৎসক্রান্ত সদুত্তর না মেলায় অসন্তোষের সম্ভাবনা থাকলেও সমগ্র সমাজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণের প্রয়োজন জরুরী। সারা দেশে, শহরে, গ্রামে লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় স্থাপনের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি স্থানীয় প্রয়োজনও সমাজজীবনের পরিবেশের অনুকূল শিক্ষাক্রম ও সময়ের ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। শহরের যে-দরিদ্র শিশু সকালে চায়ের দোকানে কাজ করে, কি গ্রামে যে-শিশু

সকালে দুপুরে খেতে-খামারে যায় গরু চরায় সে যেন অপরাহ্ণে কি সন্ধ্যায় আবশ্যিক পাঠ নিতে পারে। কিছু বয়স পর্যন্ত পাঠ আবশ্যিক হওয়া উচিত। পাঠ্যবিষয়ের তারতম্য, স্থান ও প্রয়োজন বিশেষে বিশেষ বিষয়ের দক্ষতাঅর্জনে গুরুত্বদান ইত্যাদির পার্থক্য থাকলেও, ভালো-মন্দ, উচ্চ-নীচ, শহর-গ্রাম, ব্যয়বহুল-ব্যয়ভারমুক্ত, ধর্মীয় সেকুলার, ইংরেজী মাধ্যম, দেশীয়-ভাষা মাধ্যম, অপ্রাতিষ্ঠানিক-অবৈতনিক যে-ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হোক এবং ভারতবর্ষে যে-রাজ্যেই হোক, সর্বত্র জাতীয় শিক্ষানীতি প্রারম্ভিক পর্যায়ে অবশ্য গুরুত্ব দিতে বাধ্য থাকবে— স্বাস্থ্যবিধি, সমাজবিধি, ইতিহাস পরিচয়, সংস্কৃতি পরিচয়, নীতি ও ধর্ম-বোধের পরিচয়, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিস্থিতির পরিচয়।

যদিচ রাজনৈতিক পরিবর্তন, বর্তমান সহজ গতানুগতির ফলে বর্হিজীবনপ্রভাব, বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাচীন মূল্যবোধ ধ্যান-ধারণা বিন্যাস ব্যবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে— সমাজে গোষ্ঠীশ্রেণী শাসক-পরিচালক সম্পর্ক, সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তির গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান ব্যাহত, নতুন বিন্যাস, নতুন ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৃহত্তর সমাজে বিশেষ জীবন-দৃষ্টির আনুগত্য আজও লক্ষণীয়। শাসক বা শাসকগোষ্ঠী, পরিচালক-গোষ্ঠী, শিক্ষক, বিভিন্ন কর্মে দক্ষ, পেশায় দক্ষ বুদ্ধিজীবী কর্মী তাদের সমবেত শুভবুদ্ধি ন্যায় ও নীতিমূল্যের উপর আস্থাস্থাপনই আমাদের স্বভাবজাত। এই চারিত্রিক নির্ভরতা ও বিশ্বাসের উপাদান শোষণের অন্যতম হাতিয়ার বা রাজনীতির হাতিয়ার না করে— হিতৈষণার কাজে তখনি প্রেরিত হতে পারে যখন সমাজ সংহতি-মূলক একই প্রকার ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের বীজ রোপিত হয়। কেননা আমরা ছোট বয়সের শিক্ষা দ্বারাই conditioned হই। শিক্ষার প্রসার, বয়োবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতাবৃদ্ধি, জীবনের পরিধিবিস্তারের সঙ্গে সংস্কারমুক্তি, অন্ধবিশ্বাসমুক্তি যুক্তিবুদ্ধি বিচার শক্তির প্রয়োগ ক্ষমতা আসে বটে, কিন্তু অনেকের জীবনে হয়তো শিক্ষার সুযোগ আসে না, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ভারসাম্য বিচ্যুতির কারণ প্রস্তুতির সময়ের শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। প্রস্তুতিপর্বের শিক্ষার মূল্য পরবর্তী জীবনে অপরিসীম।

একথা সর্বজনবিদিত যে পরিবার, সামাজিক পরিবেশ দেশ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই জাতির ঐতিহ্য সংস্কৃতি পরবর্তী প্রজন্মে বহমান করে। দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে আপামর জনসাধারণে দরিদ্র অজ্ঞ পরিবার ও

গোষ্ঠীতে দেশের উন্নত সমাজের মূল্যবোধ ধ্যান-ধারণা পৌঁছায় না, তারা অপাঙক্তেয়, তারা দূরে থাকে। কিন্তু আজ তো বোঝার সময় এসেছে যে, এর ফল কতদূর বিভীষিকাময়। এই অবজ্ঞেয় জনতার অপাঙক্তেয় অবস্থা দূরীকরণের দায়িত্ব আলোকপ্রাপ্ত উপরিতলের সমাজেরই।

মানুষের জীবনযাত্রায় কতগুলি জাগতিক প্রয়োজন মেটানোর জন্যই সভ্যসমাজে সকল বিধিব্যবস্থা। পরিমিত খাদ্য, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিধেয়, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ আরামপ্রদ সকল ব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থা জীবনের নিরাপত্তা এসবও যদি আমরা আজ পাই, কেবলমাত্র সেই প্রাপ্তি আমাদের সন্তোষ দেবে না, ব্যক্তি-ইচ্ছা অনিচ্ছা, ধনপুঞ্জীভূত-করণ যথেচ্ছ ব্যয়ের ইচ্ছা, বস্তুতর তৈজসপত্র বৃদ্ধি, সংগ্রহের ইচ্ছা সেই সকল উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদির চেষ্টা আমাদের নিরন্তর ভোগাবে। এইভাবেই আমরা অভ্যস্ত— আমাদের মতো অনিয়ন্ত্রিত সমাজে যেখানে সবদেশের মানুষের নির্বাধ গতাগতি বহুমতের জীবনাদর্শের ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি সেখানে এইরকমই স্বাভাবিক। সুতরাং আর্থিকভাবে সচ্ছল গোষ্ঠীই এই সকল ইচ্ছা পূরণ করবে, সমাজে প্রতিযোগিতা ক্রমবর্ধমান, অসচ্ছলের হতাশা বৃদ্ধি কেবলমাত্র বিশেষ-বিশেষ পেশা, বৃত্তি ইত্যাদির শিক্ষার জন্য কর্মসংস্থানের অকুলান হবে— এই গুরুতর বিশৃঙ্খল অবস্থাও স্বাভাবিক। যেহেতু আমাদের রাজ-নৈতিক নেতা, নির্বাচিত প্রতিনিধি, আমলাতন্ত্র শাসক-পরিচালক ইত্যাদি সকলেই যে-শিক্ষায় শিক্ষিত এবং অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি বৃহত্তর সমাজ সংহতির প্রতিকূল অর্থাৎ যে-কৌশলীপটুতার ও স্বাদেশিক মনো-ভাবের অভাব অধিক হলে, সমগ্র দেশে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি স্বাভাবিক, আমাদের সেই অবস্থা।

এমত অবস্থায় জাতীয় মানসিকতা গঠনের উদ্দেশ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় আশু পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। স্মরণ রাখা ভালো যে গণতন্ত্রের সাফল্য সমাজের সমবেত শক্তি-সচেতনতা-সচ্ছলতা নির্ভর। একথা সর্বজনবিদিত যে, মানুষের প্রাথমিক চাহিদা— সামান্যধর্ম বা চাহিদার স্বীকৃতি ও সুষ্ঠু নিবৃত্তির ব্যবস্থার উপরেই ব্যক্তি মানুষের সম্পর্ক ও সমাজজীবনের নির্ভরতার সকল নীতি, নিয়ম, গড়ে উঠেছে। ধর্মনীতিও একটি নীতি যা ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও অবস্থিতির

পরিচয় দানে সহায়ক। ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণে এই বিশেষ দিকটির ব্যাখ্যা মুখ্য হওয়া যুক্তিযুক্ত। দ্বিতীয়ত, আত্মসংযম ও পরিমিতি-বোধের শিক্ষা এবং ব্যবহারিক জীবনে নিয়ত আচরণীয় কতগুলি নীতি নিয়ম ধর্ম শিক্ষা দ্বারা সহজে আয়ত্ত হয়।

ধর্ম একটি শিক্ষণীয় বিষয়রূপে সংযুক্তিকরণে নানা দিকে অবশ্যই ভাববার আছে। মূলত দুটি দিক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ :

(১) বহুধর্ম-জাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত সমাজ,

(২) এই পরিস্থিতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আনয়নের জন্য কীভাবে ধর্ম-শিক্ষাদান যুক্তিযুক্ত।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে সূত্রাকারে বলার চেষ্টা হয়েছে। সমস্যা, সামাজিকের বিশ্বাস অবিশ্বাসের ধারণা বদ্ধমূল, সংস্কার আবেগদ্বারা প্রত্যয়িত। দ্বিতীয় সমস্যা, সোচ্চার সেকুলরিজম। এই দুটিই ধর্মকে স্বচ্ছদৃষ্টি দিয়ে দেখবার হৃদয়ঙ্গম করবার পক্ষে অন্যতম বাধাস্বরূপ। তৃতীয় বাধাটি ব্যাপক না হলেও ব্যক্তি বিশেষে গোষ্ঠী বিশেষে দৃঢ়মূল। ধর্ম ব্যাপারটি আজকের জীবনে অপ্রয়োজনীয়। শিক্ষিতগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ আত্মাভিমানী ব্যক্তিত্ববাদের সংস্কারে অত্যন্ত আচ্ছন্ন, ফলে ধর্মশিক্ষার প্রতি একটি স্বাভাবিক বিরাগ থাকা সম্ভব। আর জন-সাধারণ্যে হয় বিশেষ ধর্মের প্রতি আত্যন্তিক আনুগত্যে সংস্কারাচ্ছন্ন ভাবালুতা, না হয় ঔদাসীন্য।

বহুধা-বিভক্ত সমাজে আপোষ মীমাংসাই রীতি। কিন্তু আপোষ মীমাংসার রীতি শিক্ষানীতি হিসাবে ভারতবর্ষের মতো সমাজে বিশেষ কার্যকরী নীতি নয় একথা বলাই বাহুল্য। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যবে থেকে মানব চিন্তা নথিভুক্ত হয়ে আছে, দেখা যাবে ধর্ম-চিন্তায় মানব-মনীষায় জ্ঞানের চিত্তবিকাশের অপূর্ব সাক্ষ্য। সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা— মানবজীবনের উদ্দেশ্য, ব্যক্তির পরিচয়, সমাজে তার কর্তব্য, জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত এই কালপরিধিতে ব্যক্তির কৃত্য, ঈশ্বর ও মানবের সম্পর্ক, আপেক্ষিক ও নিত্য সত্যের স্বরূপ। সর্বযুগে, সর্বদেশে এই জিজ্ঞাসা ধর্মশিক্ষায়। এই জিজ্ঞাসাই ব্যক্তি ও সমাজের নিরন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাতের মূলে আবার দ্বন্দ্বের নিরসনেরও মূলে। সুতরাং আপন স্বরূপকে জানবার এই একটি অন্যতম উপায়।

শ্রুতি স্মৃতি, লিখিত শাস্ত্র, কথিত-সমাচার ছাড়াও সংগীতে শিল্পে

কত যে উৎসার মানবমনের এই ধর্মভাবনাকে কেন্দ্র করে। ধর্মনিরপেক্ষ-ভাবে সংগীতকলা শিল্প-সাহিত্যের যেমন বিচার রসগ্রহণ সম্ভব, তেমনি আবার ধর্ম সাপেক্ষেও সে-বিচার যথাযথ। দেশের জনশিক্ষায় এ-বিষয়ে কোন সুষ্ঠু সংযোজন না থাকা জনসমাজকে বঞ্চনা করারই শামিল। আমাদের বাক্‌স্বাধীনতা ও ব্যক্তিইচ্ছার স্বাধীনতা ব্যতীত যেন কোন অধিকারই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। বিযুক্তির ঐতিহাসিক বা রাজনৈতিক কারণ পরম্পরায় জনসাধারণ ঔৎসুক্যবোধ করে না। আমাদের সমাজে মার্কসিজম্‌, হিউম্যানিজম্‌, মাওইজম্‌, সেকুলরিজম্‌ কোন ইজম্‌ই আশানুরূপ সমতা, সুশৃঙ্খলা, শান্তি ও নিবৃত্তির আদর্শ আজও সুপ্রতিষ্ঠিত করে নি, কোন সংহত সর্বভারতীয় সমুন্নতির পরিবর্তে বিশৃঙ্খল পরস্পর-বিবদমান প্রতিযোগী খণ্ডতায় আমাদের অনিবার্য বিফলতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। হয়তো এই বিপর্যস্ত সন্ধিক্ষণে ভবিষ্যৎ সামাজিক ক্ষতি পূরণের উদ্দেশ্যেই আমরা ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। একটি অনিয়ন্ত্রিত মুক্ত, বহুধাবিভক্ত সুবৃহৎ সমাজে পরি-বার-গোষ্ঠী-অপরাপর সীমাবদ্ধতা অতিরিক্ত সর্বত্র সমাজবোধের জাগরণই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। পদে-পদেই এর অভাব আমরা উপলব্ধি করি। পুলিশের গ্রামবাসী-হত্যা, ব্যবসায়ীর আর্থিকলুব্ধতায় রাজ্যবিশেষকে শিল্প উৎপাদনে বঞ্চিত করা, অবিমৃশ্যকারী রাজনৈতিক নেতার সীমাবদ্ধ স্বার্থবোধে সমাজে বিস্ফোরণ ঘটানো— এসবের মূলেও স্বচ্ছ সংহত প্রকৃত উন্নতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, ego-র প্রাধান্য, কোন বিষয়েরই অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাবোধের অভাব, স্বার্থ প্রাধান্য ইত্যাদি ক্রিয়াশীল একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না।

মানব-প্রকৃতি, মানবের অস্তিত্ব, মানবের সীমাবদ্ধ শক্তি, সমাজবোধ ও বন্ধন, জীবনের নীতি মানবজীবনের উদ্দেশ্য-সফলতা, মানবজীবনে ধর্মের প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা, ধর্মের মূলমন্ত্র, ন্যায়নীতির ধারণা, বিভিন্ন মানবসমাজে ধর্মের ধারণা, ধর্ম বলতে কি বোঝায়, ধর্মবোধ ও ভাবের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন সমাজে, বিশেষ বিশেষ ধর্মে ন্যায়-নীতির ধারণা— ইত্যাদি নানা দিক থেকে পঠন-পাঠন সম্ভব। উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় আলোচনা সীমাবদ্ধ। উক্ত সীমাবদ্ধতা থেকে জনশিক্ষার ক্ষেত্রে তা প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, এক্ষেত্রে বিমূর্ত আলোচনা নয়, সহজবোধ্যভাবে বিধিনিয়ম নীতি, আচরণীয় কৃত্যরূপে শিশু-

কিশোরের মনে দৃঢ়মূল করাই হবে কল্যাণপ্রদ। বিজ্ঞান কলা বাণিজ্য কারিগরী বিদ্যা বৃত্তিমূলকশিক্ষা ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ের পাশাপাশি যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে আবশ্যিকভাবে ধর্মবিষয়টিও সংযুক্ত হোক। এই পঠন-পাঠনের স্থায়ী প্রভাব মনে থাকা স্বাভাবিক, ফলে ব্যক্তিমনের প্রসার ঘটা, ব্যক্তি-মনে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হওয়া সম্ভব বলে আশা হয়। ক্রমশ বয়োবৃদ্ধি, সংসার অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটি সর্বাত্মক মানবত্ববোধ জাগরণের অনুকূলতাও আশা করা যায়। আমি এবং আমার স্বার্থের অতিরিক্ত অপরের, প্রতিবেশীর, সমাজের স্বার্থ শুভ মঙ্গল-চিন্তা ধর্মভাবের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে যেমন নির্বিরোধ ভাবে জন্মায়— আর কোন রাজনৈতিক বস্তুতান্ত্রিক ইজম্-এর দ্বারা তেমন হতে পারে না। Humanism, Marxism বা অপর কোন ইজম্ই মানুষের অহংকার ও ব্যক্তি প্রাধান্য তেমনভাবে দূর করে না। যে-মানবত্ববোধ, স্বল্পে সন্তোষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের সংকোচের ধারণা সমাজতন্ত্রের মূল কথা—ধর্মবোধের প্রভাবে এই ধারণা সমাজে ব্যাপক ও স্থায়ী হতে সহায়তা করবে। রাষ্ট্রে পরিকল্পিতভাবে আর্থিক ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যদি সম্ভবও হয়, মানসিক নিয়ন্ত্রণ তথা সংযমবুদ্ধির অভাবে স্বতই পাল্টা বিস্ফোরণের আশঙ্কা দেখা দেয়। সেই কারণে আমাদের বিবেচনায় উদার মানসিকতা ব্যতীত মহত্তর কিছু লাভ সম্ভব নয়। সমাজের কল্যাণের জন্যই আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ যা মূলত পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা ও জীবন-নীতি প্রসূত, শতাব্দীর অধিককালের যোগা-যোগসূত্রে আমদানি— সেই উগ্র স্বার্থবাদী মনোভাবের সংযম, ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর।

সব ধর্মেরই একটা প্রকাশের দিক, বহিরঙ্গ বা ব্যবহারিক দিক আছে, যেমন ভজনপূজন আচারনিয়ম পালন, ধ্যান-জপ, পূজা-আরাধনা —উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদি। উৎসব, অনুষ্ঠানের বিশেষ প্রভাব সমাজে। আবার একটা আত্মিক মানসিক বা অন্তরঙ্গের পরিচয় আছে, যেমন বিশ্বাস, ধারণা, অনুভব, অনুভূতির দিক। এই দুই দিক অবলম্বনে গঠন-বিন্যাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য—অভিজ্ঞতার বিষয়, পৌরাণিক কাহিনী সংক্রান্ত বিষয়, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয়, সমাজ প্রভাব, ব্যক্তি প্রভাব, দেব-দেবীর ধারণা, নীতি নিয়ম, উপদেশাবলি, মতবাদ-সংক্রান্ত বিষয়, দার্শনিক বিষয় ইত্যাদি বহুবিধ। এই বিভিন্ন দিকে

আলোচনা পঠন-পাঠনের দ্বারা সহজ হয়ে ওঠে ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাস কী করে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়, মনকে চিন্তাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, পরোক্ষে, প্রত্যক্ষে, সমাজকে প্রভাবান্বিত করে।

শিশু-মনে পিতামাতা পরিবার পরিজন সঙ্গীসাথীর প্রভাবেই ভালোমন্দের ধারণা জন্মায়। কিশোর যুবক বয়সে সমাজ পরিবেশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধীরে ধীরে ছাপ ফেলতে থাকে। তার আবেগ চিন্তা ভাব অন্তর্নিহিত শক্তি যদি ভালোভাবে পরিশীলিত না হয় পরবর্তী জীবনে অসহিষ্ণু ভারসাম্যহীন চঞ্চল মানসিকতা ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ পায়। কতগুলি সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশন যা আজকের যুগের শিক্ষার নীতি তার দ্বারা অস্তিবাচক গঠনমূলক মনোভাব সৃষ্টির সম্ভাবনার চেয়ে অধিকাংশের মনে ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টিরই যেন অধিকতর সম্ভাবনা। সতত দ্বন্দ্ব চঞ্চল মানবপ্রকৃতি অস্তিবাচক গঠন-মূলক স্থির জীবন-দৃষ্টির প্রভাবে যেন সুপরিচালিত হয়, সেই মহৎ উদ্দেশ্যেই ধর্ম ও ঐতিহ্যের শিক্ষা।

আমরা অনুমান করি অভিভাবকের যৌক্তিকতার প্রশ্ন অতিক্রান্ত হবে সরকারের অনুমোদনক্রমে, সমস্যা তবু থাকবে। নীতিধর্ম-ঐতিহ্য-সংস্কৃতি শিক্ষাদানের সাফল্য নির্ভর করে অন্যান্য বিষয়ের মতোই গুরুর স্বয়ং এই বিষয়ে যথার্থ অধিকারের উপর। খুব অল্পসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তিই বোধহয় আজ এই বিষয়ের উপর আস্থাবান। বর্তমানের প্রগতি যন্ত্র, গতি ও উত্তেজনা-নির্ভর, যা মানুষকে নিছক অর্থের বিনিময়ে সময়ের মাপে কাজ বা শ্রমদান, সেই অর্থে সচ্ছল জীবনযাপনই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার ফলশ্রুতি বলে শেখায়। বয়ঃপ্রভাবে জীবনের অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিবিবেচনার পরিণতি আসে বটে, কিন্তু শিক্ষাপ্রভাবে যে পরিশীলিত মনোভাবের বিকাশ ঘটে— এই বিষয়টি আজ আর গুরুত্ব পায় না। সমাজ পরিবেশর, পারিবারিক পরিবেশ, পরিস্থিতি ও শিক্ষা-ব্যবস্থা সবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ব্যক্তির চিন্তাবুদ্ধি চরিত্র ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়, বিশেষ মানসিকতা ও জীবন-দৃষ্টির জন্ম দেয়।

যখন সমাজের শিক্ষায় তা পূরণ হয় না, পরিবেশ অনুকূল বোধ হয় না, গৃহ ও পারিবারিক শিক্ষায় ঘাটতি থাকে, আমরা তখন উপায়ান্তর না দেখে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকেই আঁকড়ে ধরি। কিন্তু একথাও সত্য যে শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা হলেই যে ব্যক্তির দ্বান্দ্বিক জীবনের অবসান

ঘটবে তা নয়, তেমন কোন সমাধানিক নির্দিষ্ট সংকেত মানব-সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। তবে দ্বন্দ্ব বিরোধ জটিলতা থেকে ধীরে উত্তরণের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে এমন স্থির আশ্বাস বিদ্যমান। ব্যক্তিস্বার্থ, অর্থ ও সংসারগতিই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য, আর তার বাইরে উর্ধ্বে যেন ভয়াল জমাট অন্ধকার এমন সংকীর্ণ ভাবনা থেকেও মানসিক মুক্তি অবশ্য ঘটা সম্ভব। এই ভাব-বিস্তারে ধর্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি, সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানগুলি অগ্রণী। নিরলসভাবে সমাজে একাজ চলছে। আমাদের বক্তব্য আজকের যুগে সরকারি প্রচেষ্টায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জনজীবনে তা সুগম হোক, আপামর জনসাধারণে উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সামাজিক সচেতনতা রূপে সমাজ-মনে গ্রথিত করে দেবার চেষ্টা হোক। আমাদের স্থির বিশ্বাস শুধুমাত্র সারশূন্য যুক্তিতর্ক বিচারে, এই সচেতনতা সমগ্র সমাজে স্থায়ীভাবে আসে না। যুক্তিতর্ক বিচার একটি প্রাণীমাত্র নির্বাচিত বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভের উপায়।

অভিভাবকের যৌক্তিকতার প্রশ্ন, শিক্ষার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে ধারণা, শিক্ষকের বিষয়ে অধিকার ও আস্থা-অনাস্থা ইত্যাদি সমস্যার উল্লেখ করেছি। শিক্ষিত শ্রেণীর কোন কোন গোষ্ঠীর মনোভাব ও গুরুত্বপূর্ণ—অত্যাধুনিকের মনে ধার্মিকের প্রতি এক ধরনের অনুকম্পার ভাব লক্ষ করা যায়, যে ধর্ম বিশ্বাসী মাত্রেই আবেগাপ্লুত যুক্তিতর্কের বাস্তবতায় হারমানা, জীবনে পোড় খাওয়া, অর্থকরী বিদ্যায় অসফল এক অপরিণত ব্যক্তিত্ব। আমাদের বিবেচনায় মানবজীবনে ধর্মবিশ্বাস, বিশেষ মূল্যবোধ ইত্যাদির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যার অভাবে মানুষ অনেক সময়ই মনুষ্যত্ব হারায়। অবশ্য মানব-ইতিহাসে ধর্মের নামেও বহু কলঙ্কিত ইতিহাস আছে। এটা অন্ধকার দিক। নির্বোধ উত্তেজনা ধর্মবোধ নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য। যদিচ বিশেষ ধর্মবিশ্বাসীর কাছে সেই ধর্ম ব্যাখ্যা এবং মানবধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ঠিক একজাতীয় নয়। তথাপি যুক্তি বিচার, সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, গঠনবিন্যাস, উপদেশ-নির্দেশ, উদ্দেশ্য প্রভাবসফলতা বিশ্লেষণের পথে ব্যক্তি ও সমাজচরিত্রে একটি ধীর-স্থির নিরাবেগ স্থায়ী প্রত্যয় দৃঢ়মূল হওয়া সম্ভব। ধর্মবোধ আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অথচ ধর্মের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিতে গেলে বিপদে পড়তে হয়। সনাতনধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইহুদীধর্ম, ইসলামধর্মের

বিশ্বাসের মূলে সৃষ্টি কর্তা-বিশ্বচরাচর ব্যাপ্ত। বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্মের সংজ্ঞা সেভাবে ঠিক নির্দেশ করা যায় না। তবু সনাতন হিন্দুধর্ম জৈন, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্র, কনফুসিয়াস, ইহুদি, তাও, খ্রীষ্ট, সিন্টো, ইসলাম ধর্মগুলিতে লক্ষ করলে বোঝা যায় কতগুলি বিশ্বাস —বিশেষত অপ্রাকৃত শক্তিতে, জীবন ও জগতের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি— ধর্ম চিন্তার মূলে। এই প্রাকৃত, দৃশ্য, বুদ্ধিগ্রাহ্য জীবনের অতীত একটি অস্তিত্বে বিশ্বাস— যা মানুষের কাছে পরমপবিত্র, পরমসত্য— যে-অস্তিত্বে বিশ্বচরাচর লীন— যা উৎস, যাতে বিলয়, এবং সেই সত্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভই মানব-জীবনের সফলতা তথা উদ্দেশ্য। এতদরিক্ত একটি বিশেষ জীবনযাত্রায় অভিনিবেশ। প্রাত্যহিক-বাস্তব-লৌকিক জীবনও অভিজ্ঞতা অতিক্রান্ত স্বতঃপ্রামাণ্য অলৌকিকতায় আস্থা ধর্মবিশ্বাসীকে স্বাতন্ত্র্য দেয় অন্যান্য নীতি বা মতবাদে বিশ্বাসীর সঙ্গে। এ-জগৎ ঈশ্বরের বিচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকাশলীলা জ্ঞানে জীবকল্যাণে আন্তরিক বাসনাও জন্মায়।

সাধারণত আমরা সংস্কারবশে নিয়ম মতো পালাপার্বণ, আচার আচরণ রীতিনীতিগুলি মেনে চলি অথবা শিক্ষা ও সংস্কার বশে সব-কিছু প্রচলিত প্রথা নিয়ম পরিহার করি। কিন্তু কি ব্যক্তিজীবনে ফলত সমাজজীবনে এই সকল আচার আচরণ, নিয়মনীতি, পূজাপার্বণ ইত্যাদির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত যখন বুদ্ধি গোচর হয়, এইগুলির অনুসরণ হয় স্বেচ্ছা-প্রণোদিত স্বতঃস্ফূর্ত তখন মাদকতা, ভাবালুতা, অন্ধতা থাকে না, সেই স্বতঃস্ফূর্ত আচরণের মূল্য হয় অপরিসীম। আমাদের বিভ্রান্তি সংঘাত বিরোধ এইভাবে প্রশমিত হয়। ধর্ম একভাবে জীবনকে দেখতে শেখায়, বিজ্ঞান আর একভাবে। কিন্তু এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি যে বিপরীতমুখী মনোভাবের সৃষ্টি করবেই এমন কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়। মানবশক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাশ্চাত্ত্য সমাজে মানবশক্তি অতিরিক্ত, দৃশ্য বস্তুজগৎ অতিরিক্ত অলৌকিক অস্তিত্বে বিমুখতা এনেছে। বিজ্ঞানের প্রসার, যন্ত্রের প্রসার প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি যে মনোবলের সৃষ্টি করেছে, অধিকন্তু ফ্রয়েড্ প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের দর্শন কয়েক প্রজন্মে শিক্ষার দ্বারা সমাজে অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত করেছে, তাই আধুনিক মনের ধর্মে অনাস্থা— ধর্মবোধ যেন প্রয়োজনহীন বলে প্রতীয়মান। আমাদের দীর্ঘ যোগাযোগ ও পাশ্চাত্ত্যজীবন ও শিক্ষাদর্শ অনুসৃতির ফলে ঠিক সেই ভাবসমাজে প্রতিফলিত। অথচ আমাদের মহৎ আদর্শ অনু-

সরণের সুযোগ ছিলো এবং এখনো আছে। একটি দেশের সংস্কৃতি সেই দেশের সমাজের ধর্মবোধ, ভাবভাবনা, সংগীত-সাহিত্য, শিল্পকলা, পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠান অর্থনৈতিক কাঠামো, বাস্তবজগৎ ও জীবনের ভোগের সমৃদ্ধির ধারণা, বিশেষ রীতিনীতি, জীবনযাত্রাপদ্ধতি, খাদ্যরুচি, ব্যক্তি-সম্পর্ক, বিবাহ ও যৌনসম্পর্কের ধারণা, ব্যক্তিগোষ্ঠী ও বৃহৎ সমাজের পারস্পরিক নৈতিক আদানপ্রদান, ভালোমন্দ, সৎ-অসতের ধারণা, পরস্পরের আদানপ্রদানের ভাষা ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকে। সুতরাং সেই সব-কিছু আমাদের জানা এবং বোঝার দ্বারাই আমাদের সমাজের শিক্ষা পরিপূর্ণতা পায়। জনজীবনের একটি সভ্য সুস্থ মান দানের উদ্দেশ্যেই ভারতীয় জীবনদর্শন ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা— যুগপৎ অর্থ নৈতিক ও শিক্ষানীতিক পরিবর্তন সাধন সম্ভবত বিধেয়। চরমপন্থা ও চূড়ান্ত শোষণ সে সমাজ ক্ষেত্রে হোক, কী প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষেত্রে হোক, প্রাচ্যজীবনদর্শনের পরিপন্থী। মধ্যপন্থা, সংহতি ও সমন্বয়, পরিমিতি ও সংযম, সহযোগ ও মৈত্রী প্রাচ্যজীবনের আদর্শ, চরিত্রের অনুকূল ভাব।

মানুষের জীবন মাত্র ৬০।৭০ বৎসর, এই পরমায়ুর পরিধিতে অবোধ শৈশব আছে, ব্যাধিজরা অসমর্থ বার্ধক্যের কাল আছে, অবশিষ্ট সময়ের কিছুকাল গঠনে ব্যয় হয়। সামান্য ৪০।৪৫ বছর কী তারও কম সমর্থ বুদ্ধিযুক্ত কর্ম ক্ষমতার সময় মানুষের। উপযুক্তভাবে সেই সময়-টুকুর জন্যই প্রস্তুতি ব্যক্তির জীবনে। এই প্রস্তুতির কালটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি ধর্ম বিষয়টির গুরুত্ব ব্যক্তিজীবনে চরিত্রগঠনে বিশেষ জীবনদৃষ্টির বিকাশে যেমন, তেমনি একটি সমাজ-দেশ-সমগ্র মানবগোষ্ঠীর জীবননীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অপরাপর কতগুলি বিষয়ও প্রস্তুতিপর্বের প্রাথমিক ভাগের শিক্ষায় থাকা বাঞ্ছনীয়, যেমন প্রাকৃতিক ও জীবনের বাহ্যিক প্রতিবেশের সঙ্গে পরিচয় সম্বন্ধীয় শিক্ষা। পোকামাকড়, জীবজন্তু, পাখি গাছপালা, ফুললতাপাতা, জল-মাটি, হাওয়া, আকাশ, শহর-গ্রাম— এরই পরিবেশে মানুষের জীবন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগ, প্রকৃতির প্রভাব মানুষের জীবনে— এইসব-কিছুর সম্বন্ধ প্রয়োজন অপ্রয়োজনের একটি সহজ স্বাভাবিক ধারণা ও ঔৎসুক্য শিশু মনে কিশোর মনে জাগানোও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, মানবের অগ্রগতি সম্বন্ধে ধারণা— প্রগতির পথে প্রকৃতির সম্পদকে, পশুশক্তিকে মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে, কীভাবে মানুষের অগ্রগতি কায়িকশক্তি থেকে যন্ত্র শক্তিতে। একদিকে মানবের প্রচেষ্টা জড়শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাস্তবজীবনকে সমৃদ্ধ সুখকর আরাম-প্রদ করে তোলা আর একদিকে চেষ্টা মানবচিন্তার সমৃদ্ধি উৎকর্ষ সাধন। এমনিভাবেই নানাবিদ্যার উদ্ভব, শাস্ত্রের উদ্ভব— জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জীবন জগৎ সমাজ পরিবেশ— অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত, সেইসব শাস্ত্রের বিস্তার বিষয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সমস্যা নির্দেশ সমাধানের ইঙ্গিত। সুতরাং বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা, উপস্থিতি, প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার, উপকারিতা, অপকারিতা, ঘাটতি, অভাব ইত্যাদি ও পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্দেশ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষায় যতটা উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্দেশ, বিশ্লেষণাত্মক বিমূর্ত আলোচনা ততটা নয়। তৃতীয়ত, মানবসমাজের ভিত্তি পারস্পরিক যোগাযোগে। তার বহুবিধ মাধ্যম: ভাষা, গ্রন্থ, যাতায়াত ব্যবস্থা, যানবাহন, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিসন, চিঠিপত্র, সিনেমা থিয়েটার, টেপরেকর্ড, ভিডিও যন্ত্র, টেলিফোন, টেলেক্স ইত্যাদি অসংখ্য মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষের সমাজে, আদান-প্রদান, চিন্তার বিনিময়। শিক্ষার মাধ্যমে বহুযুগের বহুমানুষের চিন্তার ধ্যান-ধারণার যোগাযোগ। আগামী যুগে পূর্ববর্তী যুগের ভাব-ভাবনা সঞ্চারিত করা। চতুর্থত, জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই সভ্য-জগতের সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা। অঞ্চল বিশেষের উৎপাদন ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা কীভাবে ব্যক্তি মানুষের ও সমগ্র সমাজের অর্থ-নীতির সঙ্গে জড়িত সে-সম্বন্ধে সহজ পরিচিতি ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চমত, দেশের আইন, শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তার জনস্বাস্থ্যের চিকিৎসার বিধিব্যবস্থার, সহজ বিবরণ শিশু কিশোরের শিক্ষার অঙ্গ হওয়া উচিত। ষষ্ঠত, ব্যক্তির খাদ্য পানীয় বাসস্থান পরিধেয় সম্বন্ধে উপযুক্ততাবোধ, স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা আবশ্যক। অধিকন্তু ব্যক্তি-পরিবার সমাজ ও দেশের সরকারের পারস্পরিক সম্পর্ক কর্তব্য-বোধ পালনীয় দায়িত্ব, মানুষের অধিকার স্বাধীন দেশের নাগরিকের অধিকার সম্বন্ধে একটি সমন্বয়ী ধারণার গুরুত্ব সমধিক। শিশু কিশোর যুবকের মনে কোনপ্রকার ক্রোধ, ঘৃণা, অহমিকা, প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন-লিপ্সা, অবজ্ঞা, ঔদাসীন্য সৃষ্টির চেয়ে সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগী গঠনমূলক-

ভাব সৃষ্টিই অধিকতর মঙ্গলকর, তাদের মনে অনুসন্ধিৎসা ও ভবিষ্যৎ দায়িত্ববোধের অঙ্কুর উদ্গমের চেষ্টাই হবে মহৎ কাজ। দেশের অতীত পরিচয় গৌরবের সম্পদের পরিচয়, প্রাকৃতিক খনিজ শিল্প জনসম্পদের পরিচয় যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সম্পদের অভাব, সমস্যা ও ঘাটতির পরিচয়ও তেমনি। অতীত কেমন ছিলো, বর্তমানের রূপ কী, ভবিষ্যতে কী আমরা হতে চাই, কীভাবে সেই লক্ষ্যে পৌঁছন সম্ভব, দেশের ভবিষ্যৎ কাদের উপরে নির্ভর করে, এসব সম্বন্ধে সহজ আলোচনা কিশোর যুবকমনকে উদ্দীপিত করে নিঃসন্দেহে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবন-যাত্রা ভাষা ধর্ম খাদ্যরুচি শিল্পসংস্কৃতির পরিচয়, শহর-নগর-গ্রামের পরিচয় নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক। এই সব-কিছুর ধারণার সমবায়ে ব্যক্তির স্বচেতনা সামাজিক চেতনা, সামগ্রিক চেতনা দানা বাঁধে, সমন্বয়ী রূপ নেয় বলে আমাদের বিশ্বাস।

অবশ্য স্বীকার্য যে প্রচলিত প্রথাগত পেশাদারী বিদ্যা অর্জন দক্ষতা অর্জন আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমাজ ও capitalistic system-এর নিদান, ক্রমাগ্রসরণের পথে আমরা এই অবস্থায় উপনীত। বহুজনের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নির্ভরতা অল্পসংখ্যকের উপর, আয়ের অসমতা, পেশার অসমতা, বিশেষ শিক্ষা দক্ষতা, পটুতা নির্ভর। অর্থনৈতিক বিন্যাস কীভাবে এবং কতটা পরিবর্তিত হবে, বৈষম্য কোন্ রাজনৈতিক শাসন-তান্ত্রিক প্রথায় দূর হবে বা আদৌ হবে কিনা এই মুহূর্তে যেন কিছুই অনুমান করা কঠিন, রায় দেওয়া বাতুলতা। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের যদি সমাজ উন্নয়নের স্থির লক্ষ্য থেকে থাকে সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার উদ্দেশ্যে সমাজের গহ্বরে অগ্রগমনের ধ্বনি অনুরণিত হওয়া চাই, শিক্ষা-ব্যবস্থার মাধ্যমে যথোপযুক্তভাবে সোচ্চার হওয়াই অন্যতম প্রেরণা। জনজীবনের প্রাথমিক চাহিদা মেটানো দুটি মোটাভাত কাপড়ের সংস্থান জনস্বাস্থ্য ও জনশিক্ষা যদি আজকের লক্ষ্য হয়, তবে এই সাঙ্গীকরণের শিক্ষা একভাবে মদত দেবে। একদিকে অধিকারের চেতনা, অপরদিকে কর্তব্যের প্রেরণা একটি সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ ও উদ্দেশ্যের সমতা সমাজে সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির পথ সুগম করবে এমন আশা হয়।

জনশিক্ষায় ধর্মশিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা

বর্তমান নিবন্ধে ধর্মবোধ ও জনশিক্ষায় ধর্মের মূলমন্ত্রের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখার প্রয়াস আছে। পাণ্ডিত্যের অভিমান বা যুক্তি তর্ক বিতণ্ডায় স্বমত প্রতিষ্ঠা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অধিকার।

আমাদের মতো সাধারণের সে অধিকার নেই, তথাপি জীবনের অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা, পীড়া মনে কতগুলি সংশয় জাগায়, সূক্ষ্ম বেদনাবোধ সংশয় নিরসনের পথও দেখায়। কৃতিত্ব, বিত্ত ও বৈদগ্ধ্যের শিখর থেকে অনেক সময়েই সমাজের জীবনের বহু অসঙ্গতি দৃষ্টিগোচর হয় না। জনতার শরিক হয়েও কখনো কখনো একটু পিছিয়ে পড়লে বা দলছুট হয়ে তফাত থেকে দেখলে চলমান জীবনের শোভাযাত্রার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি বহুনীতি না জেনেও অভিজ্ঞতা ও বাস্তবদৃষ্টির ফলে ব্যক্তি-মানুষ বুঝতে শেখে ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরবিশ্বাস ও ঈশ্বরে অনাস্থা লোকায়তে বিশ্বাস একটি সমগ্র সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে কী ধরনের পার্থক্য এনে দেয়।

সমাজবাদের মূলভাবনা যেমন সর্বদেশের দুঃখীমানবের ব্যবহারিক জীবনের উন্নতিসাধন, মানব-অধিকারের উদ্দেশ্য যেমন সবদেশের সব-সমাজের ব্যক্তি-মানুষের কতগুলি অধিকারের দাবীর স্বীকৃতি, তেমনি সর্বকালের, সর্বদেশের মানব-মনের উৎকর্ষের দ্যোতনাই ধর্মভাবের ব্যঞ্জনা।

জড়, জৈব, প্রমাণসিদ্ধ, দৃশ্যবস্তু প্রকৃতি— এর অতীত আর-কিছুর অস্তিত্ব আধুনিক মন মানতে রাজী নয়, কেননা আধুনিক মন, আধুনিক শিক্ষায় পুষ্ট (conditioned)। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মানব-স্বভাবের মৌল উপাদানগুলিকে ব্যাখ্যা করে যে সহজ দার্শনিক রায় দেয় তাতে দেবত্বের অভিমান আর গুরুত্ব পায় না। জড়বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কার, মনোবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ও শিল্পবিপ্লবের ফলে বর্তমান সভ্যতার

যে সমুন্নতি, এই অবস্থায় আধুনিকের জীবনদৃষ্টিতে ধর্মচিন্তার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই সংশয় এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস মূল্যহীন। যে অন্তর্মুখিনতা মানব-ধর্মচিন্তার ভিত্তি, সেই অন্তর্মুখী ভাব আমাদের অধিকাংশকে আর আকৃষ্ট করে না। প্রাণের উৎস ও পরিণাম সম্বন্ধে যে অন্তহীন জিজ্ঞাসা এবং বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত অথচ বিশ্বচরাচরের অতীত যে-শক্তি, যার বহুবিচিত্র বিস্ময়কর ব্যাখ্যা বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধর্মশাস্ত্রে, সে-ব্যাখ্যা আমাদের সন্তুষ্ট করে না। আমরা জড়, দৃশ্য, প্রকট বস্তুর বাইরে আর-কিছুই গ্রাহ্য করি না। ঈশ্বর শূন্য, ধর্ম শূন্য, কামবশত স্ত্রী পুরুষ সম্ভূত সংযোগেই যে জীবনের সৃষ্টি, এই বিশ্বাসে আধুনিক মন আস্থা রাখে। হয়তো আদিম সমাজে ভয় ও অনিশ্চয়তা থেকেই অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস জন্মেছিলো। কিন্তু পরবর্তী কালে বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মবাদ যে পরম মহাশক্তিকে সুচিহ্নিত করে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত শক্তিতত্ত্ব কি সেই সত্যের আংশিক প্রতীতি আনে না?

যে-প্রজ্ঞাবান নির্গুণ ব্রহ্মবাদী ঋষি-মহাপুরুষ এই পরমসত্য উপলব্ধি করেন তাঁর কাছে এ-জগৎ মায়া বলে বিবেচিত হবে, এ আর বেশি কথা কী! ব্যক্তি-জীবনের স্বল্পায়ু অনিত্যতা সব দেশের সাধারণ মানুষই কি একসময় বুঝতে পারে না? স্বল্পবুদ্ধি সাধারণ মানুষের মনেই যদি সে-বোধ জন্মায় তাহলে ক্ষণজন্মা মহামানবের চৈতন্যে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ব্যাপী জীব-জীবনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রাণের উৎস-স্থিতি-বিলয়ের নিরবচ্ছিন্ন সত্যের সন্ধান উদ্ভাসিত হওয়া অবশ্যই সম্ভব। বিজ্ঞানের সত্য কি 'আত্মা'কে সমর্থিত করে না, দ্যোতিত করে না সর্বজীবে ব্রহ্মস্থিতি? জৈব দেহে নিহিত সেই প্রাণস্বরূপ, বারংবার যে-সত্তা আখ্যাত হয়েছে কখনো 'পুরুষ', 'প্রাণ', 'আত্মা' রূপে উপনিষদে, যোগশাস্ত্রে, গীতায়। এই জ্ঞানের উদয় হলেই মানুষ অবিদ্যা থেকে মুক্তি পায়, বারংবার বলা হয়েছে সর্বপ্রকার প্রাকৃত বিদ্যায় পারদর্শী হলেও পরমসত্য উপলব্ধি না হলে স্থিতধী প্রজ্ঞা মানুষের আসে না।

মানুষ জীবজগতে, প্রাণীজগতে উচ্চতর জীব (প্রাণী) মাত্র। কাজেই জীব-স্বভাবের উপাদান, মৌলিক ধাতু মানব স্বভাবেও আছে। কিন্তু জীব-স্বভাবের উর্ধ্বায়ণের প্রকৃতিও মানব স্বভাবে নিহিত, এবং এই উর্ধ্বায়ণেই মানব-জীবনের লক্ষ্য, তথা মনুষ্যজন্মের সার্থকতা। অন্যথায়

জীব-প্রকৃতির অমোঘতায় চংক্রমণ মূল্যহীন। দ্রষ্টা ঋষির ধ্যানে অখণ্ড পূর্ণ মহাশক্তির আশ্রয় উদ্ভাসিত হয়, সেই উৎস থেকেই বিচ্ছুরিত শক্তি-প্রাণ সর্বভূতে বিকীর্ণ। কোটি কোটি কোষের সমবায়ে গঠিত দেহের আধারে প্রাণের স্বল্পকাল স্থিতি, সূক্ষ্ম কোষের ক্রমবিকাশ বৃদ্ধি ও বিনষ্টির পরিণামে উৎসে বিলয়; এই চক্রাবর্তনের ইতিহাস সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের দ্যোতনা, আত্মার অবিনশ্বরতার ব্যঞ্জনা— তারই উপলব্ধি উদ্দেশ্যে মানবের অন্তর্মুখী স্তব্ধতার প্রয়োজনীয়তা। যে-পরম শক্তি বিশ্বচরাচরে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কালে সর্বভূতে বিকীর্ণ পরিব্যাপ্ত, যাতে খণ্ড ও সমগ্র বিধৃত সেই সমগ্র পরম পূর্ণ অখণ্ডের তত্ত্বই বোধগম্য ভাষায় নিরূপিত শ্রুতি শাস্ত্রে। বুদ্ধির অগম্য যে-উপলব্ধি সেই উপলব্ধ সত্যের নির্ণীত চিহ্নিত বুদ্ধিগোচর দৃষ্টিগ্রাহ্য অভিব্যক্তি ও দৃশ্যরূপ নবনব-ভাবে ও ভাষায়, পূজায় অর্চনায়, বালার্করুচি প্রভাত-পূষণের অর্ঘদানে, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী স্মরণে, সর্বভূক অগ্নিতে আহুতিদানে— ধ্যানে, মন্ত্রে, জপে, আরাধনায়।

যে-জ্ঞানলাভের জন্য আত্মমগ্নধ্যান, নিবিড় শাস্ত্রপাঠ ও আলোচনায় একাগ্র স্থিরনিষ্ঠ মানসিক সাম্য-অবস্থা প্রয়োজন, যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ-যন্ত্রের সুস্থতা প্রয়োজন তারই ব্যাখ্যা শাস্ত্রে এবং স্পষ্টভাবে নির্দেশিত যে মানসিক সাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়া ব্যক্তি-মানবের পক্ষে সম্ভব মানব-প্রকৃতির নিম্নগামী জীবপ্রবণতাগুলি সংযত করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা, হিংসা প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি দমিত হলে, অহং-এর আধিপত্য সংযত হলে তবেই মানুষের স্থির প্রত্যয় জাগার অনুকূল মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে, যে-মানসিক সাম্য অবস্থায় ধ্যান সম্ভব এবং ধ্যান-মগ্নতায় শুদ্ধ চৈতন্য উপজিত হবার সম্ভাবনা, যে-চৈতন্যে লীন কূটস্থ জীবশক্তি ও বিশ্বচরাচরে ব্যাপ্ত শক্তির নিগূঢ় একাত্মতা। মরমীয়া, সাধক, ঋষি, দার্শনিকের অতীন্দ্রিয় বোধির প্রকাশের ভাষা ব্যাখ্যা, প্রতীতি এবং মানবসমাজে অভিব্যক্ত প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানের ভাষা বিচার ব্যাখ্যা প্রযুক্তি ভিন্ন হবেই। শাস্ত্রে তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনধারায় বুদ্ধি ও বোধ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করার নির্দেশ; শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, প্রৌঢ়ত্বে, বার্ধক্যে আশ্রমধর্ম-পালনের সুনির্দিষ্ট প্রথা। এই আচরণীয় পালনীয় কর্তব্য কর্ম নিয়ম নিষ্ঠা এবং লক্ষ্যের স্থিরতার সঙ্গে যুগে যুগে সভ্যতার ক্রমবিকাশে মানবজীবনের

প্রয়োজনীয় বস্তু সমৃদ্ধি সদ্‌ব্যবহারের কোন বিরোধ নেই। বুদ্ধির স্তর-ভেদ, গ্রহণের শক্তি, স্বভাবজ প্রকৃতি অনুযায়ী মানব-ব্রতউদযাপনে তিনটি পথ চিহ্নিত। সাধনা নিরলস হবে জীবনব্যাপী, তবেই ক্রম-পরিণতির পথে মাণবকের অন্তরে পূর্ণ অখণ্ড সমগ্র ও ব্যক্তি খণ্ড অপূর্ণের পারস্পরিক সম্বন্ধের নিবিড় ধারণা আসা সম্ভব। যে-ধারণা নির্মুক্ত দৃষ্টি প্রসন্নতা ও তৃপ্তিতে মানবজীবনকে সার্থকতা দেয় তারপর অপ্রগলভ অপ্রমত্ত ক্ষান্তিতে সমাপ্তি আসে।

বিশ্বজগৎ ও চলমান জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আত্মজাগরণ, লক্ষ্যের স্থিরতা ও ব্যক্তি-জীবনের সীমাবদ্ধতার উপলব্ধি নিত্য অর্থে সর্ব-ধর্মের মূল কথা। সনাতন ধর্মে, বৌদ্ধ জৈনধর্মে মানবজীবনের ঊর্ধ্বায়ণই জীবনের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। সেই দিক থেকেই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের সার্থকতা বিচার করা হয়েছে। সাধকের ধ্যানলব্ধ বোধি সাধারণ বাক্যও মনের আয়ত্তে আসে না। সেই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি, বিমূর্তভাবই সম্ভবত ঈশ্বর-চেতনা যার প্রক্ষেপ রূপে, মূর্তিরূপায়ণে।

কোনভাবেই পূজা, অর্চনা, আরাধনার বিচিত্র অভিব্যক্তি উপেক্ষা করা যায় না। মন্দিরে, মসজিদে, গীর্জায় একই মনোভাবেরই বিভিন্ন প্রকাশ। সাধক, ঋষি, ধর্মপ্রবর্তকেরা যে-যুগে যে-সমাজের পরিবেশে জীবিত ছিলেন সেই সমাজের ধ্যান-ধারণা জীবনদৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে মানবের অন্তর্নিহিত ভাবটির উন্মেষ ও বিকাশের পথনির্দেশ করে গিয়েছেন, যে-ভাব, যে-বোধের সম্যক্‌ উপলব্ধি একই জন্মে জন্মান্তর ঘটায়। সীমা ও অসীমের তত্ত্ব ভাবগ্রাহী-দৃশ্য-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বুদ্ধিগ্রাহ্য-বেদনগ্রাহ্য-ঈশ্বরতত্ত্বে মানুষ পায়।

ভারতীয় ভাষায় ধর্ম শব্দের অর্থ খুব ব্যাপক। যা মানবজীবনকে ধারণ করে রাখে, মানবজীবনের উদ্দেশ্যের প্রতীতি দেয়, মনুষ্যজন্মের সার্থকতারূপ শ্রেষ্ঠ গতির নির্দেশ দেয়, তাহাই ধর্ম ; পরম-জ্ঞান, ঈশ্বর-তত্ত্ব, আধ্যাত্মিকতা, জাগতিক ন্যায়-নীতি, পূর্বসংস্কার, কর্তব্য সব বিধৃত। এই ব্যাপক ধারণার সমাহার 'ধর্ম' শব্দে। ভারতীয় সমাজ-জীবনের ভিত্তিই এখানে ; ব্যক্তি এবং সমষ্টির মানসিকতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য যদি এই মূল মানবদর্শনের ভিত্তিচ্যুত হয়ে যায়, তাহলে সমাজ-জীবনে নিরতিশয় বিভ্রান্তি বিশৃঙ্খলা অপরিণামদর্শী নিষ্ঠুর দানবীয় প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।

'ধর্ম' শব্দটিকে অনেক সময়েই আমরা রিলিজিয়ন শব্দের সমার্থক

মনে করি, অদৃশ্য নিয়ন্ত্রক শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস বা নিষ্ঠাপূর্ণ, ভক্তিপূর্ণ, আনুগত্য মাত্র মনে করে অর্থ সংকোচ করি। কিন্তু ধর্মই যে ভারতীয় সমাজের জীবনদৃষ্টি তা ভুলে যাই। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই শাস্ত্রে ঋষিবাক্যে বারংবার সাবধান-বাণী। মানব-জীবনের সার্থকতার ধারণা বিস্মরণ হয় বলেই ব্যক্তি, সমাজ, বিশেষ জাতি, তখন নিম্নগামী প্রবৃত্তির জয়গানে মুখর হয়। অসুর-স্বভাব বিশিষ্ট জনগণ লোকায়ত মত আশ্রয় করে, ক্রূরকর্মা অনিষ্টকারী দাম্ভিক মদযুক্ত অবিবেকী চিন্তার আশ্রয় করে, কাম এবং ভোগই জীবনের পরম পুরুষার্থ এইরূপ চিন্তাগ্রস্ত হয়।

কে অস্বীকার করবে কাম এবং ভোগের আকাঙ্ক্ষাই মানবের দুঃখের মূল কারণ নয়? মানব-দেহধারী জীব নিবৃত্ত হতে পারে না, কিন্তু ধর্মবোধ তাকে পরিমিতি দিতে পারে। ধর্মই সন্তোষ ও শান্তি দিতে পারে। যদি সদাচার না করি, শুচিতা রক্ষা না করি, সত্য পথ অবলম্বন না করি, শাস্ত্র উপদেশ অমান্য করি, জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হই তাহলে স্ব এবং জগৎ কোন হিত-চিন্তাই আসে না। প্রতিহত ইচ্ছা থেকে ক্রোধ জন্মায়, কাম ক্রোধ ও বিষয় ভোগের দুর্বার আকাঙ্ক্ষার অধীন হয়ে পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হই, অসৎ উপায়ে অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত হই, বিক্ষিপ্তচিত্ত অবিবেকী হয়ে উঠি। কে অস্বীকার করবে ক্রোধ, লোভ, কাম তিনটিই অধোগতিদায়ক নয়— এর ফলেই মানুষ শুভবুদ্ধি হারায়, ঈর্ষায় দর্পে গর্বে লোভে দয়া ক্ষমা প্রসন্নতা ধৃতি সন্তুষ্টি বিনষ্ট হয়, আঘাতের প্রবৃত্তি হিংসা উদ্ভূত হয়— ব্যক্তি বা সমষ্টির এমন মানসিক অবস্থায় সর্বব্যাপী কল্যাণের ভাবনা জাগে না, আসে না উদার নিমগ্ন দূরদর্শী গভীর মানবিকতা। জনসাধারণের মন থেকে ধর্মভাব লুপ্ত করার যে-চেষ্টা আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় তার ফল যথার্থ শুভ নয়, বরং নির্বোধ এবং নিষ্ঠুর দৃষ্টান্ত সমাজে প্রকট।

যেহেতু সংগঠনের সুষ্ঠুতা ও আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে ও পাশ্চাত্ত্য ধনিক রাষ্ট্রগুলি ছিটেফোঁটা ভাগ দেয় বা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জবরদস্তি করে একটা আর্থিক সমতা রক্ষা করে— আমরা পাশ্চাত্ত্যের ব্যবস্থায় মুগ্ধ হই। অপর দিকে বিপরীতধর্মী পাশ্চাত্ত্য জীবনদৃষ্টির প্রভাবে নির্বুদ্ধিতাবশত এমন কতগুলি স্বার্থবাদী শ্রেণী দরিদ্র দেশগুলিতে সৃষ্টি হয়েছে যারা ছলে-বলে-কৌশলে স্বার্থসিদ্ধিই

পরমার্থ বলে মনে করে এবং সমাজে অসন্তোষ ও আক্রোশ বৃদ্ধি করে, মানুষের বিশ্বাসকে রাজনীতির হাতিয়ার করে।

অর্থনৈতিক অবস্থার চাপ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে যে-উষ্মা ও অস্থিরতার সৃষ্টি করে সেই অবস্থায় সহজেই হিংসার ইন্ধন যোগান দেওয়া যায়। সারা পৃথিবী-ব্যাপী কালো-ধলোর বৈরভাব, ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের হিংসাত্মক লড়াই। ভারতবর্ষে বর্ণ ও (ethnic group) জাতিগত সমতা থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতার জন্য পরস্পর আক্রোশে ভুগি। অথচ সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মের ইতিহাস হিংসা-কলঙ্কিত ইতিহাস নয়। খ্রীষ্টধর্মের প্রচারে প্রলোভন দেখানো, ইসলামের প্রচারে বলপ্রয়োগ ও হিংসার ইতিহাস আছে। অথচ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরতত্ত্ব ইসলামধর্মেরও মূল দর্শন।

আসল কথা, ধর্মবিশ্বাসের ভিন্নতা সমাজে বিরোধের কারণ হতে পারে না, বিরোধের কারণ রাজনৈতিক প্ররোচনা, অর্থনৈতিক চাপ, অজ্ঞতা ও ধর্মশিক্ষা-বিযুক্ত শিক্ষানীতির প্রভাব। কোন ধার্মিক ব্যক্তি অসহিষ্ণু হিংসার প্ররোচনা দিতে পারে না। আচার্য রামানুজের নির্দেশ স্পষ্ট -- নিজের ধর্ম অনুশীলনে দৃঢ়তা নিষ্ঠাই কাম্য। ধর্মের সারবত্তা জ্ঞাত হলেই মানুষের সহনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। বহুভাষা, বহুমত, বহুধর্ম আচরণের যে বৃহৎ সমাজ ভারতবর্ষ, সেখানে সহনশীল মনোভাবই স্থিতিশীল ছিলো এযাবৎ কাল। কেন এবং সমাজের কোন্ স্তরে সহনশীলতার অভাব দেখা দিয়েছে তা ভেবে দেখা দরকার। এখনো পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী জনগণের সহনশীল মনোভাব বজায় আছে— অধিক যুক্তি-তর্কবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত না হয়ে সর্বধর্মের মূল মন্ত্র জনশিক্ষার প্রবর্তন করা ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর।

বিভিন্ন দিক থেকে ধর্মের আলোচনা হতে পারে— দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, আলোচনা. ব্যক্তির মনের উপর ক্রিয়া, সমষ্টি বা সমাজের উপর প্রভাব, সামাজিক জীবনে বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রভাব, ঐতিহাসিক আলোচনা, বিভিন্ন ধর্মের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা— এর ফলে ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজে এক ধরনের সচেতনতা আসা সম্ভব। আস্তিক্যবাদ হোক, নাস্তিক্যবাদ হোক, উন্নত মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষসাধনে ধর্মবোধের শিক্ষাই অন্যতম পথ। নাস্তিকতা বা নিরীশ্বরবাদিতার সঙ্গে অধর্মের সংযোগ করা ভুল। নাস্তিক

সে, যে বেদ ও ব্রাহ্মণে বিশ্বাস করে না। ভগবান বুদ্ধ বেদ ও ব্রাহ্মণে আস্থা রাখেন নি। কিন্তু তিনি স্বয়ং হিন্দুর কাছে অবতাররূপে গণ্য। তিনি বেদের অপৌরুষেয় ও ব্রাহ্মণের আধিপত্য অস্বীকার করেন। কিন্তু ধর্মকে পরিহার করেন নি, তিনি সাধনায় সিদ্ধ হয়ে পরমজ্ঞান লাভ করে অপার করুণায় সর্বমানবের কল্যাণ ও মুক্তির উপায়, পথের নির্দেশ দেন। তিনি ঈশ্বরের ব্যাখ্যা দেন নি, মানবের আচরণীয় ধর্ম কি, দুঃখকে জয় করার উপায় কি, জীবনের সার্থকতা কোন্ পথে তারই নির্দেশ দেন।

এই নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে লোকায়ত মতবাদী নাস্তিকতা, আধুনিক ধর্মহীন জড়বাদী শিক্ষার ফলশ্রুতিগত নাস্তিকতায় সবিশেষ পার্থক্য। কেননা এই শিক্ষা, অধিগত দক্ষতা মানুষের অহংবুদ্ধিকে প্রবল করে এবং জীবনের সার্থকতা যে জড়বস্তু সম্ভোগে স্বভাবজ জৈব প্রকৃতির পূর্ণ চরিতার্থতায় এই বিশ্বাসই দৃঢ় করে। মানবের অন্তর্লীন গূঢ় দৈবসত্তাকে আমল দেয় না। মূলত এই দুই বিপরীতধর্মী জীবনদর্শনের ভিত্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজে। মানব-চরিত্রে দুই উপাদানই বলবৎ, সমাজের তথা সমষ্টিগত চারিত্র-লক্ষণ প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য দেখা দেয় যে সমাজে যে-দৃষ্টিভঙ্গি যে-দার্শনিক ভিত্তি স্থায়িত্ব লাভ করে।

ভারতবর্ষ তথা সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজপর্যন্ত যে-ভাব জন-জীবনকে ধারণ করে আছে সেই ভাবের মূল উৎপাটনের চেয়ে রক্ষণা-বেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অধিক। আজ যখন বিংশ শতাব্দীর অন্তিমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত সমগ্র সমাজের মানসিক পারবর্তন ব্যতীত সর্বাঙ্গীণ মানবিক কল্যাণ সম্ভব নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের উদ্‌বৃত্ত আথিক সহায়তা বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কাঠামো হিতকর, কল্যাণকর, সুখকর স্থায়িত্বে পর্যবসিত হবে না, হিংসা, হত্যা, অর্থগৃধ্নুতা, লোভ, কাম-প্রবৃত্তির উদ্দামতার ফলে সংসারের সমাজের বিশৃঙ্খল প্রবণতা, চতুর শোষণ কদাচ দূরীভূত হবে না, যদি না ধর্মবোধের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে পরিমিতিবোধ ও সমতা-সন্তুষ্টি জাগে।

পাশ্চাত্ত্যের শক্তিমত্তা, উগ্র ধ্বংস-হিংসাবাদ, অহংপ্রাধান্য স্পষ্টত প্রমাণ করে, ধর্মবিযুক্ত শিক্ষার প্রভাব জনশক্তিকে কতটা উন্মাদ স্ব-স্বার্থ সচেতন, হিংস্র ক্রূর ও ধ্বংসান্বেষী করে তুলতে পারে। পূর্ব সমাজের মানুষের একটা মধ্যপথ অবলম্বন করা ব্যতীত দ্বিতীয় পন্থা নেই।

পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী জীবন-বেদ আজ শতাব্দীর অধিককাল-ব্যাপী প্রাচ্য সমাজের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, আমরা সে-সভ্যতার, সে-সমাজের বলদৃপ্ত প্রাচুর্যময় ঐশ্বর্যের প্রতি মুগ্ধ লোভনদৃষ্টি দিয়েছি, তাদের চিহ্নিত পথ অনুসরণ করে কিছু ভালো এবং বহুতর মন্দ আমাদের সমাজে, জীবনে আমদানি করেছি, ঐতিহাসিক কারণেই তা ঘটেছে. সুতরাং বর্তমানের বিড়ম্বনা ও বিশৃঙ্খলা থেকে আমাদের রেহাই নেই। কিন্তু সেই সমাজের জীবনের নিঃস্ব, রিক্ত, দানবীয় রূপটি আজ যখন প্রকট হয়েছে তখন ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে সংশোধনের উপায় খোঁজাই নিঃসন্দেহে বুদ্ধির পরিচায়ক।

ধর্মদ্দেশনার সঙ্গে যুগের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বা যন্ত্র technology-র সদ্‌ব্যবহারের কোন বিরোধ থাকার কারণ নেই। যথার্থ প্রয়োজন জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন। পরিবারের জীবনযাত্রা, সমাজের পরিবেশ এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা— এই তিনের সহযোগেই অগ্রবর্তী যুগের ধ্যান ধারণা, চিন্তা, জীবনদৃষ্টি, মূল্যবোধ, পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। পরিবারের প্রভাব, দেশ-কালের প্রভাব, প্রচলিত শিক্ষার প্রভাব নিরন্তর ব্যক্তির মনে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে চলে, যদি বিশেষ ভাব-ভাবনা জীবনদর্শন সমাজকে ধারণ করে না থাকে, ব্যক্তি যদি সেইভাবে উদ্দীপিত না হয়, তবে সতত চঞ্চল স্থির লক্ষ্যহীন বিভ্রান্ত ব্যক্তি-মন কোন পথের সন্ধান পায় না, অনির্দিষ্ট লক্ষ্যহীন জীবনযাত্রায় সামাজিক বিশ্লিষ্টতা প্রকট হয়।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে-গ্রামকেন্দ্রিক শান্ত নিরুদ্বিগ্ন স্বল্পে-সন্তুষ্ট কৃষি-সভ্যতার অনুকূল জীবনযাত্রায় ধর্মভাব ব্যাপ্ত ছিলো, আশ্রমবিহিত আচার-আচরণ সম্ভব ছিলো, আজ সুদূরপ্রসারী নগর সভ্যতার যুগে সে-সম্ভাবনা এবং প্রয়োজন দুই ফুরিয়েছে।

আমাদের বক্তব্যের প্রয়োজন ফুরায় নি, বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞানের শক্তি মানুষকে বলীয়ান করেছে, বাস্তব প্রাকৃত জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আরাম এনে দিয়েছে— মানব-সভ্যতার সমুন্নতির এই পর্যায়ে সেই স্বাচ্ছন্দ্য আরাম অর্থাৎ সমৃদ্ধির ভাগ সমভাবে বণ্টন করতে হলে যে ব্যাপ্ত কল্যাণকর সর্বমানবিক চিন্তা বা সচেতনতা থাকা প্রয়োজন, ধর্মভাবই মানুষকে তা দিতে পারে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন অবস্থা কোন সময়ের শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই, সে-কারণে

ধর্ম-শিক্ষাকে বিযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। বিজ্ঞান, কারিগরী-বিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি কোন শিক্ষার বিশেষীকরণের সঙ্গে ধর্মশিক্ষায় কোন আত্যন্তিক বিরোধ থাকতে পারে না। যুগে যুগে মানব-সভ্যতার সমস্ত আবিষ্কার উন্নতির সুফল কুফলের সঙ্গে মানবের ধর্মবোধ যুক্ত থাকবে। ধর্মকে ব্যক্তি-জীবনের, সমসাময়িক কালের সীমাবদ্ধতা অনুভব করায়, স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগে সমতা ও পরিমিতিকেই জীবনের যথোপযুক্ত প্রাপ্তি বলে অনুভব করায়, ফলে একপ্রকার সন্তোষ, শান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হয়, এই অনুভূতি ধীরে ধীরে বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ-কালের সীমানা ছাড়িয়ে সর্বমানব-বোধের সঞ্চার করে।

দ্বিতীয়ত যে ছিন্নমূল সচলতা, দুর্বারগতি আধুনিক সভ্যতার প্রকৃতি-প্রবণতা এবং যে সুষ্ঠু সংগঠন-মূলক কার্যকারিতা সে-সভ্যতার অবদান এই দুই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্যই সীমাবদ্ধ এবং পঙ্গু আমাদের সমাজে। ক্রূর রাজনীতি-প্রসূত, হিংসা-প্রসূত অথবা নির্মম প্রাকৃতিক বিপর্যয়-প্রসূত সচলতা— অর্থাৎ সহায় সম্বলহীন মানুষের প্রাণের দায়ে শহরে এসে ভীড় করা বা প্রাণভয়ে ভীত কপর্দকহীন কয়েক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু অবস্থা প্রাপ্তি ছাড়া সচলতা সীমিত সম্প্রদায়ে সীমাবদ্ধ। কর্ম ব্যপদেশে নিম্নমধ্যবিত্ত, চাষী কৃষক শ্রমিকের এক প্রদেশ থেকে আর এক প্রদেশে সচলতা খুবই কম। সর্বক্ষেত্রে সংগঠন-মূলক কার্যকারিতা পাশ্চাত্ত্য সমৃদ্ধ দেশগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট। যেমত অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র জনসমাজকে বাস্তব-জীবনের সমৃদ্ধির কিছু-মাত্র অংশও দেওয়া সম্ভব হয় নি, অথচ তাদের মানসিক সমৃদ্ধি হরণ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় না। দরিদ্র সমস্যা-পীড়িত জনসমাজে পাশ্চাত্ত্যের জীবনদৃষ্টি, ব্যক্তিবাদী ধর্মবিযুক্ত শিক্ষা দুর্লক্ষণ-যুক্ত সুবিধাবাদী সৃষ্টির অনুকূল বটে, কিন্তু দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজীবনের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকারক। সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতার শিক্ষায় ব্যক্তিবাদ স্বপ্রাধান্যের শিক্ষার বিপরীত মনোভাব সৃষ্টি অপেক্ষাকৃত কল্যাণপ্রদ। এই সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাতেই ভারতীয় জীবনদর্শনের বনিয়াদ দৃঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয়। নচেৎ শুধু দণ্ডনীতির দ্বারা ন্যায় ও শৃঙ্খলা সমাজে বিধান করা সম্ভব নয়। দণ্ডনীতি ও ধর্মনীতি— এই দুটি শক্তির উপযুক্ত সমতা না থাকলে সমাজে একদেশদর্শিতা

প্রাধান্য পায়—পৃথিবীর সমসাময়িক ইতিবৃত্তে ন্যায়নীতি বিচারের প্রতিষ্ঠার নামে প্রহসন সাক্ষ্য দেয় কৌটিল্যের অভিমতের যাথার্থ্য।

আমাকে সংযত হতে আদেশ করলেই আমি সংযত হতে পারি না, সংযম অভ্যাস করতে হয়; ক্রোধ, লোভ সংবরণ করতে বললেই তা পারি না, যদি সে-শিক্ষা না থাকে, হিংসা দ্বেষ শোষণ দমিত হয় না যদি মহতের আদর্শ জীবনে অনুসৃত না হয়। দেশের প্রতি সমাজের প্রতি প্রীতি, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যও জন্মায় না যদি আমাকে সে-শিক্ষা সমাজ না দেয়। সূক্ষ্ম তার্কিকতা নিষ্প্রয়োজন, ব্যক্তির অন্তর্জীবনের ইতিহাস অপরের নিকট স্পষ্ট নয়; কিন্তু বহির্জীবনের ঘটনা-পরম্পরা আমরা ঘটতে দেখি, ব্যক্তির আচার-আচরণের প্রকাশ দেখি, তাই দিয়ে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি বোধবুদ্ধি জীবনের প্রাপ্তি, মূল্য উদ্দেশ্য বিচার করি। একথা বলাই বাহুল্য যে, আমার মন দিয়ে আমি জগৎ দেখি অপরকে দেখি, আমার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে বিচার করি, একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাই এবং তা প্রকাশ করি। দুটি শাক-অন্নে মোটা কাপড়ে সামান্য একটু আচ্ছাদনের নিচে বেঁচেবর্তে থাকা বা অর্থবিত্তসম্পদ লাভ বা জ্ঞানের অন্বেষণ ব্যক্তি-বিশেষের প্রবণতা নির্ভর। কিন্তু মানব-সভ্যতার যে-পর্যায়ে আমরা জীবিত সেই পর্যায়ে কতগুলি সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য-আরাম-সুখ-নিরাপত্তা-খাদ্য আমাদের না জুটলে আমরা দারিদ্র্য অনুভব করি। যে-জীবনযাত্রার মান আমরা আশা করি সে-মান না থাকলে আমরা দুঃখ পাই।

যে-সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমাজ সেই সর্বনিম্ন মানের ও নিম্নমানে জীবন কাটায় তাদের জীবনমানের বাস্তব উন্নতির জন্যই সমগ্র সমাজের মানসিক উন্নয়ন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং তার প্রথম ও অন্যতম প্রধান সোপান ভারতীয় ধর্মভিত্তিক জীবনদর্শনের শিক্ষা দৃঢ়-মূল করা। শিক্ষা-সংস্কারের পথেই সমাজ সংস্কৃত হয়। শিক্ষায় যদি মনুষ্য মাত্রেরই আচরণীয় বিহিত ধর্মের কোন নির্দেশ না থাকে, পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ বা অনুষ্ঠানের উপর সেই ভার বর্তায় তবে বহিঃ-প্রভাবের সমস্ত পথ রুদ্ধ করা প্রয়োজন হয়। চীন বা রাশিয়ার মতো পথে স্বাধীন ভারতবর্ষ যেতে পারে নি। উত্তরাধিকারসূত্রে ইয়োরোপীয় জীবন-প্রভাবের যে অস্থির ও স্বার্থবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-জীবনকে আচ্ছন্ন করেছে, পরোক্ষে যে বিশৃঙ্খল আলস্যপরায়ণতা পেয়ে বসেছে নাগরিক

জীবনে তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষা। ধর্মের শিক্ষা, জীবনের শিক্ষা, আত্মজাগরণের সমূহ শিক্ষা, পারিপার্শ্বিকের জ্ঞান শিক্ষা; শুধু নিরক্ষরতা দূরীকরণ বা কতগুলি সংবাদ পরিবেশন সংবাদ সংযোজন বা প্রতিযোগী মনোভাবের বীজ বপনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা নয়।

দুই

লাঙল যার জমি তার— এই জিগিরে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো বদল হওয়া সম্ভব নয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে বিল পাস করে; সত্যিই কি আজ যে লাঙল দেয় জমি তার, সেই চাষী কি খেয়ে পরে সুস্থভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারছে? ভূমি-সংস্কারের এই নমুনা। এর মধ্যে মহাজন আছে, উত্তর-প্রদেশে ও অন্যান্য প্রদেশে খুনোখুনি আছে। সাম্প্রদায়িক রেষারেষির ইন্ধনের যোগান আছে কৃষি ও কলকারখানা কেন্দ্র করে; চাষী ও শ্রমিকের অভাব অনটন অর্থাৎ অর্থনৈতিক চাপে সংঘবদ্ধভাবে প্রতিকারের প্রচেষ্টা নষ্ট করে দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাম্প্রদায়িক বিভেদ-দ্বেষ, হিংসা জাগিয়ে কার্যসিদ্ধি করে। জনসমাজে যদি ধর্মশিক্ষার বনিয়াদ দৃঢ় থাকে তাহলে এই ধরনের অহেতুক দ্বেষ ও হিংসা বিস্ফুরিত হতে পারে না। কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য -সংক্রান্ত অর্থ যে-শ্রেণীর কবলিত তাদের সংযত করার উপায় কি? খুন? অথবা তাদেরই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি আর জনসমাজের দুর্দশা চিরস্থায়ী করার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা!

একটি বিদ্বেষ জিইয়ে রাখা হয়েছে বর্ণ হিন্দু ও অস্পৃশ্য হিন্দুর মধ্যে। স্পৃশ্য অস্পৃশ্যই বা কি, হিন্দু মুসলমানের বিভেদই বা কি। আমি একটি পরিবারে জন্মেছি— পিতামাতা আমি পূর্বাহ্ণে নির্বাচন করতে পারি না। আমার জন্ম হয়েছে। সে-পরিবারের একটি বিশেষ পেশা বা সে-পরিবার একটি বিশেষ বর্ণে বা জাতিতে চিহ্নিত, কি একটি বিশেষ ধর্ম সে-পরিবারে আচরিত হয় সেজন্য কারো প্রতি দোষারোপ, কারো প্রতি আক্রোশ পোষণ করা সম্পূর্ণ অমূলক। আমি যদি অচ্ছুতের ঘরে জন্মে থাকি, যদি মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্মে থাকি, আদিবাসীর ঘরে জন্মে থাকি, কী আসে যায়— শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনের বাধা কোথাও

নেই। সব সমাজের দরিদ্রের অবস্থাই সমান— হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, আদিবাসী হোক, কী খ্রীষ্টান হোক, বৌদ্ধ হোক। শিক্ষা যোগ্যতা ও যোগাযোগের ফলেই অর্থ নৈতিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব। একথা কিছুটা সত্য যে পিতামাতার বুদ্ধি বিবেচনা, আর্থিক সামাজিক প্রতিষ্ঠা শহরবাসের সুযোগ, সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠা সুগম করে। কিন্তু, পাশ্চাত্ত্য সমাজের দৃষ্টান্তে দেখি এ-ধারণা ভিত্তিহীন। ব্যক্তিবাদ সেখানে এমনি প্রবল যে, সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকের সন্তান রেস্টুরেণ্ট চালাতে পারে, ব্যবসায়ী আপিসে কেরানি হয়ে খুশি থাকতে পারে, জলের কল সারিয়ে পয়সা রোজগার করে সুখী হয়। কারণ সম্মানের আকাঙ্ক্ষা এ-সমাজে প্রাধান্য পায় না, যদি অর্থসমতা জাগতিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপযোগী হয় তাতেই সন্তোষ। আমাদের সমাজেও বাস্তব অর্থ নৈতিক উন্নয়ন উপরোক্ত ক্ষোভ দূর করতে পারে।

আমরা বুঝতে অপারগ হই, কেন অচ্ছুতের জল চলে না বলে ক্ষুব্ধ হই, অভিমান-বশে ধর্ম ত্যাগ করি, রুষ্ট হয়ে বিষময় বাদানুবাদ জুড়ি এবং ঘোরতর বিবাদে শক্তি ক্ষয় করি। পূর্ববর্তী নিবন্ধে বলবার চেষ্টা করেছি খাওয়া ছোঁওয়া রুচির ব্যাপার। এখানে বক্তব্য রাখি, সম্মান শ্রদ্ধা ব্যক্তি-গুণের উপর নির্ভরশীল, উত্তরাধিকারসূত্রে কোন দাবী টেঁকে না। অচ্ছুত-সন্তান সম্মানের যোগ্য হতে পারে, ব্রাহ্মণ-সন্তান শ্রদ্ধা ও সম্মানের অযোগ্য হতে পারে। শিক্ষিত ধার্মিক সমাজ-কল্যাণকামী অচ্ছুত, স্বার্থবাদী, ব্যক্তিবাদী, গোষ্ঠীবাদী, অর্থলিপ্সু, ক্ষমতা-অন্বেষী ব্রাহ্মণের চেয়ে শ্রেয় এবং সমাজে তার নেতৃত্ব কাম্য। কিন্তু অশিক্ষিত নির্বোধ অদূরদর্শী অচ্ছুতের নেতৃত্ব বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে —গাণিতিক জন-সংখ্যাগরিষ্ঠতার সায় কোন ব্যক্তিকে গুণগত যোগ্যতা দেয় না, একথা আমরা তখনি বুঝতে সমর্থ হই যখন বুদ্ধি-বিবেচনা-প্রসূত কুসংস্কারমুক্ত যুক্তিসিদ্ধ মনোভাব জাগে। গোহত্যা নিষেধের চেষ্টাও বিদ্বেষ জাগায় না, যদি বুঝতে চেষ্টা করি একটি বৃহৎ সমাজের পঁচাশি ভাগ মানুষের শ্রদ্ধাযুক্ত মনোভাব, যদি যুক্তিসিদ্ধভাবে চিন্তা করি আমাদের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণ নিরাপদ নয়, কুসংস্কারমুক্ত হয়ে যদি চিন্তা করি যে তাবৎ মুসলিম দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান আরবের মক্কা তীর্থেও শুধু গো-বলিদান প্রধান নয়, সেখানে ছাগ বা উটও দেওয়া

চলে, তখন আর গোহত্যা নিবারণের চেষ্টা দেখে হিন্দু-বিদ্বেষী হবার যথার্থ কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকার কথা নয়, গো-বধের বাধ্যবাধকতাও থাকে না।

ইদানীং সেকুলারিজম শব্দটি খুব সোচ্চার। প্রশ্ন জাগে, যে-সেকুলারিজম অধিকাংশক্ষেত্রে ক্রূদ্ধ, শ্রদ্ধাহীন অহম্‌ভাবের উদ্‌বোধক স্বার্থান্বেষী স্ববুদ্ধি ও কুযুক্তিপরায়ণ হতে সহায়তা করে, সে-ধরনের সেকুলারিজমে কাজ কি? সনাতন ধর্ম বিশ্বাসীর সঙ্গে তো অন্য কোন ধর্মবিশ্বাসীর বিরোধ নেই। ভারতবর্ষের মাটিতে হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধ, জৈন, ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে; সনাতন ধর্মে বহুতর সম্প্রদায় বহু ধরনের চিন্তা, তাদের বিরোধ নেই, তাদের পাশাপাশি ইহুদী, ইরানী ধর্ম, ইসলাম, খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় বসবাস করছে; আধুনিক সেকুলারিজমের ধারণা যখন ছিলো না বিরোধ বিদ্বেষ বিস্ফোরণও ছিলো কম। সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুসৃত ধর্মের শাসনযুক্ত শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপক ব্যবস্থা মুসলমান শাসনের আমলে ছিলো না, ইংরেজের শাসনের আমলে ছিলো না, আজও নেই। তথাপি ধর্মশাসন মুক্তি নিয়ে এত সোরগোলের কারণ কি? সেকুলারিজমের অর্থ যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা বা পরধর্মসহনশীলতা তো নয়, তবে যে শাসনের জগদ্দল ছিলো না তারই শাসনমুক্তির জন্য অনাবশ্যক সোরগোলে প্রয়োজন কি?

নিরপেক্ষতার দায় তো ব্যক্তির নয়, আইন-আদালত, রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রনীতির কর্ণধারগণের, সরকারের, রক্ষকের নগর-রাষ্ট্রপালকের, নাগরিকের দায় অপ রধর্ম সহনশীলতার। জন-জীবনে সামাজিক-জীবনে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের চেয়ে আচার-অনুষ্ঠান উৎসব বিশেষ জীবনযাপনের রীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা অস্বীকার করার কোন সঠিক যুক্তি নেই। দৃশ্য সক্রিয় নিষ্ঠায় রত না থাকলে সাধারণ মানুষের মনে প্রতীকি ভাব-দ্যোতনা— আধ্যাত্মিকতা বজায় থাকে না। প্রণতি, পূজা-আরাধনা-ভক্তি ও ভাবের স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ দেখা দেয়। হিন্দু দেবদেবী পূজা করে, মুসলমান রোজা করে, নমাজ করে তাতে ক্ষতি কার? অন্যায় কোথায়?

তিন

যে-জড়বাদী পণ্ডিত ধর্মবোধ পূজা-আরাধনা-ধ্যান ইত্যাদি প্রকাশিত অনুষ্ঠানকে মাদকতার নামান্তর মনে করেন তাঁকে দোষারোপ করি না এই কারণে যে তিনি তাৎক্ষণিক সমসাময়িক জীবনে বিশেষ একটি সমাজের পরিবেশে ভ্রান্ত, উগ্র, শোষণের রূপে বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন সেই তিক্ততায় মানব-জীবনের উৎকর্ষ ঊর্ধ্বায়ণের দিকটি গুরুত্ব পায় নি। হিংসা, দমন, নিষ্ঠুর শাস্তির পথই তাঁর শ্রেয় মনে হয়েছে। অবশ্য স্বীকার্য, অপরাধের দণ্ড শাস্তিবিধান ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা না হলে সমাজ রক্ষা হয় না। কিন্তু স্থায়ী সুস্থ শুভ সর্বাঙ্গীণ মানব-কল্যাণ মানবিক শুভ বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনেই সম্ভব এবং একটি স্থির লক্ষ্যে জীবনদৃষ্টি নিবদ্ধ হলেই মানবের পরম প্রাপ্তির ধারণা বদলায় ; বাস্তব-জীবনের স্বল্প প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি আসা সহজে সম্ভব হয় ; অনাবশ্যক প্রতিযোগিতা, বস্তুসম্ভারেরও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থলোভের আকাজ্ক্ষা দমিত হতে পারে। সুতরাং, সেই মহতের আদর্শশূন্য ব্যাপক শুভ ও শান্তির মঙ্গলের আশাশূন্য জীবনযাপনও কি এক ধরনের বঞ্চনা নয়? ধর্মশূন্য ঈশ্বরশূন্য কেবল বস্তু-আকাজ্ক্ষাময় দেহবাদী জীবনদৃষ্টি একদেশ-দুষ্ট, শান্তি, সন্তোষ ও পরিমিতিবোধের পরিপন্থী জীবনদৃষ্টি। যদি বুদ্ধি যুক্ত হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে শরীর ও ইন্দ্রিয় বশীভূত করে, আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন করে চিত্তবিক্ষেপ দূরীভূত করার কোন নির্দেশ মানব-জীবনে না থাকে, যদি যে-অমৃতস্বরূপ অন্তর্যামী আমার ও সর্বপ্রাণীর আত্মায় স্থিত, সেই মহতের সর্বতোভাবে আশ্রয় ও শরণের নির্দেশ না পাই— অন্তরে কোন আবির্ভূত আনন্দ উপার্জিত হবার সম্ভাবনা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় এবং কদাচ কর্তৃত্ববুদ্ধি দমিত হয় না। আর ঠিক এই অহং সর্বস্বতার দরুনই বহু অসঙ্গতি বহুতর মন্দ সংঘর্ষ বিবাদ সৃষ্টি হয় না কি সংসারে ! শরীর, অহংকার, বুদ্ধি, মন-সহ সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কায়িক, বাচিক, মানসিক সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হয়, কাজেই ক্রিয়মান কর্মে কর্তা আমি এই কর্তৃত্ববোধ মানবের। কিন্তু এই কর্তৃত্বাভিনিবেশরূপ আসক্তি ত্যাগের শিক্ষাই ধর্মের শিক্ষা, কারণ এই অভিমান দূর না হলে কর্তব্যবোধে বিহিত কর্ম-স্পৃহা আসা দুষ্কর, মহৎ ও বৃহত্তর স্বার্থে আত্ম উৎসর্গও আসা কঠিন, এবং তার স্থায়িত্বও সম্ভব বলে বোধহয় না।

সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের অচ্ছেদ্য সমাহারে যে-জাগতিক

জীবন, সেই জীবনের গতিপথে সকল অবস্থাকে শান্তভাবে, ধীরভাবে স্বীকার করা এবং সেই অবস্থাকে অতিক্রম করাই ধর্মের শিক্ষা। ব্যক্তি-জীবনে ধর্মশিক্ষা অপরিহার্য বিবেচনায় স্মৃতিশাস্ত্রে মনুষ্যমাত্রেরই দশটি আচরণীয় আশ্রম-বিহিত ধর্মের উল্লেখ— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। ব্যক্তি-সমাজের একক এবং সমষ্টি-জীবনই সমাজ, সমাজকে ধারণ করে রাখে মানবের ধর্মবুদ্ধি, যে-সমাজে উপরোক্ত চিত্তবৃত্তির অধিকতর বিকাশ, সে-সমাজে শান্তি, প্রীতি, সহযোগিতা, সন্তোষ ও পরিমিতি বিরাজ করে। কোন না কোনভাবে শ্রেণীভেদ সব দেশের মনুষ্য-সমাজে বিদ্যমান, অর্থগত শ্রেণীভেদ বা গুণগত, কর্মনির্ভর শ্রেণীভেদ। সমস্ত অসঙ্গতি বিরোধ উষ্মা উগ্রতার অন্যতম প্রধান কারণ, সমাজে অর্থিক কাঠামোর অসঙ্গতি ধনী ও দরিদ্রের বৈষম্য তথা জাগতিক বস্তু সম্পদ ভোগ প্রাপ্তি অথবা বঞ্চনা-নির্ভর। ধর্মের শাস্ত্রের নির্দেশ— মানসিক প্রস্তুতি ব্যতীত সমাজে এই বৈষম্য বিভেদ কদাচ দূর হতে পারে না।

আর্থিক অবস্থা, জীবনযাত্রার মান, জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধির যে-অবস্থায় ব্যক্তি বা পরিবার জীবন কাটায় তাদের সন্তান-সন্ততির জীবনে সেই প্রকার বা ততোধিক সমৃদ্ধি আসুক বা বজায় থাকুক, এই সাধারণ মানুষের কামনা। জাগতিক-জীবনের মাপকাঠিতে যে ধনের, বিত্তের, বস্তু, সম্পদের অধিকারী তারও সেই কামনা, উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কামনা। জাগতিক-জীবনে যে দরিদ্র, জীবনযাত্রার মানে নিম্ন, সর্বপ্রকার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত, তার কামনা দুটি শাক-অন্নে জীবন অতিবাহিত করা। এই অসমতা যাতে না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই দানের প্রথা, ধনী মাত্রেই, গৃহী মাত্রেরই কতগুলি পালনীয় কর্তব্যের নির্দেশ। আজকের সমাজে সভ্যতার বিশেষ পর্যায়ে গ্রামকেন্দ্রিক স্বল্প-পরিধির জীবন আর নেই, পরিধি বহু বিস্তৃত, কাজেই ব্যক্তি সম্প্রদায় বিশেষের দানে সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, মূলত সেই কারণেই ধর্মের শিক্ষায় আমরা অনাস্থা পোষণ করি; সংগঠিত শ্রেণী আক্রোশ ও পরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগই একমাত্র সমাধানের উপায় বলে বিশ্বাস করি। সম্ভবত আজকের পরিস্থিতিতে পরিকল্পিত সুসংগঠিত সংস্কার প্রচেষ্টাই অন্যতম পথ, কিন্তু আক্রোশ-বৃদ্ধি ও মানসিক উৎকর্ষ বর্জনের পদ্ধতিতে কদাচ স্থায়ী মঙ্গলের আশা আছে বলে মনে হয় না। দেহ মনের সমন্বিত পুষ্টি ব্যতীত ব্যক্তি ও সমষ্টির

স্থায়ী কল্যাণ কীভাবে আসা সম্ভব ? বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের উৎকর্ষ সমৃদ্ধির কেন্দ্র মন, বুদ্ধি। সুতরাং সেই মন বুদ্ধির শিক্ষাচর্চা, মার্জনা সংস্কৃতি সাধনে একদেশদুষ্টতা একঝোঁকা প্রবৃত্তিকেই প্রবল করা বাহ্যত ব্যবহারিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলা, আইন-কানুনের বাধ্য-বাধকতা স্বাভাবিক। আমরা মানি, কিন্তু ব্যক্তিগত-জীবন কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণের অধীন হোক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতমন সেটা আদৌ সমর্থন করতে চায় না। কিন্তু ব্যক্তিগত-জীবনও সত্য অর্থে স্বেচ্ছাধীন হলে কি সমাজ টেকে, পরিবারে শান্তি বজায় থাকে, নিজেই কি স্বস্তি অনুভব করা যায় সব-কিছু তছনছ করে দিয়ে ? মনে হয়, কী ব্যক্তিগত-জীবনে, কী সমাজ-জীবনে কোন ক্ষেত্রেই মানবের অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা থাকা সম্ভব নয়। ধর্মশিক্ষা ব্যক্তির মনের সংযত নিবৃত্তি সংস্কারে এই কারণেই পূর্ণ গুরুত্ব আরোপ করে এবং মানব-জীবনের সীমাবদ্ধতার প্রতীতি জন্ম দেয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিচার যে ধর্মশিক্ষা বা বিশেষ নীতিনিয়ম মানবের অবচেতন মনে স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি নিষ্পেষিত করে — প্রশ্ন জাগে, সীমারেখা কোথায় টানা যাবে, স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি কতদূর পর্যন্ত নির্বাধ থাকবে, কোন্ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ বাধাদান যুক্তিযুক্ত, তার ফল কী ইত্যাদি বহুতর প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া কঠিন। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আধুনিক শিক্ষানীতি বা দর্শনে সক্রিয়। ভালো-মন্দ, ন্যায়-নীতি, জীবনযাত্রার মানের ধারণা যদি আপেক্ষিক হয়, সুখ-সমৃদ্ধির ধারণা যদি দেশ-কাল-সমাজ নির্ভর হয়, তাহলে অপর সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি, ভালো-মন্দ, ন্যায়-নীতি বা জীবনযাত্রার মানের ধারণায় কোটি কোটি ভারত-সমাজের মানুষকে বিচার করব কেন ? বা সে-ধারণা, সে-শিক্ষা আরোপের চেষ্টা, প্রাধান্য পাবে কেন ? এ-প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর মেলে না। তবে এটুকু হৃদয়ঙ্গম করতে পারি যে, সমসাময়িক কালের সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষানীতি গ্রহণীয়। সমসাময়িক ঘটনার ইতিহাসই যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, মানব-মনের সংযম সংস্কার ও পরম শ্রেয় সমগ্রের ধারণা বর্জিত কোন শিক্ষাই সর্বমানবীয়-বোধের ব্যাপকতা ও স্থায়ী কল্যাণের পথে সমাজকে চালিত করতে সমর্থ হয় না।

তাই বারংবার মনে হয়, বহু প্রাচীন কাল থেকে যে-ধর্ম সংস্কৃতির শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে সমাজ-জীবনে প্রবাহিত, শুধু ভারতবর্ষে নয় সমগ্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া-সমাজে, জনজীবনে আজও যা গূঢ়ভাবে বিদ্যমান, সমাজের উপরি তলের পাশ্চাত্ত্য প্রভাব-জনিত বিভ্রান্তি সত্ত্বেও যা সম্পূর্ণ লুপ্ত নয়, সেই ভাবের বোধের পুনরুদ্ধার তথা বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাই ভবিষ্যৎ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, বিধায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষা যুক্তিকরণ সমর্থনীয়। সুপরিকল্পিত সাংগঠনিক শক্তি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার শক্তির সঙ্গে ধর্মবোধ-জনিত মানসিকশক্তির সুষ্ঠু সম্মেলন প্রাচ্য-জীবনে অভিপ্রেত।

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় জীবনবোধের মর্মমূলে যে ঋত, সত্য এবং তপস্যার ধারণা, সেই ধারণা জনশিক্ষা-ব্যবস্থায় বিযুক্তির ফলেই বহুতর বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি ; কর্ম এবং জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক ; মানব-জীবনে, সমাজে সেই পারস্পরিক সমতা রক্ষার জন্যই ধর্মশিক্ষা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই শিক্ষার দ্বারাই সমগ্র সমাজ, মন, চৈতন্যের একটি স্তরে উন্নয়ন সম্ভব।

সমীক্ষা ও প্রস্তুতি

সৃষ্টির পশ্চাতে স্রষ্টা, এই বিশ্বাস সাধারণ মানুষের। স্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ কি, তা নিয়ে তর্ক আছে কিন্তু আদিতে পরিকল্পনা এই বিশ্বাস দৃঢ় কেননা উদাহরণ মিলে যায়।

সভ্যতার বিকাশ, সমাজের বিন্যাস, শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক কাঠামো সব-কিছুর ব্যাখ্যা মেলে ; বিশেষ চিন্তাধারা দৃষ্টি-ভঙ্গির মাপে চিহ্নিত করা যায়। সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থাও বিশেষ যুগের প্রয়োজনানুরূপ চিন্তা-ভাবনা নির্ভর আমরা লক্ষ করি।

ব্যক্তির চরম স্বাধীনতাই সভ্যতার নিদান, এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পাশ্চাত্ত্যের। সাহিত্যে ও জীবনে সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শকে রূপ-দেবার চেষ্টা কত বিচিত্রভাবেই না দেখা দিয়েছে এবং দিচ্ছে। আমরাও অভিভূত হয়েছি। আজ বিজ্ঞান, শিল্প প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যবহারে মানুষের বাস্তব-জীবনের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা পাশ্চাত্ত্য সমাজেরই কৃতিত্ব। আমরা চমকিত, আমরা প্রলুব্ধ, সফল হবার আশায় তাদের করুণাপ্রার্থী।

আমাদের আদান-প্রদান অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য, সীমাবদ্ধতা ঘুচেছে, সারা পৃথিবীর সংবাদ আমরা ঘরে বসে শুনি, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করি। আমাদের সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতি সবই পরিবর্তিত, সময় বদলেছে। এই চলমান-জীবন কোথাও থেমে থাকে না, তবে প্রশ্ন এই যে, পরিবর্তন স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে কোথায় এবং কীভাবে ?

এই শতাব্দীর শেষ-পাদে এসে দেখছি কিছুসংখ্যক শহরের জীবন-যাত্রায় পাশ্চাত্ত্যের মনোভাব ও আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন। উপযুক্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার অভাবে জনজীবনে দুর্বিষহ বিশৃঙ্খলা। জন-সংখ্যার আধিক্যে শহর-জীবন কোলাহলপূর্ণ। তথাকথিত শিক্ষিতের সংখ্যা কিছু বর্ধিত। সমাজে নিদারুণ আর্থিক স্তরভেদ। দিকে দিকে উত্তেজনা, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, শ্রীহীনতা, কোথাও যেন এতটুকু শ্রী, মাধুর্য, শান্তি, সৌন্দর্যের লেশমাত্র নেই। অনটন, বুভুক্ষা, দাবী, উত্তেজনা কোন-

ভাবে অত্যন্ত হীন জীবনমানে বেঁচে থাকা— এই হচ্ছে অধিকাংশ শহর-বাসীর জীবন। চতুষ্পার্শ্বে দুর্নীতি, অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্নতার পরাকাষ্ঠা।

গ্রামের দারিদ্র্য শহরের মতো অতটা ক্লেদাক্ত নয়। কিন্তু দাবী উত্তেজনাও বিদ্বেষ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আধুনিক-জীবনের উপযোগী ব্যবস্থার খুব একটা হেরফের হয়েছে বলে বোধ হয় না। তবে কোথাও হয়তো নলকূপ বসানো হয়েছে, প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে, চিকিৎসা-ব্যবস্থা খুবই সীমাবদ্ধ। আজকাল গ্রামাঞ্চলে পৌঁছানো যায়, রাস্তাঘাট অগম্য নয়। কৃষি-ব্যবস্থায় আধুনিক পদ্ধতি কতটা অনুসৃত হচ্ছে বলা কঠিন। উৎপাদন কতটা বর্ধিত সে-ব্যাপারেও নিশ্চয়তা নেই, তবে ভূমিহীন কৃষাণ কিছুটা বর্ধিত হারে পারিশ্রমিক পায়। কিন্তু টাকার মূল্যমান এত কম এবং প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য এত অধিক এবং তা নিয়ন্ত্রণাধীন না হওয়ায় ব্যক্তির ক্রয়-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

এই যে একটি স্তবকে যে সমাজ-চিত্রটি বর্ণিত হ'ল তা একজন অতিসাধারণ নগণ্য সামাজিকের সরলীকৃত বর্ণনা মাত্র। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক নানা কার্যকারণ পরস্পরের যৌগিক সমবায়ে সমাজ-জীবন জটিল। ইতিহাস গতির ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজ একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক সংস্থান অনুযায়ী হয় তার রূপায়ণ। দেশ-প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় যুগে যুগে সমাজের প্রয়োজনানুগ নীতি নির্ধারিত হয়।

এই নীতি যদি একটি সদ্য-পরিচিত বা আগন্তুক-ভাবকে প্রাধান্য দেয়, সমাজ-মন সহজে তা গ্রহণ করতে পারে না। বলপ্রয়োগ বা আইনের সহায়তাও অনেক সময় কার্যকরী হয় না। সম্ভবত সেই কারণেই জনশিক্ষা-ব্যবস্থায় যে আদর্শ নীতি গ্রহণ করা হয়, তা জাতির ঐতিহ্যের পরিপূরক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় শিক্ষা এবং জীবন পরস্পর ওতপ্রোত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করা যায় আমাদের বর্তমান অবস্থা, সমাজের উপরিতলে যে-শিক্ষা বিস্তৃত হয়েছে সীমিত গোষ্ঠির মধ্যেই এক ধরনের মানসিক সমতা। গোটা সমাজের সঙ্গে মনের যোগ খুব কমই। কেননা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ব্যক্তির অসামান্য বিকাশ-কেন্দ্রিক যে নীতি এবং জীবনের উদ্দেশ্য আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রথিত করেছে তা পূর্ণমাত্রায় প্রাচ্য সমাজ-মনের প্রধান ভাবালম্বন নয়। অথচ একটি সমগ্র সমাজকে

অগ্রসর করে নিতে হলে এমন একটা নীতি গ্রহণের প্রয়োজন, যার মূল-ভাব দেশের আপামর জনসাধারণের মনে দানা বেঁধে আছে। কেবল-মাত্র বিষয় ও তথ্য সমতার দ্বারা বিরাট জনসমাজের সমমানসিকতা দাঁড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, স্তরভেদ, শ্রেণীভেদ কোন সমাজ থেকেই সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। আর্থিক সমতা কিছুটা বজায় থাকলেও বুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা, শারীরিক ক্ষমতার ভেদাভেদ, পরিবারের দেশ-কালের প্রভাব-জনিত আচার-আচরণ ভেদ, বয়স অভিজ্ঞতার তারতম্য ভেদ অনিবার্য। তবে আর্থিক অবস্থায় অসাম্য পীড়াদায়ক না হলে, মানুষের বাস্তব প্রাত্যহিক-জীবনের চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মিটলে, সমাজ-মনে একটা স্থিতি-স্থাপকতা আসে। এই অবস্থায় সমাজ এগিয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় উপনীত হবারই একটি অন্যতম প্রধান উপায় জনশিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের একটি আদর্শ তুলে ধরা ও সম্ভাব্য পথ-নির্দেশ। সেই আদর্শ বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের অনুসারী প্রচার ধর্মী হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং মানব-জীবন আদর্শের প্রেরণা সোচ্চার হলে অধিক লাভ। সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক গতি আগামী ২০।২৫ বৎসরে কোন্ দিকে মোড় নেবে, সম্ভাব্য-প্রবণতা কোন্ দিকে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের বহুযুগ-প্রসারিত ঐতিহ্যের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে শিক্ষণীয় একটি আদর্শ সর্বভারতীয় শিক্ষা-নীতিরূপে গ্রহণযোগ্য।

ধর্মভাব সমাজ-মনের একটা দৃঢ় শক্তি। এমন মনে করবার কারণ দেখি না যে, ধর্মের শিক্ষা দিলেই চৈতন্যের অবসান ঘটবে, বিচার বুদ্ধি ঘুচে যাবে এবং পুঞ্জীভূত হয়ে উঠবে কুসংস্কার। বরং উপযুক্তভাবে শিক্ষার গুণে মানব-চৈতন্য বিকশিত হবারই সম্ভাবনা। মানবীয় সদ্-গুণগুলি স্ফুরণেরই সম্ভাবনা। একদিকে মনের বিশ্বাস, ভাব, আবেগ, সংহত সংযত হয়ে শুভ ও কল্যাণের পথে এগিয়ে দেয়, দুঃখ-বেদনা-পীড়া-বিরোধ সহ্যের ক্ষমতা দেয়, আর-একদিকে পারস্পরিক মিলনের সূত্ররূপে কাজ করে। বন্ধন, বিশ্বাস, সহনশীলতা ও সংযম এ-সবের সমন্বয়ে মানব-চৈতন্যের ধীর ক্রমবিকাশ ঘটারই সম্ভাবনা অধিক।

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, এ-কথার যাথার্থ্য বিচার করা কঠিন। লোভেও

স্বভাব যায়, নির্বাধ স্বাধীনতার ফলেও। জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলি। একদিকে অর্থ, যন্ত্রশিল্প, প্রযুক্তি-বিদ্যা, বিজ্ঞানের চরম উন্নতি মানুষের ব্যবহারিক-জীবনে চূড়ান্ত সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে, আর-একদিকে ধরিয়েছে ভাঙন ব্যক্তি-জীবনে, পরিবারে, সমাজে। ব্যবহারিক শৃঙ্খলা-বদ্ধতা আইনকানুন সমৃদ্ধি আন্তর্জীবনের বিশৃঙ্খলা, উন্মার্গগামী অসংযমী-বিকার, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, শক্তি শৌর্যের দম্ভ, অপহরণ, অপরাধ-প্রবৃত্তি পদে-পদে সমাজকে পর্যুদস্ত করে চলেছে। আমরা কোন্ পথে যাব? বিরাট একটি জনসমাজের নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘোরতর দারিদ্র্য মেনে নিয়েও আমরা কি ঐ পাশ্চাত্ত্য যুক্তি ও বাহ্যিক সমৃদ্ধির আপাত মনোরম দৃশ্যে বিহ্বল হয়ে তাদের পথই অনুসরণ করব নির্বিচারে? অথবা পাশ্চাত্ত্য সমাজের অন্তর্দাহন ও হাহাকার আমাদের ভুল পথে পা বাড়াতে বাধা দেবে, হুঁশিয়ার করবে?

মানব-সভ্যতার রাজপথে একসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যে মানে সমৃদ্ধি লাভের চেষ্টায় যদি আমরা কাল গুনি বিফল হতে হবে। আমাদের পরিস্থিতি বিপরীত, সমস্যা একধরনের নয়, মন অন্যরকম। পাশ্চাত্ত্য সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধির পশ্চাতে ঔপনিবেশিক প্রতিপত্তির ইতিহাস আছে, আছে ধনসম্পদ লুণ্ঠনের ইতিহাস। ইদানীং বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ছলে গোপন ধ্বংসের বীজ রোপণের ইতিহাস আছে। তারা শোষণ ও স্বার্থসাধনে সিদ্ধহস্ত। সেই শোষণ শাণিত বুদ্ধি ও শাঠ্যের অভাব প্রাচ্য-সমাজে অতীতে প্রচুর প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে পদে-পদে।

আমরা সমন্বয়ের পথ খুঁজেছি। আমরা চেয়েছি সামঞ্জস্য। আমরা বিশ্বাস করেছি। চরম বিত্তভোগ, বাস্তব-জগতের সর্বপ্রকার সম্পদ-ভোগ, দেহভোগের লালসা, ব্যক্তি-ইচ্ছাপূরণের বাধাহীন স্বাধীনতা আমাদের চরম প্রাপ্তি পরম আদর্শ নয়। আমাদের কাছে দাবী বড় নয়, অধিকার-ভেদ ও বিশ্বাস বড়। এই মনোভাবের যে-সমাজ, সে-সমাজে সাধারণ মানুষ যুক্তি-বুদ্ধি-বিচার ও সংঘর্ষের পথে দৈনন্দিন জীবনের সর্ব অবস্থায় সার্থক হতে পারে না। আমরা মানিয়ে নিতে পারি, কিন্তু প্রতি পদে দ্বন্দ্ব ও বিরোধে নিজেকে জাহির করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে স্বপ্রতিষ্ঠা করতে পারি না। কেননা, শ্রদ্ধা দান করতেই সমাজ আমাদের শিক্ষা দেয়, আত্মগরিমা প্রচার করতে শেখায় না। আমার যথাবিহিত

প্রাপ্যে সন্তুষ্ট থাকতেই শিখি, প্রয়োজন সুতরাং জবরদস্তি বা দাবী আদায় বড় করে দেখানো হয় না। আমার জীবন ভোগ করতে হবে এমন কথা না বলে বলা হয় বহুজনের হিতাকাঙ্ক্ষায় সেবায় পরিচর্যায় জীবন উৎসর্গ করাই মানব-জীবনের চরিতার্থতা, অধিকন্তু সর্বাবস্থায় পরম মঙ্গলময়ের ধ্যান-ধারণা অন্তরে জাগরূক রাখাই জীবনের উদ্দেশ্য। এই সকল শিক্ষা যে সমাজ-মনের মৌল উপাদান, সে-সমাজ ধর্ম ন্যায়-নীতির শাসন, ক্ষমা-দয়া-করুণা ও কর্তব্যের বন্ধনে যতটা সার্থক রূপ পায়, ক্ষমা দয়া করুণা কর্তব্য নিরপেক্ষ যুক্তি বুদ্ধি. বিচার, দাবী তুলনা, মনোনয়ন এসবের যথার্থ মর্ম বোঝে না। ব্যক্তির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা চরম বিকাশ ভিন্নভাবে অর্থবহ।

সাধারণের মানসিক বনিয়াদ আর অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা যেন পরস্পরের উপযুক্ত নয়। স্ব-ভাব ও আদর্শের বিপরীত মনোভাব ও বিধি-ব্যবস্থা অনুধাবন অনুকরণ সময়সাপেক্ষ। রাজনৈতিক দলের তৎপরতা সত্ত্বেও স্বভাববিরোধী আদর্শ ও কার্য-কলাপের প্রেরণা হিংসা-বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধ যেভাবে ক্রমবর্ধমান হতে থাকবে, সংহতি, সমন্বয় শান্তি ততই পশ্চাৎপদ হবে।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুরূপ ফাঁদ, অনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিবাদ, ব্যক্তিপ্রচেষ্টা, ব্যক্তি-মালিকানা, মুনাফা, প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব, অর্থের আনুকূল্যে সুখ-সম্পদ আরত্ত করা, পাশ্চাত্ত্য জীবনের সমৃদ্ধ ছবি, পত্রপত্রিকা, দূরদর্শন, আকাশবাণী, পুস্তক প্রচার-ব্যবস্থা, সাহিত্য-নাটক, সিনেমা সব-কিছু সেই আদর্শ অনুসরণকারী যখন, সর্বোপরি শিক্ষা-ব্যবস্থায় সেই আদর্শ প্রতিনিয়ত প্রতিষ্ঠিত করার ফলে ক্রমে আমরা পাশ্চাত্ত্য সমাজের মানুষের মতোই আত্মকেন্দ্রিক, বিচ্ছিন্নতাকামী, প্রতিযোগী-পরায়ণ, ধনলুব্ধ, অভিসন্ধি-পরায়ণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই শ্রেষ্ঠ ও জীবনের উদ্দেশ্য ভোগ এই মতেই বিশ্বাস স্থাপন করে প্রাচ্যের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলব। দল ও গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধিই বড় হয়ে উঠবে। হিংসা ও হিংসাত্মক কার্যকলাপই হবে মুখ্য। সমন্বয়, সামঞ্জস্য, আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে।

অপরপক্ষে যদি আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হই, সুস্থির জীবনের স্বপ্ন দেখি, সমগ্র দেশের জনসমাজে সমমানসিকতা গঠনে উদ্যোগী হতে পারি, একটি সর্বভারতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা যাতে কার্যকরী

হয়। জনশিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা ধর্মশিক্ষাই সমাজকে সুস্থির জীবনের আশ্বাস দিতে পারে। ঔদার্য, বিশ্বাস, সরল জীবনযাপন, পরমত-সহিষ্ণুতা, স্বল্পে সন্তোষ, সহানুভূতি, সহৃদয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বৃদ্ধি করে, দুষ্প্রবৃত্তি সংযত করে। দুষ্কৃতি দমনের পুলিশি-ব্যবস্থা সব দেশেই আছে কিন্তু দুষ্প্রবৃত্তি সংযমনের শিক্ষা যদি না থাকে, ব্যবহারিক জীবনে দৃষ্টান্ত যদি স্থাপিত না হয়, শাসন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কঠিন শাস্তি, কারাগার মানুষকে নিবৃত্ত করে না অপরাধ থেকে। শিক্ষা ও পরিবেশ পরিশীলিত করে মানুষের মন এবং তা প্রকাশ পায় ব্যবহারে আচার-আচরণে, কার্যে। কঠোর দমন নীতির চেয়েও কার্যকরী উপযুক্ত শিক্ষা ও জীবনদৃষ্টির উন্মেষ ঘটানো ব্যক্তির মনে। তারই সমবেত আয়োজনে প্রয়োজন ধর্মের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত স্থাপন।

এখন প্রশ্ন এসে পড়ে কোন্ বিশেষ ধর্মের শিক্ষা প্রাধান্য পাবে? উত্তর সহজ। যে-ধর্ম বিশ্বজনীন। যে-ধর্ম মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা দেয়। যে-ধর্ম জগৎ ও জীবনের পারস্পরিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যায় ব্যক্তির স্থান নির্দেশ করে। যে-ধর্ম অহংবোধ, অহমিকা, দম্ভ, বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলে না। যে-ধর্ম অপরকে আঘাত করতে শত্রু বলে মনে করতে শেখায় না। যে-ধর্ম হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে রোধ করতে শেখায়। যে-ধর্ম সংযম, সংহতি ও শীলতা শিক্ষা দেয়। যে-ধর্ম সর্বমানবের মঙ্গল ও কল্যাণের দ্যোতনা করে, শুভ ও শান্তির পথ দেখায়, শুধু গোষ্ঠীস্বার্থে সীমাবদ্ধ নয়। যে-ধর্ম ভোগ ও দাবীকেই সোচ্চার করে না। যে-ধর্ম শিক্ষা দেয় অর্থ ও পুঞ্জীভূত বিত্ত শুধু আমার ভোগে লাগাই প্রাপ্তির পরম পরাকাষ্ঠা নয়। যে-ধর্ম শিক্ষা দেয় উপার্জনের উপায় ও ব্যক্তি-জীবনে সৎ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে-ধর্ম শিক্ষা দেয় সেবাই সমৃদ্ধি, পর-হিতই পরম বৃত্তি। যে-ধর্ম সৎ ও অসতের পার্থক্য বুঝতে শেখায়। যে-ধর্ম জাগতিক ও পারমার্থিক সংকেত ব্যাখ্যা করে। যে-ধর্ম ব্যক্তিকে বিচারের বুদ্ধি যোগায়। যে-ধর্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে।

বোধ বুদ্ধির, সচেতনতা ও চৈতন্যের বিকাশে ধর্মশিক্ষার মার্জনা একান্ত আবশ্যক। মন্দির-মসজিদ-গীর্জা-বিহার-গুরুদ্বার সমাজে আবহমান-কাল ধরে সামাজিকের মনে ভাবের বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। সে-প্রভাব এক এক ধর্মাবলম্বীর মিলনের সেতু।

কিন্তু ভারতরাষ্ট্রের বৃহৎ সমাজে মিলনের সূত্রটি রাষ্ট্রপ্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়ত্তাধীন। মাধ্যম বিভিন্ন, —যথা পুস্তক পত্রপত্রিকা, দূর-দর্শন, আকাশবাণী, বিদ্যালয়, অপরাপর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সভা-সমিতি, উৎসব, শিল্প-সংস্কৃতি ইত্যাদি।

পাপবোধ জাগানোর চেষ্টা বা দণ্ডমুণ্ডের কর্তৃস্থানীয় শাসন-সংস্থা বা দল বিশেষের ভয় দেখানোর চেষ্টা থেকেও মানব-জীবনের উদ্দেশ্য আদর্শ ও সমাজ-জীবনের ব্যক্তির দায়-দায়িত্ববোধ, ধর্মশিক্ষার ফলে সাধারণ মানুষের মনে ব্যাপকভাবে জাগানো সহজ। ধর্মশিক্ষাই সরলভাবে ব্যক্তির মনে প্রতীতির জন্ম দেয়, দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ সংঘাত সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মদগর্ব-স্ফীত অহংকার, বিত্তলোভ নির্বাধ প্রবৃত্তির দাবদাহ মানবজীবনে একমাত্র আরাধ্য নয়।

সর্বতোভাবে সর্বশ্রেণীর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষা প্রদান ও প্রসারের সর্বভারতীয় নীতি থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে ৮০ ভাগ মানুষ এখনো কী নগরে, কী গ্রামাঞ্চলে উন্নত জীবন-মানের কোন সুযোগ সুবিধা ভোগ করে না, যারা বঞ্চিত ক্ষুধিত দুঃস্থ, যারা আধুনিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের আজও অংশীদার নয় তাদের জীবন-মানের উন্নয়নের প্রচেষ্টা পরিকল্পনা সফল করে তুলবার উদ্দেশ্যেই প্রাচ্য সমাজকে স্ব-ভাবে নিষ্ঠ থাকতে হবে। অনুকরণ, অনুসরণ অনুরূপ ফাঁদ বারে বারেই আমাদের বিক্ষুব্ধ সংকল্পবিচ্যুত ও পরাজিত করবে। আমরা মূল অবলম্বন হারিয়ে, প্রাচ্যের ঐতিহ্য হারিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে সেক্ষেত্রে গ্লানির কলঙ্ক-কালিমা ললাটে লেপন করব।

শিক্ষানীতি লোকসংগ্রহ ও সফল সংস্কার

আধুনিক যুগের আত্মসর্বস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, স্বপ্রাধান্য, অহমবোধ ও ঔদ্ধত্যের মূলে ব্যক্তিবাদী শিক্ষা, একথা অস্বীকার করা যায় না। সে-শিক্ষার আদর্শ যন্ত্রসভ্যতা তথা মানবশক্তির কৃতিত্বজাত। সে-শিক্ষায় মানুষের অস্থিরচিত্ততা ও সকাম বুদ্ধি প্রবল হয়। বাস্তব-জীবনের উপযোগী শিক্ষা নিতান্ত যৌক্তিক একথা সত্য, কিন্তু গভীর অর্থে মানসিক উদ্বোধন বা চৈতন্যের পূর্ণতা ও মুক্তির ভাব-বিচ্যুত হওয়ায় এই শিক্ষা ব্যক্তির উগ্রস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বেচ্ছাবাদ ও খণ্ডিতব্যক্তিত্বকে বড় করে তোলে, 'আমি' প্রাধান্য পায়, আপাতমনোরম বস্তুভোগ— ঐশ্বর্যের প্রতি নিদারুণ আসক্তি জন্মায়। ফলত ব্যক্তির মানসিক ভারসাম্য টলে, সমাজে অধিকাংশের লুব্ধ গৃধ্নু মনোভাব এবং প্রকট আত্মরতি এক অদ্ভুত জটিলতা সৃষ্টি করে, ব্যক্তি ও সমষ্টির সংঘর্ষ, শ্রেণী বিশেষের সংঘর্ষ হয় অনিবার্য। সমাজে যারা পায় আর যারা পায় না তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় এক তীব্র বিদ্বেষ, একপক্ষের ঔদাসীন্য অবজ্ঞা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে-থাকা প্রাপ্ত সম্পদ সচ্ছলতাটুকু আর একপক্ষের সেই অবস্থাটুকু লাভ করবার মরিয়া প্রয়াস। উন্নত, অনুন্নত, ধনী, দরিদ্র, সব সমাজেই একই ঘটনার লঘু-গুরু রূপ।

কয়েক দশকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এশিয়া-আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন সমাজের অবস্থা দেখে এবং ধনী পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলি দেখে মনে হয় টেকনোলজির অগ্রগতির ফলে মানুষের কায়িকশ্রমের লাঘব অল্পবিস্তর হলেও সমাজের ভারসাম্য হারিয়ে গিয়েছে। ধনী দেশগুলির খনিজ-সম্পদের প্রাচুর্য, উন্নত কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, পরিমিত লোকসংখ্যা ও সুষ্ঠু বিধিব্যবস্থার দরুন নিম্নস্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মান গরীব দেশ-গুলির তুলনায় উন্নত। গরীব দেশগুলির আর্থিকভাবে সচ্ছল শিক্ষিত উচ্চস্তরের মানুষদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা পাশ্চাত্ত্য দেশের মানুষের মতো, কারণ তারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আদর্শপুষ্ট। শিক্ষিত মানুষদের অধিকাংশের

সঙ্গে গরীব সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের মানসিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন-প্রায়। সামাজিক-মন দ্বিধা-বিভক্ত।

যদিও কোন চূড়ান্ত রায় পাওয়া অসম্ভব তবু মনে হয় আজকের সমাজ-পরিস্থিতিতে দুটো পথ খুবই স্পষ্ট : হয় মুষ্টিমেয়ের শক্তি প্রয়োগ, জবরদস্তি, হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমন, না হয় অধিকাংশের মত গ্রহণ। ভারতবর্ষের সমাজে এখনো পর্যন্ত শেষোক্ত পথটি ধার্য আছে। আমরা শান্তি চাই, বিচার চাই, আইনের চোখে সমান থাকতে চাই, মুষ্টিমেয়ের নির্বিচার বলপ্রয়োগের বিরোধী আমরা, ব্যক্তির সর্বপ্রকার স্বাধীনতা ও অধিকার বজায় রাখতে চাই। আবার উন্নত দেশের মতো আর্থিক সমৃদ্ধি, যান্ত্রিক অগ্রগতি আমাদের কাম্য।

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশকের বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি সমাজে পরস্পরবিরোধী বহুশক্তি এমন ক্রিয়াশীল যে আমাদের কাম্য-উদ্দিষ্ট কোন লক্ষ্যেই আশানুরূপ সফলতায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় আনুষঙ্গিক বিষয়ের বিফলতার কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সমাজের চারিত্র উপাদানে কী রাসায়নিক সংমিশ্রণ ঘনীভূত আছে তাও নতুন করে জানবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। স্বতই আমাদের মনে শঙ্কা জাগছে সমগ্র সমাজের মানসিক প্রস্তুতিহীন অবস্থাই আমাদের আর্থিক-সামাজিক-অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বহু সমস্যাকে গুরুতরভাবে জটিল করে তুলেছে। আজ প্রায় শতাব্দীর অধিককাল ধরে যে-শিক্ষা-ধারায় আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, যে-শিক্ষা আমাদের জীবনে বহু অসঙ্গতি দিয়েছে, সেই শিক্ষানীতির প্রতি আমরা সন্দিহান।

এটা ঠিকই যে সমসাময়িক উন্নত ধনিক-সমাজের বা সমাজতান্ত্রিক সমাজগুলির আর্থিক সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতা থেকে এইমুহূর্তে আমরা শিক্ষাগ্রহণে সক্ষম না হতে পারি, কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী এই কয়েক দশকের ক্রমঅবনতি, বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের যথেষ্ট শঙ্কার কারণ হয়েছে। ফলত দিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যেহেতু ভারত-বর্ষের মাটিতে গণতন্ত্রের আশ্বাস, সেইহেতু হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমনের পথ ছেড়ে গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থায় সমাজ-পরিবর্তন সুচিহ্নিত হওয়া প্রয়োজন। যেহেতু আমরা অস্তিবাদে বিশ্বাসী, সেইহেতু ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মদত দেবার পক্ষপাতী আদৌ নই, আগ্রাসী মনোভাবও আমাদের নয়, ষাট কোটি মানুষের এক অংশও কোন নব-আবিষ্কৃত বা

বিজিত ভূস্বর্গে স্থান পাবে না। তাই আমাদের কঠিন প্রশ্ন ধনিক-সমাজের ব্যক্তিবাদের উৎকট ধারণা আমাদের চারিত্রিক গঠন ও সামাজিক অর্থ-নৈতিক অবস্থার কতটা অনুকূল।

অনেকে মত প্রকাশ করেন ভারতীয় দর্শনে ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের একমুখী দৃষ্টির প্রভাবে ব্যক্তির বাস্তব প্রয়োজনের প্রতি শিথিল মনো-ভাবের সৃষ্টি হয়েছে, পরোক্ষভাবে নিরুদ্যম প্রশ্রয় পেয়েছে এবং ভারতীয় চরিত্রে সমাজের ব্যাপক উন্নয়নের চিন্তাটা দানা বাঁধে নি। মানুষের বাস্তব সমস্যা সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন একথা সত্য, কিন্তু দেহজ বা কায়িক-জীবনের প্রয়োজনই মুখ্য, আত্মোপলব্ধি গৌণ, এই দৃষ্টিভঙ্গি খণ্ডিত ব্যক্তিত্ববোধ জাগায়, মানুষের অখণ্ড পূর্ণতা ও পরিণতির পরিপন্থী বলে বোধহয়। উপরন্তু এই খণ্ডিত ব্যক্তিত্ববোধই বাস্তব অর্থে আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধি জাগায়। তাই আমাদের বিশ্বাস একটি সমন্বয়ী আদর্শ আমাদের পক্ষে অধিকতর ফলপ্রসূ। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত পার্থক্য সমধিক। পাশ্চাত্ত্য-জীবনের সততসংগ্রামী অসহিষ্ণু ব্যক্তি-অধিকারের দৃপ্তভাব মুগ্ধকর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মানব-সমাজের আদর্শ তা হতে পারে না, এবং যদি হয় তার অনিবার্য পরিণাম হিংসা-প্রতিহিংসা, দমন-প্রতিদমন, ভোগ ও দখলের ঐকান্তিক লালসা। ব্যক্তিভেদে গুণগত তারতম্যের ফলে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ভোগ-দখলের, অধিকার অর্জন করে সুযোগ-সুবিধা করায়ত্ত রাখতে চায়, কিন্তু শক্তিমান, বুদ্ধিমান সুযোগ সুবিধার অধিকারীর দায়িত্বজ্ঞান লঘুতায় সমাজের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

মূলত গ্রামীণ-সভ্যতার পরিসরে নিরুপদ্রব কৃষিনির্ভর প্রাচীন সমাজের শান্তিময় জীবনের ইতিহাস হিন্দু ভারতবর্ষের। কয়েক শতাব্দীর মুসলমানী ও ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব, শিক্ষার প্রভাব সত্ত্বেও কৃষি-নির্ভরতা ধর্ম ও দর্শনের গভীর রাসায়নিক ক্রিয়া আমাদের বৃহৎ সমাজে স্থির আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের বাস গ্রামে। শহরবাসী ভারতীয় পাশ্চাত্ত্য অর্থে নাগরিক মনোভাবসম্পন্ন খুব অল্পসংখ্যক। সুতরাং এই বৃহৎ জনসমাজের পক্ষে গণতান্ত্রিক আশ্বাস তখনই কল্যাণকর যখন সনাতন জীবন-আদর্শ উচ্চ ও নীচ স্তর নির্বিশেষে সমভাবে ব্যাপৃত। যুগধর্ম ও সনাতনধর্ম তথা জীবননীতির সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব যদি গণতান্ত্রিক সরকার এই সমন্বয়ী আদর্শ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক

শিক্ষার নীতি পরিবর্তনের দ্বারা সেই আদর্শ জনজীবনে দৃঢ়মূল করে তোলার চেষ্টা হয়। কারণ আজকের সমাজ আজকের জীবন এমন জটিল ও বিস্তৃত যে সমাজের অনুকূল আদর্শ ধ্যান-ধারণা শুধু পরিবার বা গোষ্ঠির দ্বারা পরবর্তী প্রজন্মে ব্যাপকভাবে সমভাবে সর্বস্তরে সর্বরাজ্যে অর্থাৎ সমগ্র দেশের ভৌগোলিক পরিধিতে সঞ্চারিত হতে পারে না, পৌর-শাসন কেন্দ্রীয় শাসনের মতো কেন্দ্রশক্তির আনুকূল্যের প্রয়োজন।

বহু শতাব্দী কালের ইতিহাসে দেখা যাবে বড়-কিছু করবার দায়িত্ব অল্পসংখ্যক উচ্চস্তরের মানুষের উপরে ন্যস্ত ছিলো। বৃহত্তর সামাজিক-বোধ, দৃষ্টির প্রসারতা, সংগঠনের শক্তি, সুষ্ঠু পরিচালনা, সামঞ্জস্যের বোধ, বুদ্ধির চর্চা সর্বস্তরে তেমনভাবে হয় নি। সুতরাং স্বাধীনতা-পরবর্তী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় জনসমাজ বিশৃঙ্খল দুর্নীতিগ্রস্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে এ তো স্বতঃসিদ্ধ। রাষ্ট্রনেতাদের ব্যক্তি-রেষারেষি, তামসিকতা, প্রাদেশিকতা রাজনীতির নিদান হবে, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ অধিকাংশ নেতা, দলপতি, জনগণের সমর্থনে নির্বাচিত, যাদের হয়তো চারিত্রিক বনিয়াদ, পারিবারিক বনিয়াদ, সমাজিক বনিয়াদের কোন দীর্ঘ ঐতিহ্য নেই। তারা প্রলুব্ধ হবে, জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করবে, এ আর বেশি কথা কী! তাই দেখা যায় যুগে যুগে বহু মনীষী সমাজশিক্ষার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, সমাজ-মন প্রস্তুত না হলে আদর্শ গ্রহণ ও ব্যাপকভাবে বাস্তব, জীবনে অনুশীলন হয় না। আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করি যে সামাজিক মৌল পরিবর্তনে ব্যক্তি-প্রচেষ্টা একালে সফল হতে পারে না, রাষ্ট্রের সুনিয়ন্ত্রিত বিধিনিষেধ ব্যবস্থা প্রয়োজন। সার্বিক সাম্য কোন সমাজে আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং সেটা সম্ভবও নয়। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পৃথক— সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক গুণের প্রাধান্য। মানুষের বুদ্ধি, কর্মশক্তি একরকম নয়। এই গুণগত পার্থক্য মানুষের আচারে, ব্যবহারে, রুচিতে, আহারে-বিহারে, লক্ষ্যগোচর হয়। সমষ্টিগতভাবে যে-শ্রেণীতে, সমাজে, দেশে অধিকাংশের মধ্যে একটি গুণের আধিক্য দেখি আমরা, সেই জাতি, সেই শ্রেণী, সেই সমাজকে সেই গুণে চিহ্নিত করি। এইরকমই আমাদের বিচারের পদ্ধতি। কিন্তু বিবিধ গুণের সংমিশ্রণ কি নেই? ব্যক্তি-মানুষে বিবিধগুণের সংমিশ্রণ আছে, তথাপি দেখা যায় কোন একটি গুণের আধিক্যে ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্ব। তেমনি বিশেষ গুণের বিকাশে, বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে,

বিশেষ জীবনযাত্রার ছাঁদে, বিশেষ মূল্যবোধে, অর্থনৈতিক বিন্যাসে, রাষ্ট্রিক বিধিব্যবস্থায় একটি জাতি তথা সমাজের স্বাতন্ত্র্য।

এই স্বাতন্ত্র্যই কুলধর্ম, বর্ণধর্ম নামে চিহ্নিত আমাদের সমাজে। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভাবে ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে আমরা এখন আর ঠিক পরিবার সীমায়িত, কুল বা জাতিতে সীমায়িত বিদ্যা-জ্ঞানে তৃপ্ত থাকতে পারি না, কুলকর্মও গ্রহণ করি না। তথাপি ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। শিশু যে-পরিবারে জন্মায় সেই পরিবারের শিক্ষাদীক্ষা, আচার-ব্যবহার রীতি, জীবনযাত্রার মানে সে লালিতপালিত হয়, সুতরাং তার জাবনের এক অধ্যায় বিশেষ প্রভাবপুষ্ট। কিন্তু আধুনিক সভ্য সমাজে সর্বত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বিদ্যমান, শুধু বংশগত শিক্ষা-সংস্কৃতি নয়, সমগ্র সমাজের, পৃথিবীর মানুষের চিন্তা-চেতনা, অতীত-বর্তমানের ধ্যান-ধারণা, সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত সুষ্ঠু প্রণালীতে সংহতভাবে যুক্তিসিদ্ধ প্রথায় সমাজের সংস্তরে ব্যাপৃত। ফলে ব্যক্তির মানসিক প্রসার ঘটে. বহু ধরনের প্রস্তাব অনিবার্য-ভাবেই ব্যক্তিজীবনে পড়ে জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। বিশেষত শাহরিক জীবনে।

এ-অবস্থা গ্রামের মানুষের জীবনে প্রত্যক্ষভাবে আসে না, পরোক্ষ ভাবে অর্থনীতি-রাজনীতির চাপে এসে পড়ে। অধিকাংশ গ্রামেই আধুনিক জীবনের উপযোগী ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থার অভাব। অনুন্নত দেশের গ্রামে ঠিক এইকারণেই শিক্ষিতের (পাশ্চাত্ত্য ধরনের শিক্ষায় শিক্ষিত) সংখ্যা খুব কম। কেননা শিক্ষিত মাত্রেরই দৃষ্টি শহরের দিকে। শহরেই শিক্ষিতের কর্মসংস্থান। যন্ত্র, কারখানা, শ্রমিক, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক সংযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, সর্বপ্রকার টেকনোলজির সুযোগ সুবিধা নগর-সভ্যতার অনুষঙ্গ। কাজেই, নগর, উপনগর, শিল্পনগর কেন্দ্র করেই আধুনিক শিক্ষিত, উচ্চশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিতের বাস। কিন্তু গ্রাম ও নগর যে পরস্পরের পরিপূরক এইধারণা অনুন্নত দেশগুলিতে স্পষ্ট নয়। আবার উচ্চশিক্ষিত, বিত্তবান সম্প্রদায় শহরেও অতৃপ্ত, কারণ অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় ধনী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে আধুনিক জীবনের উপকরণ আরও উন্নত। এই নানা ধরনের প্রবণতা ও বিচিত্র ধরনের অসঙ্গতির অন্যতম একটি কারণ পাশ্চাত্ত্য সমাজে গতাগতির সুযোগ, পাশ্চাত্ত্য সমাজের

খবরাখবর ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যক্তি-আদর্শের ধারণা। প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে ব্যক্তি-জীবনে ও বৃহত্তর সমাজ-জীবনে স্বতোবিরোধের জটিলতার মূল এইখানে বলেই আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

যদি মানব-অধিকারের দাবী আমরা নির্বিচারে গ্রহণ করি, ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতা যদি স্বীকার করি, তাহলে ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে কোন দায়-দায়িত্ব কর্তব্যের বাধা সৃষ্টি করা চলে না। আমার উচ্চাশা আছে, গচ্ছিত ধন আছে, ধনসঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে, কর্মশক্তি আছে, বুদ্ধি আছে, কেনই বা আমি সেই বুদ্ধি কর্মশক্তি ধন-শক্তির বলে উন্নত জীবনযাত্রার মানে বাস করব না? পাশ্চাত্ত্য সমাজের প্রতি লুব্ধতা যদি থাকে তাতেই বা দোষ কি? প্রশ্ন হ'ল এই একান্ত আত্মস্বার্থকাম কত দূর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য? সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রমাত্রেই নিরীক্ষণ করছেন সারা পৃথিবীর সমাজে এই প্রশ্নের জটিলতা— কোথাও কম, কোথাও বেশি।

দরিদ্র, অন্ত্যজ, অশিক্ষিত, বঞ্চিত জনসমাজের উন্নতি যদি আমাদের উপজীব্য হয়, গ্রামজীবনকে যদি সমাজের ভিত্তি বলে মনে করা যায় তাহলে আমরা দেখব অন্যান্য দরিদ্র দেশগুলির মতোই ভারতবর্ষে শহর ও গ্রামে, উচ্চ ও দরিদ্র শ্রেণীতে দুস্তর ব্যবধান। ব্যবধান পথের দূরত্বে নয়। যথাক্রমে জীবনযাত্রায়, অর্থ বৈষম্য সুযোগসুবিধা লাভে, পৌরবিধি-ব্যবস্থায়— সর্বোপরি মানসিকতায়। এই আলোচনার উদ্দেশ্য সেই সঞ্জীবনী আবিষ্কারের চেষ্টা যে-সঞ্জীবনী সঞ্চারে সমাজে উচ্চ-নীচ সর্বস্তরে, শহর-গ্রামভেদ নির্বিশেষে মানসিক সমঝোতা গড়ে উঠতে পারে। অশিক্ষিত দরিদ্র চাষী, অশিক্ষিত দরিদ্র জাতি-ব্যবসায়ী (কামার, কুমোর, নাপিত, গোয়ালা, প্রভৃতি) ভূমিহীন দরিদ্র কিষাণ, মজুর (অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ধর্মাবলম্বী); অস্পৃশ্য (চামার, ডুলে, বাগ্দী প্রভৃতি) এবং অল্প-শিক্ষিত অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন চাষী-গৃহস্থ (হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান) —ভারতবর্ষের অধিকাংশ গ্রামের জনজীবন অল্পবিস্তর এইপ্রকার আর্থ-সামাজিক বনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষী-গৃহস্থের বা জাতিব্যবসায়ীদের ঘরের ছেলেরা কেউ কেউ শহরে রুটি-রোজগারে ব্যাপৃত। গ্রামের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ টাকা লেনদেনের যোগাযোগ মহাজন-জোতদার-ব্যবসায়ী শ্রেণীর, যারা জেলা-শহরে-গঞ্জে, বড় শহরে বাস করে। এ ছাড়াও শহরের সঙ্গে আর্থিক সংযোগ ব্যক্তির

ক্ষুদ্র ব্যবসায়-সূত্রে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে যাতায়াতের সুবিধার জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি সূত্রে, রাজনৈতিক কর্মীদের তৎপরতার সূত্রে। বড় গ্রামে স্কুল, বয়স্ক-শিক্ষার-ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি আছে তবে সর্বত্র নয়।

গ্রামের কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন এখনো মূলত একক ব্যক্তি বা পরিবার-প্রচেষ্টা-নির্ভর। বড়-বড় শহরগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়িক বুদ্ধি নিয়ে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়— বিশেষত দুগ্ধজাত খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন, সব্জি, শস্য-পণ্য সরবরাহ ইত্যাদি— তাতে আশে-পাশের গ্রামের মানুষ খেটে খেতে পারে কিন্তু আর্থিক সমৃদ্ধির অংশীদার হতে পারে না। এখন আমাদের উৎপাদন প্রচেষ্টায় বিশেষত কৃষিজাত উৎপাদন, খাদ্য-উৎপাদনে স্বনির্ভর একক প্রচেষ্টারই প্রাধান্য। যৌথ প্রচেষ্টা, যৌথ কারবার কম। আমাদের সমাজ-মন সেভাবে প্রস্তুত নয়। গণতান্ত্রিক সরকার সে-অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়িত্ববোধও করে না।

পরিস্থিতি পরিবর্তনের উপায়স্বরূপ একটি পথ বিশেষভাবে অবলম্বিত হওয়া সঙ্গত মনে হয়। সমাজ স্বার্থের প্রতিকূল বিশ্লিষ্ট খণ্ড ব্যক্তিবাদের শিক্ষা নিরোধ, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমাজ-মনে সংহতিবোধের উন্মেষ ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের বিকাশ। মানুষ তো আর সৃষ্টিছাড়া জীব নয়। মাতৃক্রোড়ে জন্ম, পরিবারে লালনপালন, সমাজে আমৃত্যু বাস। ব্যক্তি-জীবনে শুধু পরিবারের প্রতি কর্তব্য পালনই যথেষ্ট নয়, সমাজ তথা দেশের প্রতিও দায়িত্ব থাকে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই। এই বোধই মানুষের সামাজিক সত্তা। সামাজিক সত্তার উপলব্ধি সম্যকভাবে হওয়া সম্ভব নয় যদি সমাজ ব্যক্তিকে সেই কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হতে না শেখায়। যে-সমাজে জন্মাই, যে-দেশের ফলে জলে বর্ধিত হই, সুখ আহরণ করি, শিক্ষা পাই, সেই সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি ব্যক্তির জন্মসূত্রে দায়িত্ব বর্তায়। শাস্ত্রে বলে ঋষিযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও দেবযজ্ঞ— এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের নিত্য অনুষ্ঠেয়। তেমনি দেবঋণ, মাতৃ-পিতৃঋণ, অবশ্য পরিশোধনীয়। আমাদের কর্মশক্তি বুদ্ধি-শ্রম দিয়ে প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় সেই ঋণ পরিশোধ করি চেতনে-অবচেতনে। সমাজশিক্ষা সেই ঋণবোধ এবং পরিশোধ্য কৃত্য সম্বন্ধে সজাগ করে। ব্যাপক সামাজিক শিক্ষা, ধর্মশিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ধারায় অঙ্গীভূত না হওয়াতে সমাজ-মনে অসংহত বিশ্লিষ্ট আত্মস্বার্থবাদ ঘনীভূত হয়। উচ্চস্তরে, শিক্ষিত

অর্ধশিক্ষিতের মধ্যে, কর্মী দায়িত্বভার ন্যস্ত ব্যক্তিগণের অধিকাংশের এই অপরিসর দৃষ্টিভঙ্গিই আধুনিক কালে নানা পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগে এক স্বার্থসন্ধিৎসু দুর্নীতিপরায়ণতায় পর্যবসিত। এই মনোভাবের প্রাধান্যই সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবক্ষয়ের অস্থির দুর্লক্ষণ ঘনিয়ে উঠতে সহায়তা করে। সম্ভবত এই কারণেই আজ বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি বিদেশী ব্যক্তিরা অপসারিত হলেও তাদেরই শিক্ষাদীক্ষা পোষণায় পুষ্ট স্বদেশীয়েরা তস্করবৃত্তিতে কীর্তিমান ; ধ্বংস, লোভ, হিংসুক প্রবণতায় পারদর্শী। তাই বর্তমানে নিরতিশয় আর্থিক অসাম্য, তীব্র শিক্ষাভিমান ও অহমিকায় উপরতলার মানুষের নির্বিকার ঔদাসীন্যে নীচুতলার মানুষের নির্বুদ্ধিতায় সরকার শাসনযন্ত্র ও পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতন্ত্রের তামসিক অস্বচ্ছ দীর্ঘসূত্রী আত্মপরতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় সমগ্র দেশে অদ্ভুত শ্লথ, বিশৃঙ্খল, অর্থনীতিতে মার খাওয়া হতাশ দারিদ্র্য ভবিষ্যদ্‌হীন নিরুপায় অবস্থা যেন বিরাজমান।

এই দুঃখজনক পরিস্থিতি অর্থনীতি ও শিক্ষার সুপরিকল্পিত আদর্শহীন ব্যবস্থা, নির্দিষ্ট ভবিষ্যতের আশাহীন বিপুল জনজীবনের দিকে তাকিয়ে স্বতই মনে হয় আমাদের মতো দেশে ব্যক্তিবিকাশের চেয়েও সমষ্টি-উন্নয়নের প্রতিই অধিকতর মনঃসংযোগ আবশ্যক। জাগতিক ব্যবহারিক জীবনে সমগ্র সমাজে সুস্থতা সমতা থাকলে তবেই সামগ্রিকভাবে মানসিক পূর্ণবিকাশ সম্ভব। সুযোগ সুবিধা অর্থ ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের আয়ত্তে রাখার চেষ্টায় সমাজে তীব্র প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতে পারে কিন্তু ব্যাপক শান্তি সুস্থতা থাকে না। কাজেই আমাদের সমাজ-জীবনের পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা-আশ্বাস-প্রতিশ্রুতি কতকটা নিষ্ফল প্রহসনের নামান্তর হয়ে ওঠে। তাই বারংবার মনে হয় যে ধর্ম ও জীবনের শিক্ষার অস্তিত্ব ভারতবর্ষের জনমানসে ক্ষীণভাবে আছে তা উৎপাটনের চেয়ে সঞ্জীবনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ব্যক্তিবিদ্বেষ নয়, ব্যক্তিসংযোগ ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায় সমাজ সংহতিবোধের শিক্ষায় ব্যক্তি তথা সমাজ-মনে পরিমিতিবোধ জাগানোই সমস্যাদীর্ণ বৃহৎ বিপুল জনসমাজের বাস্তব উন্নয়নের অনুকূল।

আমাদের লুব্ধ মনোভাব, অর্থগৃধ্নুতা, দরিদ্র ও বঞ্চিতের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকট করে যে, সমাজমনে বিশ্লিষ্টতার ইন্ধনের যথেষ্ট যোগান আছে। আমাদের উগ্র প্রাদেশিকতা প্রমাণ করে যে, বৃহৎ ভারত-সমাজ-

বোধের কত অভাব। শহরকেন্দ্রিকতা নিত্যই প্রমাণ করে জীবনযাত্রায় আমরা আদৌ আধুনিকীকরণের বিপক্ষে নই। আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্র অর্থ এবং কাম। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ আধুনিক সমাজে, ভারত-সমাজের যে মূলমন্ত্র ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সে-মন্ত্র খণ্ডিত, উপেক্ষিত।

বলা বাহুল্য স্বল্পসংখ্যক আদর্শবাদীর নিরলস চেষ্টা সমাজে যুগ-যুগ ধরে চলছে, বিভিন্ন যুগে বহু মনীষীর জীবৎকালে সমাজের কোন কোন স্তরে কিছু সংখ্যকের জীবন প্রভাবিত হয়েছে। দরিদ্র পীড়িতের, বঞ্চিতের সেবায় দান-ধ্যান সমাজে বিদ্যমান। কিন্তু এ-যুগে কোন আদর্শ ব্যক্তি-প্রচেষ্টায় বাস্তবে ব্যাপকভাবে সমাজে দৃঢ়মূল হতে পারে না। কোন আদর্শকে ব্যাপক ও সম্যকভাবে কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা তখনি সার্থক হতে পারে, যখন তা রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এ-যুগে সমাজমানস পরিবর্তনের চাবিকাঠি।

প্রথমত, ধনী পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির আর্থিক বিন্যাস ও শিক্ষানীতির পাঠে বোঝা যায় যেসব দেশে খনিজসম্পদের অভাব, আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অপ্রসার, কৃষিযোগ্য ভূমির পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে কম, সেসব দেশে একদিকে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সফল করে তোলার চেষ্টা এবং মোটা ভাত-কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকার মতো মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টায় উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সমগ্র সমাজের মানসিক অবস্থা সৃষ্টিই হওয়া উচিত শিক্ষার মূল নীতি। একথা স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে ধনী রাষ্ট্রের মতো ব্যক্তির অনিয়ন্ত্রিত ধনস্ফীতি ও ধর্মবিযুক্ত শিক্ষানীতি উপরিউক্ত মানসিকতা ও আর্থিক অবস্থা সৃষ্টির আদৌ অনুকূল নয়।

দ্বিতীয়ত, ধনী রাষ্ট্রগুলি দেখে একথাও মনে হয় যে, শক্তি ও ধন-প্রমত্ত হয়ে মানুষ পরিমিতিবোধ হারায়। বস্তু, ঐশ্বর্য, ভোগ ব্যতীত জনজীবনে আর কোন লক্ষ্য যেন থাকে না।

তৃতীয়ত, ভয়, ভীতি, কঠোর দমননীতি, হিংসা মানুষকে দিশাহারা করে তোলে। আজ সব দেশের ভাবুক সমাজ, পরিমিতিবোধের শিক্ষাই আদর্শ বলে অনুভব করছেন। সে-আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি।

আমাদের দেশে লেখাপড়া শেখার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে পরীক্ষা পাস, চাকরী যোগাড় করা অথবা শহরকেন্দ্রিক একটি বিশেষ পেশা অবলম্বন,

সম্ভবস্থলে বিদেশগমন, ধনদৌলত লাভ। কোন সন্দেহ নেই জীবিকা-নির্বাহের জন্য আধুনিক যুগে বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তির চরিত্র গঠন, সামাজিক কর্তব্যবোধ, জাতীয়তার উদ্বোধন, ধর্মশিক্ষা, স্বাস্থ্যবিধির জ্ঞান, রাজনীতির সাধারণ জ্ঞান, এগুলিও শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ। এই শিক্ষার ভার আমাদের সমাজে থাকে পরিবার ও সমাজ-পরিবেশ-প্রতিবেশের উপর। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, তবে খেলাধূলা, সংগীত-নৃত্য, সাহিত্যপাঠ ইত্যাদির দ্বারা বিশেষ মানসিকতা গঠিত হয় সেকথা অবশ্যস্বীকার্য। বহু স্থানে ভালো ভালো শিক্ষাকেন্দ্র আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাকেন্দ্র, আর্য-সমাজের শিক্ষাকেন্দ্র, গান্ধী আদর্শে বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র, রবীন্দ্র-আদর্শে শান্তিনিকেতন, অরবিন্দ-আদর্শে পণ্ডিচেরী, এইপ্রকার বহু কেন্দ্র। তথাপি সরকার যদি সারা ভারতবর্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে সম-নীতি কার্যকরী না করে, তাহলে বৃহৎ জনসমাজে সম-মানসিকতা কদাচ গঠিত হতে পারে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়ত, যদি সমগ্র সমাজের অগ্রগতি ও ব্যবহারিক জীবনের উন্নতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হয় তবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থায় দরিদ্র-নিম্নশ্রেণীর জনসমাজকে উপেক্ষা করা চলে না। আমাদের মতো দেশে অর্থাৎ যেসব সমাজে আবশ্যিক প্রাথমিক-মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পনের-ষোল বছর বয়স পর্যন্ত বিদ্যালয়ে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই, সেসব দেশে দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ গ্রামবাসীর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার কোন বালাই নেই। গায়ে-গতরে খেটে জাতি বা কুলবৃত্তি পিতা-পিতামহের কাছে শিখে দিনাতিপাত করাই রীতি। খেটে খাওয়া মেঠো লোকেরা, দিন আনে দিন খায় যারা, তাদের পক্ষে ব্যয়সাধ্য, সময়-সাপেক্ষ শিক্ষাগ্রহণ সম্ভব নয় এবং তারা ইচ্ছুকও নয়, কারণ এই ধরনের শিক্ষার ফলে মন মেজাজ বদলে যাবার সম্ভাবনা থাকে, গ্রাম ছেড়ে জাতব্যবসা ছেড়ে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়।

জনশিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় (এক) ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির সহায়ক শিক্ষা, (দুই) ব্যক্তির মানসিক জীবনের উন্নতির সহায়ক শিক্ষা, তাহলে আমরা হয়তো একটা লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, লিখতে পড়তে জানা শিক্ষার লক্ষণ বটে কিন্তু লিখতে পড়তে জানলেই শিক্ষা হ'ল, এমন ধারণা ভ্রান্তিমূলক। আমাদের মতো সমাজে অন্তত যে উপেক্ষিত জনতার কথা উল্লেখ করেছি তাদের

পক্ষে, লিখতে পড়তে জানার চেয়েও জরুরী, সাধারণজ্ঞান। বাধ্যতামূলক স্বাস্থ্যবিধি, প্রাসঙ্গিক রাজনীতি-শাসনব্যবস্থা অর্থবিন্যাসের সাধারণজ্ঞান, ধর্ম ও সমাজগঠনমূলক ধারণা, সর্বোপরি একটি বৃত্তিশিক্ষায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আরোপ।

কোন নাস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে অস্তিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিই বাস্তবিক কল্যাণপ্রদ। প্রয়োগবিধিতে যে পার্থক্য থাক মনে রাখতে হবে ধনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলির চেয়ে বহু গুণ সফলতায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জনশক্তি তথা যুবশক্তির অপচয় সংহত করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু কোন দেশের কোন ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ নির্দোষ নয় এবং কোন দেশের বিশেষ আদর্শ, নীতি, পদ্ধতির পূর্ণমাত্রায় নকল চলে না। রাশিয়া, চীন, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা কোন দেশের আদর্শ, নীতি, পদ্ধতির হুবহু নকল যেমন সম্ভব নয় তেমনি মঙ্গলজনক নয় আমাদের সমাজের পক্ষে।

ধর্ম-আধ্যাত্মিকতা-ঈশ্বরে বিশ্বাস মুক্তি ও পরিমিতিবোধের যে-দিকটা মানবিকতাবোধের পরিপূরক বলে ভারতবর্ষের মানুষের ধারণা তারই প্রকার ও প্রকাশভেদ ধর্ম আচরণ অনুষ্ঠানে, সন্তোষ, সংযম সহাবস্থানের নীতিতে, এগুলি জীবন থেকে মুছে ফেলার যেমন আমরা পক্ষপাতী নই তেমনি শিক্ষানীতিতে প্রতিফলন না থাকাও জাতীয় জীবনের পক্ষে মঙ্গলকর নয় বলে ভাবিত। সুতরাং আমাদের মানসিক গঠন, সামাজিক বিন্যাস, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধর্মনৈতিক সহাবস্থান ও জাতীয় সংহতির উপযোগী শিক্ষাদর্শই আমাদের সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। আমাদের ধর্ম ও ন্যায়নীতির আদর্শের সঙ্গে গণতান্ত্রিক আদর্শ ও বাস্তব-জীবনের প্রতি একটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সমন্বয়ী আদর্শই ভারতীয় আধুনিক শিক্ষার মূলনীতি হওয়া যুক্তিযুক্ত। এ-যুগে জাতি-বিশেষের প্রাধান্য অবসিত, ভারতীয় সংবিধানের প্রতি নাগরিকের পূর্ণ সুযোগের অধিকার স্বীকৃত। আজও যে অন্তঃসলিলা ভারতীয় দর্শনের সঞ্জীবনী ভারতবর্ষের বিপুল জনসমাজকে বিনষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছে, সেই দর্শনের তথা জীবন-আদর্শের মূল সত্যগুলিকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা আধুনিক শিক্ষার একটি বিশেষ নীতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চ-নীচ শ্রেণীর, গ্রাম-শহর বিভেদ, বিভিন্ন জাতীয় বিদ্যালয়, রাজ্য, ভাষা নির্বিশেষে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকরী হওয়া অত্যাবশ্যক। সাধারণ

কয়েক পুরুষে যারা লেখাপড়া শিখেছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই ধারাবাহিক শিক্ষার দিকে ঝোঁকে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে শিক্ষিত বেকারের দারুণ সংখ্যাবৃদ্ধি। বিচ্ছিন্ন আন্দোলন, রাজনৈতিক উষ্মা প্রচলিত ধারাবাহিক শিক্ষার দিক পরিবর্তন সূচিত করে। মনে হয় বিষয়-শিক্ষা, বৃত্তিশিক্ষা পরীক্ষার পাঠ অভ্যাসের পাশাপাশি কতগুলি অবশ্য-পালনীয় আচরণীয় নীতি, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা-শিক্ষা অত্যাবশ্যক। যাতে চারিত্রিক বনিয়াদ দৃঢ় হয় ও সামাজিকবোধের উন্মেষ ঘটে। এতদ্-ব্যতীত সমধিক গুরুত্ব আরোপ প্রয়োজন অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধি প্রসারের সঙ্গে বিষয়-শিক্ষার সমতা রক্ষায়। বৃত্তিশিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়, শাসন, আইন, চিকিৎসা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের সঙ্গে সমতা না রেখে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে বেকার বৃদ্ধি, অসন্তোষ বৃদ্ধি, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি অনিবার্য।

সব সমাজেই ন্যায়, শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার মানুষের প্রতি মানুষের সৌহার্দ্য, আইনের চোখে সমদৃষ্টি কাম্য। কিন্তু এই আদর্শগুলি তখনই স্থায়ী হতে পারে যখন আপামর জনসাধারণ এ-সবের মর্ম বোঝে, এবং আপামর জনসাধারণের অধিকার বর্তায়। উৎসাহ, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস তখনই জাগা সম্ভব যখন জনসমাজে সন্তুষ্টি থাকে, সকলেরই মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান থাকে। আদর্শবাদ সুখী করে না যদি দেখি একজন ভোগ করে, আর একজন বঞ্চিত হয়। মনে হয় আত্মস্বার্থসিদ্ধির উগ্রতা, ধনসঞ্চয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে, বস্তু-ভোগের তীব্র আসক্তি প্রশমিত হতে পারে যদি দেশে সন্তানসন্ততির আর্থিক নিরাপত্তার আশ্বাস বিদ্যমান থাকে, পরিমিতিবোধ সমাজবোধ-জাতীয়তাবোধের দৃঢ়তা থাকে। সার্থক ধর্মনিরপেক্ষতাও তখনই সম্ভব যখন মানুষ বুঝতে শেখে অনুষ্ঠান সর্বস্বতা ও ছুৎমার্গের ঊর্ধ্বে মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন। যুক্তি, বিচার, তর্ক ছাড়াও মানুষের বহু ধরনের গোঁড়ামি কুসংস্কার, অবজ্ঞা, ঘৃণা. আবেগ অহমিকা প্রশমিত হতে পারে যদি ব্যক্তি-সমাজ-দেশ-বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান জন্মায়, মানব-জীবনের মূল্য-বোধ জাগে। লোভও সংবৃত হয় যদি লোভের উপকরণ বিলাস-বাহুল্যে নিয়ন্ত্রণ থাকে।

কাম্য সমাজ-মানসিকতা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সংযুক্তিকরণ বাঞ্ছনীয় বোধ হয় :

প্রথমত : আত্মসংযম শিক্ষা, আত্মজাগরণের প্রাথমিক সোপান কায়িক বাচিক ও মানসিক তপস্যা, অর্থাৎ নিয়ম অভ্যাস। পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও ব্যক্তি-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা। বাক্যে বা ব্যবহারে অপরকে আহত না করার শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত : সমাজবোধের শিক্ষা : পরিবারের প্রতি, সমাজের প্রতি, সমগ্রদেশের প্রতি কর্তব্যবোধ ও অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি। প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থের নিষ্প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা।

তৃতীয়ত : তামসিকতা দূরীকরণের শিক্ষা : ব্যক্তি, জগৎ ও জীবনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, যুক্তি ও শ্রদ্ধা-মিশ্রিত মনোভাবের উদ্বোধক শিক্ষা।

চতুর্থত : আত্মজাগরণের শিক্ষা : স্বকীয় শক্তির উপর আস্থা-স্থাপনের মনোভাব, নিজের কাজকে ভালোবাসতে শেখানো, জাত-ব্যবসায়ের উন্নতিমূলক প্রচেষ্টা।

পঞ্চমত : ন্যায়নীতি, সহনশীলতার শিক্ষা : বিভিন্ন ধর্মের মূলকথা শেখানো, ভালোমন্দ বোধের আপেক্ষিক ধারণা দেওয়া, বর্ণাশ্রম ও চতুরা-শ্রমের যুক্তিসিদ্ধ সহজ আলোচনা দ্বারা সামাজিক ও অর্থনীতিক বিন্যাসের শিক্ষা।

ষষ্ঠত : জাতীয়তাবোধের শিক্ষা : পৌরশাসন ও গণতান্ত্রিক আদর্শের সহজ আলোচনার দ্বারা জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মূল উৎপাটন।

উন্নত দেশ মাত্রেই ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় দেশের নাগরিককে সমাজ দেশ পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন করায়। এর ফলেই শিশু-কিশোর-যুবক মাত্রেই অক্ষর পরিচয়, বিষয়জ্ঞান, বৃত্তি-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক আর্থিক-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। বড় মানুষের ছেলেমেয়ের পাশাপাশি চাষী শ্রমিক খেটে-খাওয়া সাধারণ জ্ঞান তাদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত থাকে বলে বুদ্ধির প্রাখর্য দেখা যায়, পরিচ্ছন্ন হয়ে বাঁচতে শেখে। কায়িক-জীবনের উন্নতির চিন্তাই একান্ত ও চূড়ান্ত বলে গৃহীত, ধর্মমূলক, আধ্যাত্মিক চিন্তামূলক শিক্ষা প্রায় উৎখাত (বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া), তথাপি সব দেশের শিক্ষায় শিল্প, সংগীত, শরীরচর্চামূলক ব্যায়াম, নৃত্য, খেলাধূলা, ভ্রমণ, হাতেকলমে কাজ এবং জনসংযোগ বিশেষ স্থান অধিকার করে

আছে। সব সমাজেই উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তের, নিম্নবিত্তের মানুষের চিন্তা বুদ্ধি কর্মকুশলতা-পরিচালনা ও মেহনতি জনতার কায়িকশ্রমে সমাজ-চক্রের নিয়ত আবর্তন, যুগ্মশক্তিই সমাজের ভরসা। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সত্ত্বেও উন্নত দেশগুলিতে গরিবের জন্য, অপারগের জন্য, কায়িকশ্রমের জনতার জন্য সমগ্র সমাজের রাষ্ট্রের দায়-দায়িত্ব গ্রহণের চেষ্টা আছে, আশ্বাস কার্যকরী হয় সে-সব দেশে— এইভাবে কায়িক-জীবনযাত্রার মান রক্ষা করার চেষ্টা হয়। যদিও সে-সব রাষ্ট্রে বর্ণ বৈষম্য তীব্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দমনাত্মক কঠোরতা প্রয়োগ করে সর্বস্তরে বাস্তব কায়িক-জীবনের সমমান বজায় রাখার চেষ্টা চলছে।

ধনী পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও দেখা যায় কয়েক পুরুষে যারা লেখা-পড়া শিখেছে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাই সাধারণত লেখাপড়া কিছু দূর চালিয়ে যায়, তারা অ-কায়িক শ্রমের কাজের দিকে উৎসাহ পায়, বাদবাকি যারা বেশিদূর লেখাপড়া করার উৎসাহ পায় না, কায়িকশ্রমই তাদের জীবিকা-সংস্থানের উপায়। যে চাষী সেও আবশ্যিক শিক্ষা পায়, যে শ্রমিক সেও বাধ্যতামূলকভাবে সাধারণ শিক্ষার পাঠ নেয়। যেহেতু শ্রমিকের মজুরের আয় সর্বনিম্নহারের নিচে যায় না, কায়িকশ্রমের অ-কায়িক শ্রমের আর্থিক মানের তারতম্য অনুন্নত দেশের মতো হয় না, সেইহেতু সমাজে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের, ক্রয়ক্ষমতার একটা মোটামুটি সম-অবস্থা থাকে। উঁচুতলার মানুষরা এই অবস্থায় বহুকাল যাবৎ অভ্যস্ত বলেই অনুন্নত দেশের শিক্ষিত ও বিত্তশালীর ন্যায় ঔদাসীন্য পোষণ করে না বা দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়ায় না। অপরপক্ষও ন্যায়সঙ্গত অধিকারের দাবী করে। দেশের শিক্ষাই এই পারস্পরিক সমঝোতা সমাজে বজায় রাখে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আর্থিক সমতা বজায় রাখার যেমন চেষ্টা, তেমনি সুপরিকল্পিতভাবে সমাজ-প্রয়োজন বুঝে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। বিশেষ শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পাঁচ বা দশ বছরের সম্ভাব্য প্রয়োজনের অনুরূপ শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্বাচিত হয়। উচ্চতর তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষায় উৎসর্গীতপ্রাণ গবেষক, তীক্ষ্ণধী মেধাবী ব্যতীত নির্বাচন নেই। এইভাবেই যুবশক্তি, শ্রম, প্রভৃত আর্থিক অপচয় নিবারণের চেষ্টা হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শুধু আশ্বাস এবং আদর্শ যথেষ্ট নয়। এমনকি অমূলক অর্থহীন, যদি না সেই আশ্বাস ও আদর্শে

বাস্তব রূপায়ণ ঘটে। শিক্ষাও বহুলাংশে সময় ও শক্তির অপচয়ের সামিল হয় যদি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই লাভবান না হয়। দেশের শিক্ষা দেশের অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত। অর্থনীতির জটিলতা বিশেষজ্ঞরা বিচার বিশ্লেষণ করবেন। সাধারণের কাছে একথা স্পষ্ট যে সমাজ স্বার্থের অনুকূলে কতগুলি প্রাথমিক ধারণা দৃঢ়মূল হওয়া আবশ্যক। সমাজের অর্থনৈতিক উচ্চতম ও নিম্নতম শ্রেণীবিভাগ কত দূর পর্যন্ত সহনীয়, সমাজের বিত্তশালী-ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা শ্রেণীর স্বেচ্ছাচারী, সমাজ স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ কত দূর পর্যন্ত আইনত অনিয়ন্ত্রিত থাকবে, পিতা-পিতামহের সঞ্চিত অর্থে ব্যক্তির কতটা দাবী থাকবে। উর্ধ্বতম সঞ্চয় ও আয়ের মাত্রা কত দূর হবে, সমগ্র সমাজের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও জীবিকা-সংস্থানের ভার সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর বর্তাবে কিনা এবং দেশের অর্থ বিদেশে লগ্নী করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রের, ব্যক্তির নয়, যেমন নয় প্রতিরক্ষার দায়িত্ব।

সরকার যদি এই ধারণাগুলি বাস্তবভাবে কার্যকরী করে তোলে তা-হলে বিরোধী শক্তির ক্রিয়া সত্ত্বেও সমাজমান-পরিবর্তন ঘটবে আশা করা যায়। পরস্পরবিরোধী মনোভাব, শক্তির ক্রিয়া সব সমাজে বিদ্যমান। যে-যুক্তরাষ্ট্র মানব অধিকারের কথা বলে সেই যুক্তরাষ্ট্রই মারণঅস্ত্র যোগায় সারা বিশ্বের দেশে দেশে, যেখানে সুযোগ দেখে সেখানেই বিবাদ ও বিরোধের ইন্ধন যোগায়, ভারতবর্ষেও তাদের গোপন তৎপরতা কম নয়। যে-সমাজবাদী রাষ্ট্র তাবৎ দুঃখী জনতার ইমান চায় তাদেরও সেই একই প্রয়োগ-বিধি। যুদ্ধ, হিংসা, খুন, বিচারহীন, বিবেকহীন দমন। বোধহয় ভারতবর্ষ এখনো পর্যন্ত হিংসাত্মক নীতিকে একমাত্র পথ বলে গ্রহণ করতে পারে নি। বাহ্যত এইভাব প্রশংসা পায় না। কিন্তু প্রকৃত মানবনীতি হিংসাবিরোধী, সহনশীল বিবেকীনীতি। বহু পরস্পরবিরোধী শক্তি ক্রিয়াশীল থাকা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক নিদারুণ বৈষম্য ও লোকস্ফীতি সত্ত্বেও হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম প্রভাবে প্রভাবিত ভারত-সমাজের মানুষ মানবিক নীতিতে আস্থাশীল। এই ভাব সার্থক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূলধনস্বরূপ। সুপরিকল্পিত উপায়ে এই ভাব সমাজ-মনে দৃঢ়ীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

দুই

শিক্ষা ও অর্থনীতির পরস্পর সংযোগের মতো জীবনযাত্রা ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশে অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। সর্বজন-কথিত বহু কুসংস্কার, ছুৎমার্গের নির্বুদ্ধিতা বুঝি। অস্পৃশ্যতা বর্জন কর্তব্য, তা-ও বুঝি। কিন্তু সমাজ-পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে খুব কঠোর সমালোচনা আসে না। স্ববিরোধ, জটিলতা সর্বত্র। যেখানে ছুৎমার্গ নেই, অস্পৃশ্যতা বর্জিত, সেখানেও ভেদ আছে, ঘৃণা আছে, অপরিসীম অবজ্ঞা আছে, কঠোর পক্ষপাত আছে ; আছে অর্থের তীব্র লালসা, বস্তুভোগের আসক্তি, দেহভোগের স্পৃহা। বাহ্যিক মাপকাঠি হয়তো এই যে অপরকে আহত না করলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ব্যবহার সমীচীন।

ব্যক্তিবিশেষ বা শ্রেণীবিশেষ বা আমরা অনেকেই এমন অনেক কাজ করি যার দ্বারা অপরের ক্ষতি হয়, সমাজের ক্ষতি হয়, যে-ক্ষতির তুলনায় ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপার বা বিশেষ জাতের হাতে জল না খাওয়ার দরুন যে মানবিক অবমাননা পুষে রাখি সে-ক্ষতি অনেকাংশে লঘু। তাছাড়া আমরা কোন কারণ অনুসন্ধানে তৎপর হই না। একথা স্বীকার্য যে, এই ধরনের নানবিক অবমাননা দূর হওয়া উচিত। কিন্তু এর অসারতা যদি বুঝতে পারি তবেই তা দূর হওয়া সম্ভব, অথবা পরিবেশ পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে ঐ ধরনের দূরত্ব আর রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তখন ধীরে ধীরে সমাজমনে পরিবর্তন আসে।

বাস্তব উদাহরণ যথেষ্ট আছে। বড় বড় শহরে গ্রামের মতো বাছ-বিচার মেনে চলার উপায় নেই। দেশ বিভাগের পর বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধীদের জীবনযাত্রার নানা ধরনের পরিবর্তন এসেছে। বলাই বাহুল্য যে, জীবিকা নির্বাহের বৃত্তি সামাজিক স্তরভেদ ঘটায়। আমাদের প্রাচীন সমাজে বর্ণাশ্রমের ধারণা দৃঢ়মূল থাকায় জাতিভেদের জটিলতা আজও বিদ্যমান। শিক্ষায়, রুচিতে, আর্থিক সমতায় যাদের সঙ্গে মেলে আমরা সহজে তাদের সঙ্গে আদান-প্রদান করি।

অন্ত্যজ মেথর, ধাঙড়, চামার-মুচি মুদ্দফরাস ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের হাতে বর্ণহিন্দুরা জল খায় না। অন্যান্য প্রদেশেও হরিজনরা অচ্ছুৎ। তারা বর্ণহিন্দু-সমাজের অঙ্গ হয়ে উঠতে পারে নি আজও। মূলত অপরিচ্ছন্ন স্বার্থজ্ঞানহীন, শিক্ষাহীন রোগজর্জর, দরিদ্র জীবন-যাত্রাই তাদের অস্পৃশ্য করে রেখেছে। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলে, শিক্ষা

থাকলে এতটা হীন অবস্থা ভোগ করতে হয় না। পাশ্চাত্ত্য সমাজ-গুলিতে কশাই, রাস্তা পরিষ্কার করা—ড্রেন পরিষ্কার করা শ্রমিক, উচ্চ, সমাজের তোয়াক্কা করে না।

দ্বিতীয়ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শুচিতা রক্ষা হিন্দুধর্মের একটি রীতি, তারই রকমফের ছোঁয়াছুঁয়ি। আমরা কয়জন আর কায়িক-বাচিক-মানসিক শুচিতা রক্ষায় তৎপর? প্রাচীনকালে দ্বিজগণের বিবিদিষা উৎপন্ন হ'ত কারণ তাঁরা তপস্যা করতেন, ব্রাহ্মণেরা প্রণম্য ছিলেন। আজ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম ব্যক্তিমাত্রেই কি প্রণামের যোগ্য? অথচ কত হাস্যকর প্রথা প্রচলিত আছে, ব্রাহ্মণ-পরিবারে জন্ম বলে বহু পরিবারে অব্রাহ্মণ শ্রদ্ধেয় প্রণম্য ব্যক্তিকেও প্রণামের রীতি নেই। ব্রাহ্মণকুলে জন্মে সকলেই কি ব্রাহ্মণের আচরণ করে, গুণ আয়ত্ত করে, নাকি ব্রাহ্মণের জীবিকা গ্রহণ করে এযুগে? প্রকৃত কথা এই যে, কে কাকে প্রণাম জানাবে না জানাবে তা নিয়ে জবরদস্তি চলে না, ব্যক্তির রুচি, ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে; তাছাড়া পরিবারের শিক্ষায় ব্যক্তির মানসিকতা গড়ে ওঠে।

আরও উদাহরণ দিই। বড় বড় হোটেল রেস্তরাঁতে লোকে খুব পরিতোষ সহকারে স্যুপ খায়। কিন্তু যারা জানে স্যুপ তৈরির সময় রাঁধুনি হাতা দিয়ে তুলে স্বাদ পরীক্ষা করে এবং উচ্ছিষ্টটুকু পুনরায় পাত্রে ঢেলে দেয় তাদের মুখে স্যুপ না রুচতে পারে। যারা কোনদিন আমিষ-জাতীয় খাদ্য স্পর্শ করে নি খুব স্বাভাবিক কারণে আমিষ ভোজীর পাকশালায় প্রস্তুত খাদ্যে তাদের রুচি না হতে পারে। আমেরিকা, আফ্রিকা, চীনদেশ বা ভারতবর্ষের বহু আদিবাসীরা যেভাবে জীবনযাপন করে, আমিষ খাদ্য ভক্ষণ করে, তাদের ছোঁয়া খাদ্যে, পানীয়ে যদি কারো কারো রুচি না হয় তাহলে খুব দোষারোপ করা যায় না বোধহয়। তেমনি যখন আমরা নিজের চোখে দেখি মেথর, ধাঙড়রা বাড়ি বাড়ি ময়লা পরিষ্কার করে, গ্রামে গ্রামে হরিজনদের অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা দেখি তখন আমরা তাদের সঙ্গে দূরত্ব রাখি। যে কুষ্ঠরোগী, যে রূপোপজীবিনী যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত তাদের যেমন আমরা সমাজের চলমান জীবনের আওতা থেকে দূরে রাখতে প্রয়াস পাই, অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যদের সম্বন্ধেও এই একই ভাব ক্রিয়াশীল। আইন করে অস্পৃশ্যতা বর্জিত হয় না। এটা পুরোপুরি জবরদস্তির ব্যাপার নয়। গান্ধীজীর

আন্দোলনেও সমগ্র সমাজের মন পরিবর্তিত হয় নি। ঘৃণিত জীবিকা ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রার পরিবর্তন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই এর জন্য কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ক্রুদ্ধ, রুষ্ট হওয়ার বা বর্ণহিন্দুর প্রতি আক্রোশ জাগিয়ে তোলার কিছু প্রয়োজন দেখি না। ভারত-সমাজ শুধু বর্ণহিন্দুর নয়, বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের এক যৌথ সমাজ। কিন্তু যেহেতু মূলত শিক্ষিত বর্ণহিন্দু সমাজের প্রতিই আমরা আস্থা রাখি সেইহেতু দায়িত্বও তাদের উপরেই অর্পণ করি ; অর্থাৎ তাদের উপরেই বর্তায়, সমাজ ভরসা রাখে।

কে কার হাতে খায় বা না খায়, কার ছোঁয়া জল কোন্ শ্রেণীতে চলে বা না চলে, কাকে স্পর্শ করলে কে স্নান করে তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় ? দক্ষিণী, উত্তরপ্রদেশী অধিকাংশ ব্রাহ্মণেরা বাঙালী, কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণদের আমিষ ভোজন আদৌ শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। যদি প্রাণীহত্যা ধর্মবিরোধী ব্যাপার হয়, সর্বজীবে ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহলে পশুহত্যা করে সেই মাংস ভক্ষণ করা চলে না। যুক্তিতর্ক অনেক আছে, সে-বিষয়ের অবতারণা করছি না, তবে সহজভাবে এইটুকু বুঝতে পারি এসব রুচির ব্যাপার, দেশ-কালে প্রচলিত রীতির ব্যাপার, এসব নিয়ে আন্দোলন করার চেয়ে অনেক জরুরী বিষয় আছে যা নিয়ে আন্দোলন হওয়া যুক্তিযুক্ত। যদি আচারপরায়ণা হিন্দু রমণী কায়িক শৌচরক্ষার্থে কতগুলি সংস্কার মেনে চলে, যদি নিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা কতকগুলি সংস্কার আঁকড়ে থাকে তাতে বৃহত্তর ভারত-সমাজের রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিশেষ কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। নব্বুইভাগ পুরুষরা আজকের যুগে অস্পৃশ্যতা ছোঁয়াছুয়ি মানে না, বড়-বড় শহরবাসী আধুনিক মেয়েরাও এসবের উপর গুরুত্ব দেয় না। তবে ছোট-ছোট শহরে, গ্রামে বা বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে, শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আছে।

স্বভাবতই যে-কাজগুলিকে আমরা অপরিচ্ছন্ন ব্যাপার মনে করি সেই কাজের ভার যে-শ্রেণীর উপর তাদের আমরা দূরে রাখি। যে-খাদ্য অভক্ষ্য মনে করি, যে-শ্রেণীর লোকেরা তা ভক্ষণ করে, তাদের আমরা দূরে রাখি। গোমাংস, শূকরের মাংস হিন্দু পরিবারে ভক্ষ্য নয়, যারা সে-সব খায় তাদের ঘরে অন্নগ্রহণে হয়তো অনেকেরই রুচি না হতে পারে। কিন্তু তাদেরও জীবনযাত্রা যদি উন্নত ধরনের হয়, মানসিকতা সম্মানের

হয়, আর্থিক সমতা থাকে তখন আসা-যাওয়া, মেলা-মেশার বাধা থাকে না। বিবাহের ব্যাপারেও তাই, ধর্মে আচারে, আর্থিক সমতায়, শিক্ষায় রুচিতে মানসিকতায় যদি দুটি পরিবারের মেলে তাহলে সেই পরিবারে পালিত বর্ধিত নরনারীর জীবন সততই দ্বন্দ্বময় হয় না। ঠিক এই কারণেই কি জাত, কুল, পরিবার, বংশ ইত্যাদি দেখার রীতি গড়ে ওঠে নি আমাদের সমাজে? আজ অসবর্ণ বিবাহ যে সচল তার কারণ কি এই নয় যে, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে বিভিন্ন শ্রেণী প্রায় একই পর্যায়ে উন্নীত। যতদূর বোঝা যায় ভারতবর্ষে মুসলমান বা খ্রীষ্টান সমাজেও হিন্দুদর্শনের প্রভাব পরোক্ষভাবে বিদ্যমান। ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সমাজে চতুরাশ্রমের পরোক্ষ প্রভাব, সে-সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আদর্শের প্রভাবপুষ্ট সমাজ মানসিকতা। এইসব অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যেও কাফের বিধ্বংসী মনোভাব সংযত। অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, মনে করা— ধর্মের বৃন্তেই জীবন বিধৃত। এইভাবের প্রাধান্যই পরিমিতি-সমতা-সন্তুষ্টি এবং অহিংসার মনোভাব দৃঢ় করে তোলে মানব-মনে। বৃহৎসমাজে অন্তর্নিহিত, বহু যুগে প্রবাহিত, দৃঢ়মূলভাব উপাদানগুলি সমূলে উৎপাটন করার নেশায় কোন বাস্তবিক স্থায়ী মঙ্গল সমাজের হবে বলে মনে হয় না। অথচ আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্ত্য জীবননীতির আদর্শ সেই মূল উৎপাটনের শিক্ষাই ধীরে ধীরে সঞ্চার করে। একটি দেশের সাধারণ মানুষের জীবন-যাত্রার রীতিপদ্ধতি ভালো-মন্দের ধারণা, সুখ-সমৃদ্ধির ধারণা, সাদামাটা মনোভাব আজ এইমুহূর্তে যে-অবস্থায় আছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কী-ভাবে অপেক্ষাকৃত জীবনযাপনের সচ্ছলতা শারীরিক সুস্থতা, কায়িক-ক্লেশ লাঘব করা যায় ও মানসিক দৃঢ়তা আত্মবিশ্বাস জাগানো যায় সর্ব-প্রকার সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেটাই।

মানুষের যে-আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক পীড়া, সেই সকল পীড়ার স্বস্তি, মুক্তিলাভের অন্যতম একটি উপায় মানসিক স্থিতি-দৃঢ়তা নয় কি, যদিও শিক্ষা-সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সবই ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত, তথাপি পারিবারিক-সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই কি সমাজ-মনের নিয়ামক হয় না? শিশু যেমন পিতামাতা নির্বাচন করতে পারে না, জীব প্রকৃতির নিয়মে শিশুর জন্ম হয়, তেমনি মানুষ ইচ্ছা করলেই সমাজ গড়তে পারে না, সমাজ আপন গতিতে চলে। জন্ম, অস্তিত্ব,

বৃদ্ধি, পরিণাম, অবক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়বিধ ধর্ম এবং কৌমার্য-যৌবন-জরা জীবনের এই যে স্বাভাবিক ক্রম, নিত্য অর্থে সব দেশের মানুষের এই একই পরিক্রমণ পথ। এই জৈবিক অনুক্রম ও সমাজগতি যেন এমন একটি পথ ধরে চলে যে-পথের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত পরিমিত ও মানসিক সমুন্নতিই হয় লক্ষ্য, অর্থাৎ অকৃত্রিম উপচিকীর্ষা, ঐকান্তিক হিতৈষণা যেন জীবনবাদ হয় সম্ভবত ইহাই সনাতন ধর্ম ও দর্শনের অন্তর্নিহিত একটি মূলভাব।

নির্দেশ এই যে শিশুর বোধ উদয়ের পর থেকেই পিতামাতা পরিবার সমাজ তাকে যেন এমনভাবে লালনপালন করে অর্থাৎ পিতামাতার জীবনে পরিবারের পরিবেশে সামাজিক বাতাবরণে এমন অবস্থা থাকা প্রয়োজন, যার সহায়তায় শিশুর মনে সেই সমাজের আদর্শভাব উপ্ত হয়, ধীরে ধীরে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত করে। এই উদ্দেশ্যেই শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবনের ক্রমবিন্যাস বিকাশ ও ক্ষান্তির নির্দেশ চতুরাশ্রমের ধারণায়— যে-ধারণায় জীবনকে খণ্ডভাবে দেখা হয় না, কোন খণ্ড অংশের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্লিষ্ট মনোভাবের সৃষ্টি করাও হয় না। নির্ধারিত পথ দুইটি : নিবৃত্তিমার্গ ও প্রবৃত্তিমার্গ। সংসার যাত্রী, গৃহী জনসাধারণ প্রবৃত্তিমার্গের পথিক ; চতুরাশ্রমের ক্রমপথ সেই পথিকের জন্য নির্দিষ্ট। পরিবারের শিক্ষা, সমাজ পরিবেশের শিক্ষায় চারিটি সত্যের আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠা : ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। অর্থ ও কামের অধিকার সত্ত্বেও প্রবৃত্তিমার্গের পথিকের পক্ষে ধর্মবিযুক্তি অবাঞ্ছনীয় এবং চরম লক্ষ্য মোক্ষের উদ্দেশ্যরহিতভাবেও মানব-জীবনে অকৃত্রিম ঐকান্তিক হিতৈষণার ভাব ও পরিমিতিবোধ জাগা অসম্ভব। এই কারণেই ব্যক্তি-জীবনে কায়িক, বাচিক, মানসিক শুচিতা রক্ষা, ধর্ম আচরণ, কর্তব্যপালন অর্থাৎ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ ও ধ্যান এই ক্রমপথে চরিত্রগঠন ও মানসিক সমুন্নতির পথ নির্দেশিত, এবং স্বধর্ম পালনের নির্দেশ। বর্ণধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা ও আয়ত্তি-করণের উপরেও গুরুত্ব আরোপিত। ব্রহ্মবিদ্যা নিবৃত্তিমার্গের পথিকের জন্য ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্বজ্ঞানীর। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, পরা, অপরা যে-বিদ্যাই হোক লাভের উপায় শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। প্রক্রিয়া অভ্যাস। উদ্দেশ্য প্রয়োগে সিদ্ধিলাভ। স্বধর্ম বলতে বুঝতে হবে ব্যক্তির কৃত্য, কর্তব্য।

সুতরাং আদর্শের জ্ঞান, শৃঙ্খলা, অভ্যাস, এবং লব্ধবিদ্যা, জ্ঞান,

শৃঙ্খলার প্রয়োগে একক ব্যক্তি-জীবনের তথা সমাজ-জীবনের চরমাণ অস্তিত্ব ও দলবদ্ধ-কৃতিত্বের উপলব্ধি জনজীবনের একটি অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের একান্ত বিশ্বাস এই উপলব্ধিই অহমভাবের প্রশমন ঘটাতে পারে, যে-ভাবের প্রাধান্যই পরোক্ষ ধর্ম ও মোক্ষের আদর্শকে উপেক্ষা করে কাম ও অর্থের প্রতিই ঐকান্তিক প্রবণতা জাগায় এবং যার ফলে জীবনে ও সমাজে নানা অসঙ্গতি প্রকট করে। জনশিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এই বাঞ্ছিত উপলব্ধির সহায়ক শিক্ষা। গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় একথাও স্মরণ রাখা ভালো যে স্বপ্রাধান্যের নীতিতে, নির্বিচার ব্যক্তি-অধিকারবাদের স্বীকৃতিতে বহু অসঙ্গতি নিবাধ হয় পরোক্ষ নৈতিক শিথিলতাও প্রশ্রয় পায়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজগুলি সেই আদর্শ অনুসৃতির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভারত-সমাজে দৃষ্টান্ত বিরল নয়।

সার্থক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অর্থনীতির সুষ্ঠু পুনর্বিন্যাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, সুপরিকল্পিত বণ্টনব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির পরিকল্পিত দিক পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন বলে বোধহয়। অন্যথায় অস্পৃশ্যতা নিবারণে শ্রেণী-বিশেষের বিরুদ্ধে রুষ্ট-ভাব জাগানো বিভিন্ন দাবীতে ধর্মঘট, দ্বিতীয় নক্সাল আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি, বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির ক্ষমতা হস্তগত করার চেষ্টায়, প্রাদেশিকতা ও ধর্মবিরোধের ইন্ধন যোগানে, ইতস্তত নানা ধরনের ষড়যন্ত্র ইত্যাদিতে দেশের শক্তি ও বুদ্ধি অধিক নিয়োজিত হতে থাকবে, ফলত সমাজের সংহত অগ্রগতি অধ শতাব্দী পশ্চাৎপদ হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কয়েক দশকের মধ্যে ভিয়েতনাম, ইরান, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশের অনুরূপ পরিস্থিতি ঘটাও অসম্ভব নয়। সুখ, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য কিনবার যে অন্তিম প্রয়াস সম্প্রতি ভিয়েতনাম ত্যাগী বিত্তশালী গোষ্ঠীর, কয়েক কোটি ভারতীয়ের পরিণামও তেমন হতে পারে। পৃথিবীর ধনী দেশগুলিতে ক্রমবর্ধমান জাতি. বর্ণ, বিদ্বেষ ও নানা দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী ভারতবর্ষের মানুষকে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে স্বার্থত্যাগ, সমন্বয় সহিষ্ণুতা ও পরিমিতি-বোধের স্থায়ী ব্যাপক মনোভাবই সত্তর কোটি মানুষের সমাজের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর। লোকসংগ্রহ অর্থাৎ স্বধর্ম, স্বকর্ম ও সততায় প্রবৃত্ত করার শিক্ষাই সমাজ মানসিক প্রস্তুতির প্রথম সোপান। এই পথেই সফল সমাজ সংস্কারের সম্ভাবনা, মৌল অর্থে গণতান্ত্রিকতায় নিহিত আদর্শের সার্থকতা।

উচ্চ-নীচ স্তর নির্বিশেষে ভাষাধর্ম রাজ্য নির্বিশেষে সমগ্র ভারত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসাধনে রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব সমধিক। এ-যুগে সাধু-সন্ন্যাসী, গুরু-শিক্ষক, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রভাবের চেয়েও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাব সমাজে অধিক। একযোগে যুবসম্প্রদায়ের গণসংযোগবৃদ্ধি ও রাজনৈতিক কর্মীদের সমন্বয়ী কুশলতা জনসাধারণের বাস্তববুদ্ধি ও শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ও বিকাশে সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস হয়।

স্বতবিরোধ

স্বজন-পরিবেষ্টিত-গৃহ, স্বসমাজ-পরিবেশ, স্বভাষা-পরিমণ্ডল ইত্যাদি মানুষের জীবনে একটি বৃত্ত রচনা করে। কর্মসূত্রে, ভাগ্যঅন্বেষণে, প্রয়োজনের তাগিদে সেই বৃত্তের পরিধি আমরা বিস্তার করে চলি। জীবনভোর একটি ক্ষুদ্র পারিবারিক বৃত্তে আবর্তিত হলেও বিস্তৃত পরিধিকে বারংবার ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চলি। ভালো লাগে। নতুন করে বাঁচার স্বাদ পাই। আধুনিক সভ্যতা মানুষকে এই পরিধি বিস্তারের মহৎ সুযোগ দিয়েছে।

অথচ স্বদেশ, স্বসমাজ ও ভাষা পরিমণ্ডল থেকে ব্যক্তির বিশ্লেষ ঘটলে দেখা যায় ধীরে-ধীরে কেমন যেন একটি অভাববোধ জাগে। পাশ্চাত্ত্য দেশের বাস্তব সুখ সচ্ছলতায় বসবাস করেও এই অভাববোধ যেন ভারতীয় মাত্রেরই। বিশেষত যারা একটু বয়স্ক, বিবাহিত এবং সন্তানাদি যাদের আছে। যারা মনে ভারতীয় তারা দুঃখবোধ ও দ্বন্দ্ব থেকে নিস্তার পায় বলে মনে হয় না। কিন্তু যারা দেশে থাকতেই পাশ্চাত্ত্যভাবাপন্ন ছিল বা যারা ভারতবর্ষের শুধু অন্ধকার দিকটাই দেখেছে বা ভেবেছে অথবা যাদের সচ্ছলতা ছিল না ততটা তাদের পক্ষে এই ধরনের মানসিক দ্বন্দ্বে না ভোগাই স্বাভাবিক। বরং সচ্ছলতা ও অবাধ স্বাধীনতায় অধিকতর তৃপ্তিবোধ করাই সম্ভব।

তবু আমি দেখি, সমাজ পরিবেশ ও ভাষা ব্যবধান ঘটায়, এই ব্যবধান অতিক্রম করে এক সমাজের মানুষ আর এক সমাজের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। মানসিকতার পার্থক্যের জন্য, জীবনদৃষ্টির পার্থক্যের জন্য কেউ কারো মর্মে পৌঁছতে পারে না। দেশে থেকেও বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষার ব্যবধান ঘটতে পারে, কর্মসূত্রে স্বভাষা-পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ব্যক্তিস্ব একাকিত্ববোধ জন্মায়। কিন্তু সমাজ ও জীবনদৃষ্টির সমতা থাকায় আমরা একে অপরকে মোটামুটি বুঝতে পারি। অবশ্য বহুকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে হয়তো প্রাচ্য বংশোদ্ভূত

গোষ্ঠী ও পাশ্চাত্ত্যের মানুষের মধ্যে একটা সমঝোতা আসবে। কিন্তু তখন সেই প্রজন্মে আর ভারতীয় জীবনদৃষ্টি ও মূল্যবোধের কিছু অবশিষ্ট থাকবে বলে মনে হয় না। পশ্চিমী জীবনবাদ পূর্ণ মাত্রায় গ্রাস করে নেবে তাদের মানসিকতা। যে-শিশু, কিশোর, যুবকযুবতী পাশ্চাত্ত্য-সমাজে বর্ধিত হচ্ছে তাদের আর ভাষা-ধর্ম-জীবনদৃষ্টি-মূল্যবোধ, খাদ্যরুচি শিক্ষা-সংস্কৃতি অন্তরে কোন দ্বন্দ্ব বাধাবে না।

আমি তাদেরই মনের শরিক যারা পাশ্চাত্ত্য সমাজে সচ্ছল জীবনযাত্রা, প্রয়োজনমতো অর্থ এবং বাস্তব জীবনের আনুষঙ্গিক আরামের পর্যাপ্ত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও মনে ও দেহে দুই ভূখণ্ডে বাস করে। এ যেন পুরোনো দিনের মতো, যখন শিক্ষা ও জীবিকার সন্ধানে লোকে শহরে যেত কিন্তু মন পড়ে থাকত সেই গ্রামের আন্তরিক সান্নিধ্যে। বৎসরান্তে একবার গ্রামে ফিরে শহরবাসী পিতামাতা আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহবাসে আনন্দিত হ'ত। আজকের সহজ গমনাগমনের যুগে জীবিকাক্ষেত্রের দূরত্ব আরও একটু যেন বেশি ছড়িয়েছে। সেই পুরোনো দিনে এক অঞ্চল ছেড়ে আর-এক অঞ্চলে যাওয়াটাই যেন একটা দুঃসাহসিকতা ছিল। আজ ভাগ্যঅন্বেষণে এক দেশ ছেড়ে আর-এক দেশে কতজন পাড়ি দিয়েছে। পথ সুগম, অর্থ পর্যাপ্ত থাকলে ফিরতে পারা যায় যখন ইচ্ছা, তাই দূরত্বে আর ভয় নেই। তবু বেদনা। অনাত্মীয় অজানা পরিবেশ। এ সমাজের আমি কেউ নই, বহিরাগত আগন্তুক মাত্র। যে মধ্যবয়স্ক পুরুষ বা রমণী বিদেশী সঙ্গী জোটায় তারও মনের গভীরে একটি তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষা পরিচিত পরিবেশটির জন্য। তাই দেশের মানুষের সান্নিধ্যে প্রবাসী মাত্রেরই সামাজিক মনটি উৎফুল্ল হয়।

মেলবোর্ন, সিডনী, ক্যানবেরা, ব্রিসবেন প্রভৃতি বড় বড় শহরে ভারতীয়ের সংখ্যা নিতান্ত মন্দ নয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী হওয়াতে গোষ্ঠী-বদ্ধতা আছে। জীবিকার ভিন্নতার জন্য ঘনিষ্ঠতার তারতম্য ঘটেও। বয়সের সমতা, একই ধরনের মানসিকতার ফলে সখ্যতা জন্মায়। নচেৎ মৌখিক সদালাপ, সৌজন্য বিনিময় – ঐ পর্যন্ত। দেশেও ধনীর সঙ্গে মধ্য-বিত্তের দূরত্ব আছে, পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্নের সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দূরত্ব আছে, এখানেওতার ইতর বিশেষ নেই। সংখ্যাল্পতার জন্য সকলেই সকলের পরিচিত। যার সঙ্গে যার যেখানটায় মেলে সেই সমতার সূত্রে আসা-যাওয়া মেলা-মেশার আধিক্য। তা সে বাঙালী, তামিল, মারাঠী, পাঞ্জাবী,

গুজরাটি বা হিন্দিভাষী যা-ই হোক। তবে মানুষ নিজের ভাষায় কথা বলে আরাম পায়, নিজেকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে, এই কারণেই গোষ্ঠী বদ্ধতা দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় বুদ্ধিজীবিদের আনাগোনা সুরু হয়েছে ষাট-এর দশকে। অবশ্য বহু পূর্বে একদল শিখ পাঞ্জাবী ইংরেজদের সঙ্গে এসেছিল শ্রমিক হয়ে তাদের বাস কুইন্সল্যানডের একটি অংশে, কিছু আফগান এসেছিল, তাদের অধিকাংশেরবাসও উত্তর দিকে। এদের অনেকেরই চাষ-আবাদ আছে, পশুপালন দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা ইত্যাদি আছে। আর এদেশে এসেছে বহুসংখ্যক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা সাধারণত নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত স্থপতি, চিকিৎসক, কারিগরী কর্মী, শিক্ষক এবং উচ্চাভিলাষী ছাত্র। আছে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী, রেস্টুরেণ্ট, কিছু দোকানপাট, যোগব্যায়াম ইত্যাদির কেন্দ্র। কখনো বা দেশি ফিল্ম দেখিয়ে কিছু পয়সা উপায় করা, সংগীত, নৃত্য-শিক্ষার সাময়িক উদ্যোগ ইত্যাদি। ইদানীংকালে ক্রমে পেট্রলপাম্প, কলকারখানা, দোকান ইত্যাদিতে কাজে নেমে পড়েছে অনেকে, ভারতীয় মেয়েরাও। প্রসঙ্গান্তর হলেও বলতে বাধা নেই বাংলা-দেশের বহু অল্পবয়স্ক ছেলেরা এসেছে এবং প্রায়ই আসছে, নিজের পয়সা খরচ করে মেয়েরাও। অনেকে হয়তো শিক্ষাগ্রহণের সৎ উদ্দেশ্যেই, আবার অনেকে শুধু পরিত্রাণ পাবার জন্যই— তাদের অনেকে নিম্ন-মানের কাজ করতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষ বাংলাদেশ পাকিস্তানের রাজনৈতিক বিভেদ জনসাধারণের কাছে খুব স্পষ্ট নয়।

ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে যথেষ্ট কঠোরতা আছে। যেটা হয়তো বাংলাদেশ, গ্রীক, ইটালী, লেবানন, ইসরেলী, দক্ষিণ-আমেরিকা, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের উপর নেই। উচ্চতম যোগ্যতার মানদণ্ডে নির্বাচিত হয়েই ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা আসে বা আসার অনুমতি পায়। তবে ট্রেডস্‌ম্যান, নার্স বা কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ভাগ্যে অনেক সময় শিকে ছেঁড়ে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের আনাগোনা কম আজকাল। উচ্চশিক্ষিত স্থপতিদের প্রায় আসা নিষেধ। চিকিৎসকদের সুযোগ এখনো কিছু আছে, ভারতীয় চিকিৎসকরা অন্যান্য দেশের মতো এখানেও আদৃত জনসাধারণের কাছে। উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তিদান বা বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাময়িক অধ্যাপক নিয়োগে এখনো সরকারি হস্তক্ষেপ

নেই। কিন্তু প্রবেশের অনুমতি দান সম্পূর্ণ সরকারের ইচ্ছাধীন। তথাপি মনে হয় কৃতী ভারতীয়ের জন্য দ্বার এখনো মুক্ত। কিন্তু মনে রাখা ভালো সে-ক্ষেত্রেও কালো বা বাদামী চামড়ার মানুষের মনীষা সবসময় স্বীকৃতি পায় না। উন্নাসিকতার বাষ্পে সে-পথ ঘোলা হয়ে থাকে। অবশ্য এও দেখা যায় যে যদি ভাগ্যক্রমে কোন পরিচিত ব্যক্তি নিয়োগ সভায় থাকে বা প্রার্থী খুব ভালো অভিজ্ঞানপত্র যোগাড় করতে পারে তাহলে সুরাহা হয়ে গেল। জ্ঞানের চর্চা কোথায় কতটা হয় বাইরে থেকে বোঝা মুস্কিল, ব্যক্তির মনীষার নাগালই বা কীভাবে পাওয়া সম্ভব, অধ্যবসায় জ্ঞানস্পৃহা কতটা, তাও বোঝা সম্ভব হয় না। আচারে-আচরণে বাক্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণ হয় নিজের দেশ থেকে পরিত্রাণ পাবার ঐকান্তিক বাসনাই যেন বিদেশে পাড়ি দেবার পশ্চাতে সক্রিয়।

গবেষক ছাত্রেরা সাধারণত চার হাজার অস্ট্রেলীয় মুদ্রা বৃত্তি পায় বছরে। ভারতীয় মুদ্রার তুলনায় খুবই স্ফীত। কিন্তু পরিবার পোষণ অনেক সময়ই খুব সহজ হয় না। অবশ্য এখনো পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য বাড়তি ভাতা দেওয়া হয়। তবু গাড়ি কিনলে খরচ বাড়ে। অসুখে-বিসুখে খরচ হয়। তাছাড়া সংসার থাকলেই মানুষজনের আনাগোনা বাড়ে, অতিথি অভ্যাগত, নিমন্ত্রণ পাল্টা-নিমন্ত্রণে খরচ বাড়ে। অর্থ উপার্জনের সুবিধা থাকায় মেয়েরা ঘরে বসে অনটন ভোগ করাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় মনে করে না। বিশেষত যখন সাধারণ কাজের জন্য কোন বিশেষ শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন নেই কিন্তু টাকা মোটামুটি ভালোই পাওয়া যায়। নিম্নতম বেতন বাঁধা। তার কমে প্রাপ্তবয়স্ককে কেউ কাজে খাটাতে পারে না, সেটা বেআইনী। ঘরে-বাইরে খাটুনী হলেও অর্থের লোভ সম্বরণ করা দায়। কাজেই কোন শিশুকেন্দ্রে বা কোনো বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েকে জিম্মা দিয়ে ছাত্রের স্ত্রী, অধ্যাপকের স্ত্রী, অন্যান্য কর্মীর স্ত্রীরা কাজে নেমে পড়ে। জার্মানী বা আমেরিকার মতো কোন বাধানিষেধ এখনো আরোপিত হয় নি। ছাত্রও শিক্ষা সমাপ্তির পূর্বেই থেকে যাবার চেষ্টায় কাজ খোঁজে বা কোন প্রতিষ্ঠানে ধরাধরি করে থাকবার সরকারি অনুমতি প্রার্থনা করে। মাঝপথে গবেষণা স্থগিত রেখে কাজে ঢুকে পড়তেও অনেককে দেখা যায়। ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষিত বেকারের উচ্চ সংখ্যা, কর্মসংস্থানের

অনিশ্চয়তা সর্বোপরি জীবনযাত্রার উন্নতমানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় দেশে ফেরার তাগিদ থাকে না। এদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিদেশীর কর্মসংস্থানের অনুকূল ছিল এতকাল। ইদানিং শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে আমরা যা বুঝি সেই যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ জোটাও দুষ্কর হয়েছে। এ-দেশের সমাজও ধীরে-ধীরে কালো-ধলো সচেতন হয়ে উঠছে। বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। ইয়োরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয়ের কদর এখনো আছে। যেসব মেয়েরা শুধু সেসব দেশ ঘুরে এসেছে তাদেরও চটপট কোনো-একটা কাজ জুটে যায়। অফিসে, দোকানে, হাসপাতালে, শিশুপালনকেন্দ্রে, নচেৎ কলকারখানায় মেয়েরাও ঢুকে পড়ে। শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে শিক্ষকতাও জুটে যায়। ভারতীয় মেয়েরা এদেশের মেয়েদের মতোই অর্থ উপার্জনে তৎপর হয়ে ওঠে।

আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নতমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলে এই জীবনযাত্রার প্রতিই একটা লুব্ধ মনোভাব সৃষ্টি হয়। দেশে ফেরার পক্ষে নারীপুরুষ নির্বিশেষে এই মনোভাব এবং স্বাধীন জীবিকার ফলে মেয়েদের মনে যে আত্মনির্ভরতা জাগে সেই ভাবটি বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য দেশের অর্থনৈতিক অনিশ্চতা একটি প্রধান কারণ বটে। যোগ্যতার উপযুক্ত না হোক, যে-কোন কাজ জুটুক তার যা পারিশ্রমিক তা দেশের তুলনায় অন্তত ৮/৯ গুণ এখনও বেশি। যে কারখানার শ্রমিক সেও গাড়ি চড়ে, ভালো খায়, ভালো পরে, সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকে। জীবনযাত্রার প্রাথমিক প্রয়োজন নিচুতলার মানুষেরও ভালোভাবে মেটে।

যারা বেতনভোগীর আওতায় পড়ে না তাদের উপার্জন প্রচুর। বিদেশীর প্রতি সমাজে কোন ভ্রূকুটি নেই তা বলা যায় না, তবে খুব প্রকট নয়। সভ্য সমাজ যদিও ইদি আমিনের মতো ঘাড় ধরে তাড়ায় না কিন্তু স্বার্থে ঘা লাগলে বিস্ফোরণ ঘটে। গ্রেটবৃটেনের দ্বেষের সংবাদ উদ্বেগজনক। আমেরিকায় নিগ্রোদের সঙ্গে সাদাদের সংঘর্ষ সর্বজন-শ্রুত। কে নিশ্চয়তা দিতে পারে অধুনাগঠিত ন্যাশনাল ফ্রন্ট একদিন কালো বা সাদা-কালোর মিশ্রণে উদ্ভূত গোষ্ঠীকে অবজ্ঞা করবে না, উৎখাতে তৎপর হয়ে উঠবে না? ধর্ম, সংস্কৃতি, জাতি, ভাষা, যে-কোন একটির বিভিন্নতা যে-কোন দেশে বিদ্বেষের কারণ হয়ে উঠতে পারে ইতিহাস সেই দৃষ্টান্তই আমাদের গোচরীভূত করে না কি?

ইতিহাসের শিক্ষা ও সাময়িক সচ্ছলতায় পাক খায়। আমরা দূর-দৃষ্টির অধিকারী হই না। সমসাময়িক কালই ব্যক্তি-জীবনের নিয়ামক হয়। সুতরাং শারীরিক ও মানসিক শ্রম ও উদ্বেগের বিনিময়ে উপার্জিত আর্থিক সচ্ছলতা ছেড়ে যেতে মন সরে না। দেশে-বিদেশে সর্বত্রই বিবাহিত কর্মী মেয়েদের কঠিন দায়িত্ব। ভারতীয় সমাজে এখনো আত্মীয়-স্বজনের সহায়তা পাওয়া যায়। যৌথ পরিবার এখনো সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায় নি বলে শিশুপালনের ভার খানিকটা বহন করে পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরা। দাস-দাসীও রাখা যায়। এ-সমাজে সাধারণের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। বৃদ্ধ পেনসনভোগী পিতামাতা যদি একত্র বাস করে তবে সে-সংসারে কিছু সুরাহা হয় বটে তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেটা দেখা যায় না, বা তারা হয়তো একই শহরে বাস করে না, একই গ্রামে থাকে না। সমাজের প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছে শিশুপালন কেন্দ্র। সোম থেকে শুক্রবার কর্মী মেয়েরা অন্ধকার থাকতে ওঠে, নিজেরা তৈরি হয়, শিশু-সন্তানটিকে খাইয়ে সাজিয়েগুছিয়ে নির্দিষ্ট আস্তানায় জিম্মা দিয়ে পুরুষের মতোই সারাদিনের মতো কাজে বেরিয়ে পড়ে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে সওদাগরী অফিস, সরকারি অফিস-কাছারি, ডাক্তারখানা, দোকানপাট, ব্যাঙ্ক— এককথায় সর্বত্র কাজ শুরু হয় সকাল ৯টা বা ৮-৪৫-এর মধ্যে কলকারখানা, পোস্টঅফিস ইত্যাদি আরও আগে কাজ সুরু করে। কাজে ফাঁকি যে যতই দিক সময়টা সম্বন্ধে গাফিলতি করার সুযোগ কম থাকে।

সারাদিনের কর্ম অবসানে ক্লান্ত দেহে-মনে ঘরে ফেরে, কেউ-বা একটু আগে কেউ-বা একটু পরে। শিশুটিকে পিতামাতা ঘরে ফিরিয়ে আনে। সারাদিন তার যত্নের ত্রুটি হয় না। কিন্তু পিতামাতার স্নেহ আবেগ বা পরিবারের স্নেহ তাকে ঘিরে থাকে না। শৈশব থেকেই মায়ের সান্নিধ্য কম পাবার অভ্যাস হয়। একটু বড় হলে গৃহের সান্নিধ্যও কমে আসে। এমনি করেই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা দানা বাঁধে পাশ্চাত্ত্য সমাজে। মায়ের-টান, ঘরের টান, পরিবারের টান পাশ্চাত্ত্য সমাজে শিথিল। সমাজের গঠন, আর্থিক স্বাধীনতা স্বনির্ভরতা পাশ্চাত্ত্য সমাজের মানুষকে বড় বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে। বিশ্রামহীন, গতিময় আধুনিক জীবন ব্যক্তিকে কী অর্থে ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তোলে এবং মানুষ কতটা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে সেটা বোঝা যায় আধুনিক

জীবনের নানাধরনের সমস্যাগুলি দেখে। ভারতবর্ষের সমাজে এখনো এমন উগ্র আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকট নয়। নারীপুরুষ নির্বিশেষে স্বনির্ভরতা, স্বইচ্ছার প্রাধান্য উচ্চশিক্ষা স্বাতন্ত্র্যবোধ ব্যক্তিকে পরিবার কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করে পূর্ণমাত্রায় ব্যক্তিবাদী করে তোলে নি আজও ভারতবর্ষের সমাজে। হয়তো উচ্চকোটির সমাজে, ইঙ্গবঙ্গ সমাজে এমন ঘটনা ঘটে। আমরা সে-সব ঘটনা ব্যতিক্রম বলে ধরে নিই। গোটা সমাজের ধাঁচ তেমনভাবে বদলিয়ে যায় নি। বাইরে থেকে দেখে যেটুকু বুঝতে পারি, মনে হয় প্রাচ্য সমাজের মেয়েরা সাধারণত পাশ্চাত্ত্য সমাজের মেয়েদের তুলনায় এখনো সহনশীল। সম্ভবত নারীর আত্মত্যাগের জন্যই প্রাচ্য সমাজে পরিবার-বন্ধন এখনো ততটা শিথিলমূল নয় পাশ্চাত্ত্যের মতো। নারীর সম্ভ্রমবোধের ধারণাও ভারতীয় সমাজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পুনরায় ফিরে আসি দৈনন্দিন জীবনের ছবিতে। সন্ধ্যায় রান্নাবাড়া খাওয়া বাসন-ধোয়া সেরে যেটুকু সময় হাতে থাকে হয়তো টেলি-ভিশনের সামনে বসে স্বামী-স্ত্রীর ছ'একটুকরো বাক্য বিনিময়, লেখা-পড়ার কাজ থাকলে সে-কাজ সারা, অথবা যার লেখাপড়া নেই তার শেলাই অর্থাৎ উলবোনা, নয়তো ছেলে-মেয়ের খাওয়ানো পরিচর্যা ইত্যাদি। পরদিন আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। এমনি চলে সোম থেকে শুক্রবার। শুক্রবার সন্ধ্যায় নয়তো শনিবার সকালে সাধারণত সকলে হাটবাজার করতে যায়। শনি-রবি ছুটির দিনে জমা থাকে বাকি কাজ কাপড়-কাচা, ঘর-পরিচ্ছন্ন-করা, বাগানের কাজ, গাড়ি ধোয়া বা সারানো, জামাকাপড় ইস্ত্রি— এই ধরনের নানা রকমারি কাজ। এর মধ্যে বন্ধুবান্ধব পরিচিতের আসা-যাওয়া, সামাজিকতা রক্ষা বা নিমন্ত্রণাদি, পাল্টা-নিমন্ত্রণ ইত্যাদি। এমনি নিরেট কাজ ও ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততায় নারীপুরুষ উভয়েরই ব্যক্তি-চরিত্রে কেমন যেন অমসৃণ একটা অসহিষ্ণুতা দানা বাঁধে, মানসিক স্থিতি ভারসাম্য হারায়, একটা অস্থির চঞ্চল অগভীর প্রবণতা ব্যক্তির আচারে-আচরণে প্রকাশ পায়। হয়তো এইটাই আধুনিক জীবনের চরিত্রলক্ষণ। সাধারণ গৃহস্থ সংসারের কাজের সাহায্যকারীর কথা চিন্তাও করতে পারে না। যাবতীয় কাজ স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ভাগ করে নেয়, বড় ছেলেমেয়ে থাকলে সাহায্য করে। বিশেষত ভারতীয় পরিবারে। অন্যদের ঘরে ছেলেমেয়েরা আঠারো বছর

হলে মা-বাবার সঙ্গে থাকতেই চায় না। ভারতীয় ছেলেমেয়েরাও এখানে থাকতে থাকতে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। যাকে বলে ব্রেনওয়াশ।

যা-ই হোক সে-কথায় পরে আসছি। সারা সপ্তাহের এই একঘেয়ে খাটুনি মনটাকে প্রসারিত হতে দেয় না। দু-চার দিনের ছুটি পেলে সবারই ইচ্ছা হয় শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে। ভালোও লাগে। ৫০/৬০ মাইল বেগে গাড়ি ছুটে চলে, বিস্তীর্ণ ভূভাগ, ১০/২০ মাইল অন্তর হয়তো লোকালয় চোখে পড়ল। ৩০/৪০ মাইল দূরে হয়তো একটি ছোট্ট শহর। কেউ যায় পাহাড়ে, কেউ ভালোবাসে সমুদ্রতীর। যার যেমন অভিরুচি। অল্পবিত্তের মানুষেরা ক্যারাভান ভাড়া করে থাকে। হোটেলে-মোটেলেও থাকে। সারাবছর খেটে হাতে কিছু সঞ্চয় হলে দু-চার বছর অন্তর ভারতীয়েরা একবার দেশের মাটি ছুঁয়ে আসে। পিতামাতা-আত্মীয়স্বজন-ভাইবোন তাদের স্নেহের ভাগ নিতে আসে। যার একান্তই অভাব এই অনাত্মীয় সচ্ছল পরিবেশে। কখনো বা ইচ্ছা হয় অভিজ্ঞতার পরিধিটা আর-একটু বাড়িয়ে নিতে, একবার ইয়োরোপ, একবার আমেরিকা অথবা ফিজি, নিউজিল্যাণ্ড কিংবা তাহিতি-হনলুলু ঘুরে আসতে। দেশেও কি ছুটি না আমরা সমুদ্রদর্শনে পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনার্ক কিংবা গোপালপুর, ভিজাগাপট্টম অথবা মাদ্রাজ-কোচিন-কন্যা-কুমারী, রামেশ্বরম ? যাই না কি হরিদ্বার লছমনঝুলা, হৃষিকেশ, কেদার-বদরী হিমগিরি দর্শনে ? ঠিক সেইরকমই। পার্থক্য কেবল মুদ্রার মূল্য-মানের, পরিবেশ আর দূরত্বের।

একটু উনিশ-বিশ স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষেত্রে। সংসারে স্বামী-স্ত্রী শুধু নয়, ১০/১২ বছরের ছেলেটি মেয়েটি পর্যন্ত রোজগারে নেমে পড়ে। হয়তো ইস্কুল ছুটির পর কাগজ বিক্রি করে, নয়তো শনিবারে ছুটির দিনে দোকানে, হাটে-বাজারে কাজ করে, কারো বাড়ির বাগানে ঘাস ছাঁটে কিংবা গাড়ি ধোয়— এমনি সব ছুটকো কাজ। বাড়ির কাজও পয়সার বিনিময়ে— পিতামাতা আত্মনির্ভর হতে শেখায়। ১৬/১৭ বছর বয়স হলেই একটি মেয়েবন্ধু বা ছেলেবন্ধু জুটিয়ে নেয়, আঠারো বছরের ছেলেটি কি মেয়েটি আর মা-বাপের সঙ্গে থাকাটা পছন্দ করে না। নিজের আস্তানা নিজেই খুঁজে নেয় বা নিতে চায়। পনেরো বছরের আবশ্যিকতার গণ্ডিটা পার হলে ইস্কুলে পড়াশুনো করবে কি করবে না তাও নিজেরাই সিদ্ধান্ত করে। মা-বাপের খুব কড়া মতামত নেই।

সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থা এমন যে সন্তানকে গড়ে তুলবার জন্য মা-বাবা ব্যক্তিগতভাবে কোন নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করে না। সীমিত লোকসংখ্যা বেকার সমস্যা আয়ত্তের বাইরে নয়, লেখাপড়া শিখে বড় হবার গরজ খুব অল্প সংখ্যকের মধ্যে। তারা শেখে, কাজ পায়। যে-কোন কাজেই বেঁচে থাকার মতো পারিশ্রমিক জোটে। যদি কাজ না জোটে সরকার বেকার-ভাতা দেয়।

এরা খাটে। শ্রদ্ধা সম্মানের ভ্রূক্ষেপ নেই, সম্ভ্রমবোধের বালাই নেই। কেউ কাউকে তোয়াক্কা করে না। মিস্ত্রী, ঝাড়ুদার, শ্রমিক এরাও কেরানীবাবুর থেকে বেশি মাইনে পায়। পনেরো বছর পর্যন্ত ওরাও তো বন্দী ছিল ইস্কুলে। এখন কাজ করে। বিয়ার খায়। বন্ধু নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটে শহরের বাইরে ছুটির দিনে। রেসের বাজি ধরে অথবা অন্য কিছু। কাজের ঘূর্ণি, উন্মত্ত ঘোরা আর বিয়ারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। যৌবনকে ধরে রাখবার এক অদম্য বাসনা— এরা চায় উদ্দাম জীবন। প্রৌঢ়ের যদি ঘর ভাঙে, আবার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। জীবনের ছন্দে পশ্চাৎগামী। যৌবধর্মই এ-সমাজে মুখ্য। নিবৃত্তি নয়, স্বার্থত্যাগও বড় কথা নয়। মানুষ তো দেবতা নয়, মানুষ তার প্রবৃত্তি, ব্যক্তি আশা-আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী একান্তই প্রবৃত্তি পরবশ মানুষ। আর জীবন তো এই একবার। আত্মার অস্তিত্ব, অবিনশ্বরত্ব, পূর্বজন্ম-পরজন্ম কর্মফলের ভাবনা কিছুই তো এদের নেই। আগে কি ছিলাম পরে কি হব তা কি কেউ জানে? তবে জীবন ভোগ না করে, বঞ্চনা স্বীকার করে কী লাভ? ভালো খাও, ভালো পর, জীবনকে ভোগ কর— যৌবনকে বেঁধে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা কর। যা বাস্তব, জান্তব তাতে আবরণ কিসের? নারীর উদ্ধত নগ্ন যৌবন সুন্দর না? পুরুষকে আকর্ষণ করা যায় না? এই কুহকই সর্বস্ব! বিবাহ-বন্ধনেরই বা ঐশ্বরিকতা কোথায়? প্রকৃতির নিয়মই তো বড়। মানুষের নিয়ম কেন বাঁধবে সেই প্রকৃতিতে! আমার ভালো লেগেছে, আমার ইচ্ছা হয়েছে এর উপর আর কোন কথা নেই! যদি মন না মানে পুরুষ নারী উভয়েই সম্বন্ধ ভেঙে দেয়। সন্তান জন্মেছে তাই কি? যদি তৃপ্ত না হই সে দেহের ভোগেই হোক, আর স্বভাবের দৈন্যে হোক, প্রাচুর্যের অভাবে হোক যে-কোন কারণ থাকুক কোন সহনশীলতার ধার ধারে না এরা, জোড়া-তালি দিয়ে সারাজীবন জের টানা পাশ্চাত্ত্য সমাজের নব্বই ভাগ মানুষ আদৌ পছন্দ করে না।

সন্তানের মুখ চেয়েও পিতা বা মাতা আপন ইচ্ছাকে দমন করতে রাজী নয়। তাই ছেলে-মেয়েকে পিতামাতার আওতায় রাখা এদের ধাতে নেই। ব্যক্তি-স্বাধীনতা এমনই প্রবল যে ১৭/১৮ বছরের ছেলে মেয়ের অবাধ স্বাধীনতা। আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের চেয়ে এ-বিষয়ে সুইডেন, হল্যাণ্ড বেশি অগ্রণী।

এইখানে প্রাচ্য দেশীয়দের মন মেলে না। গ্রীক ইতালীয় দেশের মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ় মানুষেরাও এই আধুনিকতায় ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না। অথচ তাদের সন্তান-সন্ততি পুরোপুরি আধুনিক। ভারতীয় বংশধরেরা কি এই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-জীবনের অংশীদার হয়ে উঠবে না? এ-সমাজে দুটি বিপরীতমুখী শক্তি ক্রিয়াশীল। একদিকে উদ্দামতা আর একদিকে বৈজ্ঞানিক শক্তিকে মানুষের কাজে লাগাবার যৌথ প্রচেষ্টা। কল্যাণের যে প্রাচ্য-ধারণা তার সঙ্গে এই প্রগতির মিল ঠিক নেই। ব্যক্তি-জীবনের যে নৈতিক মানদণ্ড প্রাচ্য-জীবনের বনিয়াদ সে-মানদণ্ড পাশ্চাত্ত্যের নয়। ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর কথা শুধু কেন বলি, তাদের তরলমতি অপরিণত বুদ্ধি, তাদের পক্ষে পাশ্চাত্ত্যের তরল জীবনের রূপটি সহজেই আকর্ষণীয়। কত যে বয়স্ক ভারতীয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবাসী সংসার তছনছ করে ফেলে, নারী পুরুষ উভয়ই, ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারের কুহক এমনি!

ভারতীয়ের ক্লাব আছে, সোসাইটি আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসোসিয়েশন আছে, বৎসরান্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা-উৎসব, ব্যক্তি-বিশেষের সম্বর্ধনা ইত্যাদি হয়, পান-ভোজন হয়, বহু ভারতীয়ের সমাবেশ ঘটে। বাঙালীদের বিজয়া সম্মেলন, সরস্বতী পুজো, রবীন্দ্র-জন্মোৎসব হয়। উত্তর ভারতীয়ের রামনবমী, সর্বভারতীয়ের দীপাবলী আছে। ভেল্লোর হাসপাতালে সাহায্যদান, বাংলাদেশে সাহায্যদানের উদ্দেশে অনুষ্ঠান ইত্যাদিও হতে দেখি। মজলিশী ব্যক্তিরা প্রায়ই ছুটিছাটায় শনি-রবিবারে অনুগতদের নিমন্ত্রণ করেন। আমন্ত্রণ নিমন্ত্রণের পাল্টাপাল্টি সারাবছরই চলে। বিবাহ উপলক্ষে পার্টি, জন্মদিনের উৎসব, এইসব ঘরোয়া সামাজিকতা সংগীত-সভা, কবিতা-সভাও হয়। সভা, বৈঠক, ঘরোয়া সামাজিকতায় ভোজনের সঙ্গে সুরাপানের আয়োজনও থাকে। ভারতীয়েরা সামাজিকতার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। অবশ্য ব্যতিক্রম যে কোথাও নেই তা নয়। তবে তারা ঠিক সোফিস্টিকেটেড

বলে গণ্য হয় না। চতুরা, রন্ধনপটিয়সী বয়স্কা মহিলারা ছেলেমেয়ের সঙ্গীও এইভাবে জুটিয়ে দেয়। সম্বন্ধ অনেক ক্ষেত্রে টিকে যায়, বিবাহ হয়।

বিদুষী-ভেকধরা কোন কোন বয়স্কা রমণী হয়তো পুরুষ নাচায়, সম্মান জলাঞ্জলি দেয়, ঘরে হয়তো তার পাঁচ ছেলে। তবু, শিক্ষিত ভারতীয় মেয়েরা এখনো পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য-সমাজের মেয়েদের মতো এতটা ক্যারিয়া-রিস্ট হয়ে ওঠে নি যাতে ঘর-সংসার স্বামী, সন্তান, পিতামাতা ভাই-বোন সব ছেড়ে শুধু লেখাপড়া বা চাকরীবাকরী করেই খুশী হচ্ছে। কিংবা এতটা অসহিষ্ণুতাও কম দেখা যায় যে মা-বাবা, স্বামী-সন্তানের সঙ্গে কলহ করে বা দ্বিতীয় কি তৃতীয় পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে সব ছেড়ে-ছুড়ে সব জলাঞ্জলি দিয়ে ঘর ভেঙে চলে যাচ্ছে। কিছু সাংঘাতিক প্রগতিবাদী নিশ্চয়ই আছে, পাশ্চাত্ত্য ধরনের ব্যক্তিবাদীও আছে, তবে সম্ভবত নব্বুই ভাগ ভারতীয় মেয়েই আত্মমর্যাদাবোধে তীক্ষ্ণ, ব্যক্তি-নৈতিকতা বোধেও তরল নয়। ব্যতিক্রম আছে সব সমাজেই, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

কী দেশে কী বিদেশে পুরুষনারী উভয়েই যদি গালগল্প, পরনিন্দা, পরচর্চা নানা জাতীয় ফষ্টিনষ্টি খানিকটা কমিয়ে ফেলে এবং কুড়েমি ঝেড়ে ফেলে তাহলে অনেক কিছু জানবার এবং করবার সময়ের অভাব হয় না। রান্নাবাড়া খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটাও সহজ করে নিলে সময় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে দরিদ্র কর্মী মানুষদের কাছে এটা শেখা যায়। খুব ছোটবেলায় একটি তন্তুবায় পরিবারকে দেখেছিলাম, তারা জাতে তন্তুবায় নয় তবে তাঁতবুনেই তাদের সংসার চলে। বয়স্কা মহিলাটি ডাল চাপিয়ে এসে তাঁতে বসেছে, কিছুক্ষণ বাদে গন্ধ পেয়ে সে বলছে স্বামীকে, "ছাখো তো ডালটা হয়েছে বোধহয়, নামাও, চাল ঠিক করা আছে, ভাতটা বসিয়ে দাও, আমার এখন হাত অবসর নেই।" স্বামী দাওয়ায় বসে সুতো গুটচ্ছিল, চলে গেল রান্নাঘরে। কী সুন্দর! সচ্ছল মধ্যবিত্ত পরিবারে, শিক্ষিত উচ্চ-মধ্যবিত্ত, ধনী ঘরে এমনটা হতে পারে না কেন? বিদেশে এসে তো হয়। ছেলেরা রান্না শেখে, অন্তত কাজ চালাতে পারে। বাসন ধোয়। সকালে যদি নিজেই চা জলখাবার খেয়ে নেয় তাতে মনে উষ্মা আসে না। মেয়েরা দোকানে, কলকারখানায় কাজ করতে লজ্জাবোধ করে না। কাপড় কাচতে, ঘর পরিষ্কার করতে দাসীর প্রয়োজন হয় না। বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ করলে পঞ্চব্যঞ্জন মিষ্টান্ন

বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য একা হাতেই প্রস্তুত করে ফেলে। প্রশংসনীয়।

এই প্রাচুর্যময় কোলাহলহীন সচ্ছল জীবনযাত্রায় নবাগতের ভালো লাগে। ধীরে-ধীরে প্রথম দেখার ভালো লাগাটুকু মুছে গেলে চোখে পড়ে মানুষের স্বভাব। শিক্ষাসম্পদ, বাহ্যিক সমৃদ্ধি, পারিপাট্য ও চাকচিক্যের অন্তরালে তম ও রজগুণের কী আধিক্য! আর তখনি মনে হয়, দেশ-কাল-সমাজের ভেদ নেই। বিদ্যা কত অন্তসারশূন্য, চাতুর্য গ্লানিময়, আন্তরিকতাহীন স্বার্থকেন্দ্রিকতা। ছিদ্র অনুসন্ধিৎসা, শ্লীলতাহীন ইঙ্গিত, অহম্পূর্বিক ঈর্ষাকাতরতা। হায়, এই নাকি আধুনিকতার ফলশ্রুতি! এত দূরে এসেও সেই গ্রাম্যতার পুনরাবৃত্তি? চাকচিক্যের অন্তরালে দাম্ভিক ধর্মজ্ঞানহীন অনুদার পরছিদ্র অনুসন্ধানে তৎপর এক অস্থির মনোবৃত্তি, আত্ম-প্রচারোৎসুক স্বোপার্জিত ধনগৌরবে স্ফীত পশ্চিমী শহরে প্রবাসী ভারতীয়।

তখনি প্রত্যাহরণের স্পৃহা জাগে— দাও ফিরে আমার জগৎ। অতৃপ্ত মনটি নিভৃতির আশ্রয় খোঁজে, ফিরে চায় পরিচিত বৃত্তটি। কিন্তু, হায়, নবাগতও অবস্থার দাস হয়ে পড়ে, পথ খুঁজে পায় না। আত্ম-সমর্থনে যুক্তি খোঁজে। প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক সচ্ছলতায় প্রাপ্তবয়স্ক এক গূঢ় দ্বন্দ্বে ভোগে। কুসংস্কার মুক্তি ভালো। শিক্ষার সমান সুযোগ থাকা ভালো, মানুষের প্রাপ্য অধিকার যদি না থাকে তবে স্বাধীনতা নিরর্থক। নারীর স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র্য সামাজিক অগ্রগতিই সূচিত করে, আর্থিক স্বাবলম্বন নারীকে মর্যাদা দেয়। কিন্তু তাই বলে উদ্দাম স্বেচ্ছাচারের সমতা? সমাজকে কোথায় নিয়ে যাবে এই অপরিণতি? জননী যদি আত্মসংবরণ না করে, পিতা যদি নারী-লিপ্সা দমন না করে, কুমারী যদি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই পুরুষের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং কিশোর যদি দেহভোগে উৎসাহিত হয়, সমাজে কোথাও সামান্যতম নিষেধ না থাকে, দুর্বার প্রবৃত্তিকে বাধাহীন-ভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়, নীতি ও ধর্মের সামান্যতম ইঙ্গিতও না থাকে শিক্ষায়, পারিবারিক বা সামাজিক পরিবেশে তাহলে সে-সমাজ কোন্ সত্যের দিশা দেয় মানুষকে?

সব বুঝে তবে কেন পড়ে থাকি? এ কী প্রলোভন, এ কী স্বভাবের দৈন্য, কী ভীরুতা! অল্পে আর সন্তুষ্টি নেই। চাহিদা অনেক বাড়িয়েছি। বাস্তবের আরাম ও সুখে অভ্যস্ত হয়েছি। হ্যাঁ, নিরন্তর শ্রমের ঘূর্ণিতে

বাধা বটে। কিন্তু তার বিনিময়ে অর্থ পাই। পয়সা ফেললে দুধটা পাই নির্জলা, স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রস্তুত অন্যান্য দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য, কেক পাঁউ-রুটি সব-কিছু। মাছ, মাংস, ডিম, ফলমূল, সজী, চাল ডাল আটা ময়দা, তেল মশলা, চা কফি কিছুর ঘাটতি নেই। পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত প্রতি পাড়ায় ভালো পরিচ্ছন্ন দোকানে। বড়বাজার শিয়ালদা কি হাওড়া কলেজস্ট্রীট হাতিবাগান ইত্যাদি না-ই বা উল্লেখ করলাম, কলকাতার নিউমার্কেটের মতো বিশ্রী অস্বাস্থ্যকর ঘিঞ্জি নয় এসব দোকানপাট। রাস্তায় কাটা ফল, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ পশ্চিমী দুনিয়ায় নেই। এরা বাঁচতে জানে, এদের পরিচ্ছন্নতা জ্ঞান আমাদের থেকে অন্তত এইদিকে খানিকটা আছে। এরা বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। দূর-পাল্লার রাস্তায় দোকানে বাজারে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে শৌচাগারগুলি রাখে, লোকসংখ্যার আধিক্যে কি সর্বপ্রকার ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়? নাকি স্বাভাবিক বাস্তবজ্ঞান-হীনতা আমাদের জাতীয় দৈন্য?

অথচ অভাবী মানুষ তো এদেশেও আছে। আছে বয়স্কদের মদ্যপানের সমস্যা অভাবী রোগগ্রস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়, আছে বেকার, আছে অতিবৃদ্ধ মানুষের সেবার ভার। হয়তো কথাটা ঠিকই, ভারতবর্ষের ঐটুকু আয়তনে লোকসংখ্যা দুটি মহাদেশের থেকেও বেশি, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-আমেরিকার সম্মিলিত লোকসংখ্যা। মনে হয়, এদের পরিবেশই বুঝিয়ে দেয় খেটে খেতে হবে, পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাপন করতে হবে, সন্তান-সংখ্যা অধিক হলে কুলিয়ে ওঠা যাবে না। মেয়েরা হাড়ে হাড়ে বোঝে দুটি তিনটি সন্তান হলে কী কঠিন দায়। অন্তত যতদিন নিজে করে খেতে না শেখে ততদিন শিশুটিকে তো দেখাশোনা করতে হবে। বাইরের কাজ ও শিশুপালন কতটা পরিশ্রম-সাপেক্ষ এরা বুঝতে শেখে, বিশেষত এদের সামনে ভালো করে বাঁচবার ছবি আছে, সামাজিক প্রতিশ্রুতি আছে বলেই বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। যতটা সম্ভব পরিশ্রম করে হৃতমান দারিদ্র্যের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা এদেশের মানুষের স্বভাব-জাত। অবশ্য দেশের লোকসংখ্যা— পর্যাপ্ত কৃষিভূমি, সমৃদ্ধ অর্থনীতি খনিজ সম্পদ সব-কিছুই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তবুও আমার মনে হয় অতিপ্রজননের নিদারুণ সমস্যা ভারতবর্ষের সাধারণের কাছে আজও স্পষ্ট নয়। বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণে

সচেতনতা দেখা যায় না তার অন্যতম প্রধান কারণ বাস্তবশিক্ষার অভাব এবং উন্নত জীবনযাপনের ধারণার অভাব। বংশপরম্পরায় দীনভাবে বাঁচতে বাঁচতে আশা-আকাঙ্ক্ষা ইচ্ছা সব যেন মুহ্যমান হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক কারণ, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এর মূলে সক্রিয় সত্য। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্রও কি কোন সামাজিক পরিবর্তন আনবে না? পাশ্চাত্ত্য সমাজের দরিদ্র লোকটিরও জীবনের মান আমাদের শিক্ষিত নিম্নমধ্য-বিত্তের তুলনায় উন্নত। সে দুধ পায়, প্রাতরাশে একটি ডিম থাকে, রুটি তার জোটে। একটা ফল জোটে। হয়তো তার ভালো বাড়ি নেই, তবু মাথার উপর আচ্ছাদন আছে। উন্মুক্ত বায়ু, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ স্বাস্থ্য-কারিতার প্রথম সোপান একথা মানুষে বোঝে। হয়তো নিউ ইয়র্ক শহরে নিগ্রোদের ডেরা আমাদের বস্তির থেকে ভালো নয়, বিন থেকে কুড়িয়ে সে-দেশেও ভিক্ষুক আহার্য খুঁটে খায়। বুঝি সেটা কালো-ধলোর অবজ্ঞার একটি দিক।

বড় বড় শহরে আমাদের অপরিসর গৃহ, প্রতিগৃহে কয়লার ধোঁয়া, কলকারখানার ধোঁয়া, মানুষের ভিড়, রাস্তাঘাটের অপরিচ্ছন্নতা, বাজার-হাট, দোকানপাটের অপরিচ্ছন্নতা সমস্ত পরিবেশটাই যেন দূষিত, নিশ্বাস নেবার মতো উন্মুক্ত বিশুদ্ধ বাতাস নেই। শহরে বস্তিবাসীর জীবন, রাস্তায় স্টেশনে, সাবওয়েতে বসবাসকারী মানুষগুলির জীবন, পথের পাশে পড়ে থাকা অন্ধ খঞ্জ আতুর রুগ্ন অসহায় অসংখ্য হতমান মনুষ্যনামের বিদ্রূপ যেন। এই বিভীষিকা এ-সমাজে বিরল। আমাদের গা-সহা, জানি কোন প্রতিকার নেই— সমাজের দায় নেই— রাষ্ট্র মাথা ঘামায় না অথচ সে একটা স্বাধীন দেশ, মনুষ্যত্বের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে বলে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়ে সে দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণ তুমুল কোলাহলে। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ হলে স্বাধীন মত প্রকাশ না করতে পারলে শিক্ষিত সচ্ছল সম্প্রদায় বিত্তশালী সম্প্রদায় বাঁচবে না! হায়রে, ঐসব মানুষকে দুমুঠো ক্ষুধার অন্ন কোন্ সরকার জোগাবে? সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে একজন রোজগার করে পাঁচজন বসে খায়। দরিদ্রের সংসারে বৃদ্ধ পিতামাতা, বেকার বা পড়ুয়া ভাই-ভগ্নী অথবা আশ্রিত ভাগিনেয় ভাগিনেয়ী একত্র বাস করে। কী খায়, কেমন করে দিন গুজরান করে! প্রতিকারের পথ ওরা খুঁজে পায় না, দয়া ভিক্ষা করে সমাজের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে। নিরুপায় হয়ে সান্ত্বনা খোঁজে, আপন

ভাগ্যের দোহাই দেয়, পূর্বজন্মের কর্মের ফল মনে করে সহ্য করে। মুসলমান কি ভাবে? খ্রীষ্টান কিসে সান্ত্বনা খোঁজে? দুঃস্থের, নিরন্নের জাত কি? সে খোঁজে শিক্ষিতের, সচ্ছলের, বিত্তশালীর, নেতৃবৃন্দের কাজ কি, তাই গা-বাঁচিয়ে চলতে হয় উদাসীন ভদ্রতায়।

এইজন্যই চীন দেশটাকে, রাশিয়াকে তারিফ করতে হয়। পশ্চিমী সভ্যতাকে তারিফ করতে হয় তাদের উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচার সত্ত্বেও। জানি, চীন বা রাশিয়া মুষ্টিমেয়র স্বাধীন কণ্ঠরোধ করে, তারা হিংস্র দানবের মতো হয়ে ওঠে কখনো কখনো, তারা চাবকিয়ে কাজ করায়। কিন্তু ক্ষুধার অন্ন যে দেয় সমান করে। পশ্চিমী পুঁজিবাদীও অন্তত মানুষের এই বেঁচে থাকার আত্যন্তিক প্রয়োজনটা বোঝে। অন্তত উপবাসী যেন কেউ না থাকে তার ব্যবস্থা রেখে তবেই ধনসম্পদের পুঞ্জীভূতকরণ। বৃদ্ধ পিতামাতা, পুত্রকন্যার সংসারে থাকে না— সরকারি ভাতা পায় নিজেদের গৃহে স্বতন্ত্র বাস করে, অশক্ত হলে সরকারি আবাসে যায়। ভাই-ভগ্নী, ছেলে-মেয়ে কেউ কারো গলগ্রহ হয় না, কাজ না জুটলে, অর্থ উপার্জনের পথ খুঁজে না পেলে বেকার-ভাতা পায়। না খেয়ে মরে না। দুঃস্থ পরিত্যক্ত শিশু কিশোর, অবিবাহিত মা, অশক্ত অঙ্গহীন বয়স্ক পুরুষ নারী সরকারী ভাতা পায়। উন্নত দেশগুলিতে অভাবী-অশক্ত-বেকার মানুষগুলির জন্য এই সামাজিক প্রতিশ্রুতিটুকু আছে। পুঁজিবাদী সমাজেও রাজপুরুষেরা এমন লুঠেরা তস্কর হয়ে ওঠে না যাতে দেশের মানুষ খেতে না পেলে তারা কোন দায়িত্ববোধ করে না। ফাঁকি স্বার্থপরতা যতই থাক, মসনদ আঁকড়াবার ফন্দি নিয়ে যত ব্যস্ত থাক, প্রাথমিক প্রয়োজনের কথাটা ভোলে না। যদিও দেশে-দেশে সর্বত্রই ব্যক্তিস্বার্থ-কেন্দ্রিকতা, তথাপি কতগুলি সাধারণ সামাজিক বুদ্ধি সংগঠনশক্তি কর্ম-উদ্যম, বাস্তবনিষ্ঠার ফলে শ্বেতকায় জাতিগুলির সমাজ অপেক্ষাকৃত আত্ম-প্রত্যয়শীল, স্বনির্ভর ও শক্তিশালী। এইসব সমাজে প্রাচ্যদেশীয় বুদ্ধিজীবীগণ বেশ ভালোভাবেই খাপ খাইয়ে চলে। তাদের বুদ্ধি মনীষা কর্মশক্তির বিনিময়ে সচ্ছল জীবনযাপন করে।

যেমন ভারত সরকার এই সকল ব্যক্তির অভিজ্ঞতা-কর্মকুশলতা জ্ঞান বিবেচনা দেশের সমৃদ্ধি-সেবায় নিয়োগের জন্য আহ্বান জানায় না তেমনি অধিকাংশ বহিরাগত ভারতীয় দেশ সেবার নৈতিক দায়িত্বও অনুভব করে না। আশ্চর্য হতে হয় পার্শ্ববর্তী ইন্দোনেশিয়া, বর্মা প্রভৃতি

দেশগুলিকে দেখে। এইসব দেশের সরকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বিদেশে স্থায়ীভাবে বসবাসের উৎসাহ দেয় না, ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর না করে শিক্ষা সমাপ্তির পর বা নির্দিষ্ট কার্যকালের পর দেশে ফিরতে বাধ্য করে। বৈদেশিক দূতাবাসের কর্মী ব্যতীত রাশিয়ার নাগরিকেরা বিদেশে থাকার অনুমতি পায় না। লাল চীনও অনুমতি দেয় না। হয়তো সেটা ব্যক্তি অধিকারের অস্বীকৃতিই বটে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া, বর্মা একটি দৃষ্টান্ত। অতিপ্রজননের দেশ ভারতবর্ষ, সমস্যাসঙ্কুল ভারতবর্ষের বৈদেশিক দূতাবাসগুলি ঢালাও পরামর্শ দেয় যে দেশে বসবাসের সুযোগ জুটেছে, অর্থ উপার্জনের একটা হিল্লে হয়েছে—সে দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে সুখে সমৃদ্ধিতে থাক। ঠিক কথা, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন পরামর্শ বটে। ব্যক্তি নিজেও দ্বিধাবোধ করে। দেশের অর্থনৈতিক প্রতিকূল অবস্থা উত্তরোত্তর বেকারসমস্যা, দারিদ্র্য, নিম্ন মানের জীবনযাত্রা, কর্মের অনিশ্চয়তা চিন্তা করে স্থায়ীভাবে বিদেশে বসবাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী। যে-দেশে ১৫ মিলিয়ন বেকার সেখানে আবার কতগুলি বেকার বৃদ্ধি করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কর্ম-বিরতির পর বৃদ্ধ বয়সে ফিরতেও অনেক বাধা। কালের নিয়মে পিতামাতার মৃত্যুর পব ভাই-ভগ্নী আপন সংসার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, ছেলেমেয়েরা বড় হয়, দূরত্ব বেড়ে ওঠে। জন্মভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকতেও মন সরে না। গ্রামের থেকে শহর নিরাপদ, কিন্তু কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজের মতো শহরে বাস করতেও ইচ্ছা যায় না। আবার এত তীব্র প্রাদেশিকতা যে একমাত্র দিল্লী ব্যতীত কোথাও থাকতে ভয় হয়। চিকিৎসক, স্থপতি পসারের কথা ভাবে, অন্যেরা সামান্য পুঁজি নিয়ে ফিরতে দিশা পায় না। সেখানে তো কোন ভাতার ব্যবস্থা নেই। সন্তান-সন্ততির নিশ্চিত সচ্ছলতার আশ্বাস ছেড়ে যাওয়া বাস্তব দিক থেকে কতটা সুবুদ্ধির কাজ তাও স্থির করে ওঠা শক্ত হয়। কখনো মনে হয় জীবনযাত্রায় কতগুলি সুবিধা না হয় না-ই থাকল, সেই সমাজ-পরিবেশে ছেলেমেয়েরা উন্মার্গগামী স্বেচ্ছাচারী তো হয়ে উঠবে না। বয়সের ধর্মে এদেশের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিবাহাদি হলে বা মেলামেশার ফলে যে মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হবে, কোন্ সমাজে ঠাঁই পাবে তারা? ভারতবর্ষের ইঙ্গভারতী, গ্রেটবৃটেন, আমেরিকার মিশ্র সমাজের মতো অবজ্ঞা কুড়াবে না কি তারা? হাজার-হাজার বছরের শিক্ষা

সংস্কৃতি ধর্ম ও জীবনবোধের ধারাবাহিকতা মুছে যাওয়াই সম্ভব সেই মিশ্র সমাজে, দায়ী থাকবে এই দ্বন্দ্বে-ভোগা ভারতীয় বুদ্ধিজীবী যারা নিজের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দেশে ফিরবার সৎ সাহস দেখাতে পারল না। জীবনের মূল্যবোধ ধর্মবোধ হারিয়েই তো আজ পাশ্চাত্ত্য সমাজ দিশে-হারা। পর্যাপ্ত খাদ্য, কায়িকশ্রমের লাঘব, বিলাস-উপকরণ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, উগ্র স্বাধীনতা সত্ত্বেও কেন এ-সমাজ অসুখী। বিবাহ-বিচ্ছেদ এখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। মনোবিকারের রোগী গণ্ডায় গণ্ডায়। ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, নারীধর্ষণ, খুন সব-কিছুরই আধিক্য। যৌন স্বেচ্ছাচার আর বাস্তব-জীবনের আরাম, প্রাচুর্য একসময় মানুষকে ক্লান্ত করে তোলে। তাই হিপির দল পূর্ব দেশে যায়। একদল গাঁজা, চরস, আফিং আরো যত উত্তেজক মাদক আছে খায়, নেশায় বুঁদ হতে চায়। একদল তরুণ কৃষ্ণমন্ত্র নেয়, শান্তি খোঁজে।

এই জীবনবাদের প্রভাব কী এড়াতে পারবে আজকের অপরিণত ভারতীয় বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী! তবে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে দেশে ফিরে যাব না কি সময় থাকতে? অথবা বাস্তব-জীবনের ব্যবহারিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে উদাসীন নীরবতায় এখানেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবনটা!

সমাজে যারা পরাজিত, অজ্ঞ, নির্বোধ, অকৃতী, অশক্ত তাদের জন্য এই পাশ্চাত্ত্য সমাজ দুটো অন্ন বস্ত্রের সামান্য ব্যবস্থা তো করে দেয়। এই ব্যবস্থা এই সামাজিক মনোভাব কি যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে না? আমাদের সংস্কৃতি, ধর্ম, নৈতিকবোধ এইসব মানসিকতা নিয়েও তো আমরা মূঢ় পরাজিত অকৃতী জনসমাজের জীবনধারণের সামান্য উপায়-টুকুও করে দিতে পারি নি। কোন্ সমাজ বরণীয়?

এদেশে যারা আয়করের আওতায় পড়ে, তাদের প্রায় এক-দশমাংশ কর দিতে হয়। যত বেশি আয়, তত বাড়ে কর। ফাঁকি দেবার প্রবৃত্তি ব্যবসায়ীদের আছে, চিকিৎসক, স্থপতি, প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়ীদের আছে। কিন্তু পুলিশ তাদের ধরে, ধরতে পারলে আইন আদালত তাদের শাস্তি দেয়। এরা বস্তুবাদী, এরা ব্যক্তি-জীবনে, যৌন-জীবনে নীতির ধার ধারে না। কিন্তু এদের সমাজে সাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের অধিকার যে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সে-প্রতিশ্রুতি রক্ষার যে বাস্তব-ভাবে চেষ্টা রয়েছে— এই বোধ এবং চেষ্টা কি মহৎ নয়? মানবতা

বোধের পরাকাষ্ঠা নয়? জীবনযাত্রার উন্নতমান, আরাম কি কাম্য নয়?

দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোটি যাতে ভেঙে না পড়ে, যাতে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহত থাকে, সমাজ-স্বাস্থ্য রক্ষা পায় সরকারের সে দিকে গভীর দৃষ্টি। সে যে দলই সরকার গঠন করুক। সরকারি অর্থ তছনছ করে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়া, কয়েক পুরুষের সমৃদ্ধির ব্যবস্থা পাকা করার প্রবৃত্তি থাকলেও পুকুরচুরি কম দেখা যায়, কারণ, অন্যেরা কৈফিয়ত দাবী করে। খাদ্যে ভেজাল, ঔষধে ভেজাল, হাসপাতালের রোগীর ঔষধ পথ্যের চোরাকারবার বা ঐ ধরনের দুষ্প্রবৃত্তি বিরল। যদিও ড্রাগট্রাফিক্, ট্রেন ডাকাতি, হীরে জহরত চুরি, খুনখারাপ, নারী-ধর্ষণ কম নয়।

ভারতীয় কল্যাণ রাষ্ট্রের ৬০০ মিলিয়ন লোকের কল্যাণের ভার যাদের হাতে ন্যস্ত তারা কি এমন একটা সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে না যেখানে আপামর জনসাধারণের বেঁচে থাকার অধিকারটুকু কায়েম হয়? পূর্বজন্ম পরজন্ম কর্মফলবাদ সব মেনে নিয়েও কি জাতীয় জীবনে কর্মবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় না? পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির সংগঠনশক্তি, বাস্তব দৃষ্টি, কর্মনিষ্ঠা ও পরস্পরের প্রতি সমত্ববোধ কি ভারতীয় সমাজের আয়ত্তে আসতে পারে না? পারিবারিক নিষ্ঠা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, আবেগ এই মানসিক গুণের সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ববোধ যুক্ত হয়ে সে-সমাজে বুদ্ধির ব্যাপকতা ও বাস্তব দৃষ্টির পরিণতি ঘটতে পারে না কি?

আমাদেরও কি সামান্য-কিছু দেবার ছিল না সমাজকে? আমাদের কর্মশক্তি অভিজ্ঞতা? কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, বস্তুভোগের নিশ্চিত আশ্বাস ছেড়ে যেতে সংসারি মানুষের মন সরে না। অন্নময় দেহ, তাই বস্তুভোগের আরামটাই বড় বলে বোধ হয়। যে-অবস্থায় আছি, কায়িক যে-আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যভোগের সুযোগ জুটেছে তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ছেড়ে যেতে চায় না, কারণ, জানি আমার দেশে আমার অবস্থার মানুষের পক্ষে সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ মন ক্ষুব্ধ হয়। বিদেশে এক শ্রেণীর ভারতীয় আছে যারা সর্বদাই দেশের বিরূপ সমালোচনায় মুখর। দেশে কি আঞ্চলিকতা নেই? আসাম—অসমীদের, তামিলনাদ— তামিলভাষীর, মহারাষ্ট্র— মারাঠীভাষীর— এমন ধুয়া নেই? তবে পাশ্চাত্ত্য-সমাজে যথাযোগ্য সম্মান নেই, সাদা-কালোর ভেদ

আছে, সূক্ষ্ম অবজ্ঞা আছে…এ-সমাজ আমাদের ঔদার্যে নয় ঈর্ষামিশ্রিত উদাসীন করুণায় ঠাঁই দেয় বলে হীনতাবোধ জাগে কেন? আজ আফ্রিকার বহুদেশ থেকে ভারতীয়েরা বিতাড়িত, বর্মা থেকেও বিতাড়িত। বৃটেনে সামাজিক অবজ্ঞার ফলেই কালোধলোর বিরোধ বিবাদ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ায় ভবিষ্যতে এমনি হয় বিতাড়ন নয় অবজ্ঞা জুটবে না, একথা কে নিশ্চয় করে বলতে পারে? মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতবংশোদ্ভূত সেই গোষ্ঠীর তখন কি গতি হবে? কেন ৫০/১০০ বছর আগে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা অন্য প্রদেশে বসবাস সুরু করে নি? দেশ বিভাগের পর এই তিরিশ বছরে পূর্ববাংলার হিন্দু অধিবাসীরা পশ্চিমবাংলায় এসেই কি খুব আদৃত? ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতা নেই? 'বাঙাল খেদা' নেই? এখনো জাতি-ভেদ কি প্রবল নয়? ভেদবুদ্ধি নেই? বৈবাহিক আদানপ্রদান সহজ হয়েছে কি? কোন্দল নেই? ভাংচি নেই?

যে-দেশের কোন আশা ভরসা রাখিনে সেখানে ফিরতে পারিনে বলে এ-বেদনা কেন? শিক্ষিতের মুখেই শুনেছি "যারা উচ্চশিক্ষিত তাদের অকারণ অশ্রু উথলায়।" সে-সমাজের মানসিকতা বুঝতে বেগ পাবার কথা নয়। তবু কেন এই দুঃখবোধ? বর্তমান ও ভবিষ্যতের টানা-পোড়েনে নিয়ত ক্ষয়িত হওয়া? ব্যক্তি আত্মসুখপরায়ণ। সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচেবর্তে থাকাই মুখ্য। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'— এই চাওয়াই মোক্ষম চাওয়া। তবুও আমার সুখ-শান্তির ধারণার সঙ্গে আর একজনের মিল হয় না। সুখের সংজ্ঞা কী খুঁজে পাই না। সুখ কী বুঝতে পারি না!

যে-যুবক পুত্রটি ৫/৭ বছরের বড় একটি বয়স্কা রমণীর প্রণয়-কুহকে পড়ে, তার জন্য আর্তি কেন? এমন ঘটনা কি কদাচ ঘটে না? শুনেছি গুজরাটি, উত্তরপ্রদেশী, পাহাড়ীদের বয়সে বড় মেয়ের সঙ্গে পুরুষের হামেশা বিবাহ হয়। পাশ্চাত্য-সমাজে, মুসলমান-সমাজে এ অভ্যস্ত ঘটনা। তবে মন মেনে নিতে চায় না কেন? যে-যুবতী কন্যাটি পিতামাতা, পিতৃবন্ধু-স্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মুখে নির্দ্বিধায় প্রণয়ী পুরুষটিকে বেষ্টন করে, উভয়ে মুহুর্মুহু চুম্বনে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করে— সে-আচরণ আমার কাছে পীড়াদায়ক হয় কেন? কিশোরী কন্যাটি অথবা পুত্রটির অবিনীত ঔদ্ধত্য আমায় কেন ক্ষুব্ধ করে তোলে? যে-বয়স্ক পুরুষটি ১৫/২০ বছরের

সংসার ভেঙে আর-একটি ঘর ভাঙা রমণীর কণ্ঠ লগ্ন হ'ল, যে-নারীটি দশ বছরের তিল-তিল করে গড়া ঘর ভাঙল সন্তানের মমতাও তার মনকে বাধা দিল না— এদের প্রতি কেনই বা বিরূপতা জাগে? হায় এই যুগ, এই বাঁধভাঙা পরিবেশ, নিম্নগামী প্রবৃত্তি এসবের প্রভাব রোধ-ক্ষমতা কার আছে?

আমার কেন এই স্বতবিরোধ? ব্যবহারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য চাই ভোগ করতে, আবার ভয় পাই জন্মসূত্রে-প্রাপ্ত সমাজসূত্রে-আহৃত জীবনদৃষ্টি হারাতে। অপরিণত বুদ্ধি যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরীর মধ্যে কি করে সঞ্চারিত করে দেব সেই মূল্যবোধ, এই সম্পূর্ণ বিপরীত সমাজ পরিবেশে? কোথায় পাব সেই শান্ত নম্র আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী অথচ অনাড়ম্বর রুচিশীল জীবনের আদর্শ সব হারিয়ে যাবে এই লুব্ধ প্রগল্ভ বস্তুবাদের জৌলুষে। আমার অস্তিত্বও নিশ্চিহ্ন হবে। তাতে বৃহৎ ভারতবর্ষে কোন ক্ষতি নেই। ক্ষতি বিশ্লিষ্ট ব্যক্তির।

এরা কি রোগ জরা মৃত্যুকে জয় করতে পেরেছে? পারে নি। কিন্তু স্বল্পস্থিতির জীবনটুকু আরামে স্বচ্ছন্দে কাটাবার ব্যবস্থা করবার জন্য খুবই সচেষ্ট এবং সে-ব্যবস্থা সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপৃত। রোগের ভয় দূর করার আপ্রাণ চেষ্টা। রোগ প্রতিরোধ করবার আপ্রাণ চেষ্টা। খাদ্য উৎপাদনে, ব্যবহারিক বিদ্যায়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মোকাবিলা করতে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে-কর্মোদ্যম এই সমাজে দেখি তাকে সেলাম করে বলি, এমনটা কি আমার দেশে সম্ভব নয়? আবার বিমুখ হই যুদ্ধবাজ ক্রূর ফন্দি ফিকির দেখে। শক্তির মদগর্ব, ঔদ্ধত্য, অবজ্ঞা, অহঙ্কার, প্রবৃত্তির তাড়না, দুর্বলকে গ্রাস করে গুঁড়িয়ে পিষ্ট করে ফেলার ইচ্ছা দেখে সন্ত্রস্ত হই।

কখনো মনে হয় ভারতবর্ষের মাটিতেই ভবিষ্যৎ মানব-সমাজের একটি আশ্বাস দানা বাঁধতে পারে। আমরা তো নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার করে সেখানকার মানুষকে খতম করে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারব না, আমরা যুদ্ধের নামে মানুষ খুন করে আপনি বাঁচবার অধিকার কায়েম করতে পারব না। হয়তো ইতিহাস আমাদের পথ দেখাবে, হয়তো ব্যক্তি-প্রলোভন ব্যক্তি-চাহিদাকে সীমায়িত করে বৃহৎ সমাজের কল্যাণ সম্ভব হবে। কখনো মনে হয় কি সেই জাদুমন্ত্র যার বলে এ-সমাজ নিরলস কর্মবাদী। বিস্ময় জাগে যখন ভাবি মাত্র দুশো বছরে আমেরিকা

অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান সমৃদ্ধি। ইয়োরোপের নানা দেশ থেকে মানুষ এসে জুটে স্থানীয় অধিবাসীদের মেরে ধরে কোণ-ঠাসা করে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড দখল করে নিজেদের শক্তি সামর্থ্যে প্রাকৃতিক খনিজসম্পদ আহরণ করে, খাদ্য ফলিয়ে বিজ্ঞানের চর্চা করে আধুনিক সমাজের সমৃদ্ধি।

সমাজ-পরিবেশই শিক্ষা দেয়, কর্মে প্রবৃত্ত করে। জীবনের চাহিদা বড় বলেই মানুষ খেটে ফসল ফলায়। সংখ্যায় এত বেশি নয় যে, দেশের মাটি তাদের খাদ্য যোগাতে অক্ষম। সংখ্যায় অল্প বলেই শারীরিক শ্রমে পারদর্শী এ-দেশের মানুষ। এই কারণেই যন্ত্র এদের সহায়ক কায়িক-শ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে।

বিস্তীর্ণ ভূমি, পর্যাপ্ত উৎপাদন, চাষীর সঙ্গে কেন্দ্রশক্তির প্রত্যক্ষ-যোগ। কোন মধ্যসত্ত্বভোগী মাঝামাঝি বাধা সৃষ্টি করে নেই। আমাদের দেশে ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় জমিদারীপ্রথার সৃষ্টি, সে-প্রথা বলবৎ থাকে শতাব্দীকাল, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আইন করে রদ হ'ল সেই প্রথা। সেইমতো আইন করে রদ হোক মধ্যসত্ত্বভোগের ব্যবস্থা। রাজনৈতিক খুন জখম বা শ্রেণী-বিদ্বেষ না জাগিয়ে তুলে বর্তমান ব্যবস্থা আইন করে সংশোধিত হোক। ধনতান্ত্রিক, মিশ্র বা অর্ধ-সমাজতান্ত্রিক যে অর্থনীতি ব্যবস্থার নিয়মই আমাদের দেশে চালু থাকুক, বহির্বিশ্বের দিকে তাকিয়ে অর্থনৈতিক ধুরন্ধরেরা কি যথেষ্ট শঙ্কিত নয় যে এই ব্যবস্থায় জমি আঁকড়ে থাকা ২৫/৩০ কোটি ভারতবাসীর জীবনযাত্রার সমস্যা দূর হবে না? ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, ভারী-শিল্প জাতীয়করণের মতো দেশের সমস্ত কৃষিযোগ্য ভূমি জাতীয়করণের আশু প্রয়োজনীয়তা আজ আর অগোচর নেই হয়তো। যদি দেশের সকল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের উপর ন্যায়সঙ্গত অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হয়ে থাকে, যদি সভ্যসমাজে অর্থ-নীতির ধারণা মূলত উদ্ভূত হয়ে থাকে গোষ্ঠী ও সমাজের কল্যাণভাবনা থেকে তবে কেন্দ্রীভূত শক্তির সক্রিয়তায় সমাজের সর্বস্তরে অর্থনীতির সংস্কার ও পুনর্বণ্টন না হওয়ার যুক্তি কি? মধ্যবিত্ত অধিগতবিদ্যার বিনিময়ে জীবিকা অর্জন করে, শ্রমিক শ্রমের বিনিময়ে। যদি সরকার দেশের কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে চাষীর পক্ষে চাষের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও অর্থ জীবিকাস্বরূপ অর্জন করতে বাধা থাকে না। কোন সশস্ত্র বিপ্লব বা রক্তাক্ত বিপ্লবের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর সম্ভব হতে পারে। সেইভাবে আইন করে ব্যক্তি-

সম্পত্তি, অর্থসঞ্চয় ও আয়ের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হতে পারে। সমগ্র সমাজের উদ্দেশ্যে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন। কৃষিউৎপাদনে কোন মধ্য-সত্বভোগী, জোতদার, ভাগচাষী যদি না থাকে, সরকার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে যথাযথ শ্রমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক হিসাবে যদি প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও অর্থ দেয় তাহলে কৃষিকেন্দ্রিক অসমতা দূর হতে পারে। উদ্‌বৃত্ত শস্যে কোন ব্যক্তি-অধিকার থাকা অবাঞ্ছনীয়। লেনদেনও মজুদরক্ষার ভার সরকারের হাতে থাকলে মহাজন শ্রেণীর অস্তিত্ব দূর হতে পারে। সরকারি ব্যবস্থায় দিনকতক খুবই অরাজকতা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে, দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আয়ের সীমা ধন সঞ্চয়ের সীমা নির্ধারিত থাকায় খুব বাড়াবাড়ি হতে পারবে না। আর যদি এই অব্যবস্থা বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্ভিক্ষ মহামারী দেখা দেয় তাহলে সমাজের চৈতন্য উদয় হবে, দুষ্কৃতি-কারিদের কঠোর শাস্তি না দিলে সরকার রেহাই পাবে না।

সভ্য মানুষ স্বাধীন দেশ আদিম জগতে তো ফিরতে চায় না, পরস্পরের সহযোগিতায় সমস্যার সমাধান চায়। অন্নময় জীবন, সেই জীবনের বাস্তব সমৃদ্ধিতেই সাধারণ মানুষের তৃপ্তি। সমাজ যদি সেই জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অধিক শক্তি নিয়োগ করে তাহলে সফলতা যে আসে পাশ্চাত্ত্য সমাজের সমৃদ্ধিই তা প্রমাণ করে। যেদিকে আমরা লুব্ধ দৃষ্টি দিই এবং সেই সমৃদ্ধিই সব দেশের মানুষের কাম্য। তবে সমৃদ্ধির ধারণা দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক; এক দেশের মানুষের সুখ সমৃদ্ধির ধারণা অপর দেশের মানুষের ধারণায় তফাৎ আছে, আবার একই সমাজে স্তরভেদে সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় আকাশ-পাতাল ভেদ। ধনীর আকাঙ্ক্ষা আর দরিদ্রের আকাঙ্ক্ষা সমান নয়। আবার কারো কাছে বস্তুসমৃদ্ধি অপেক্ষা মানসিক সমৃদ্ধি বড়। কিন্তু কম-বেশি. ভালো-মন্দ, ছোট-বড়র দ্বন্দ্ব, রুচি-পার্থক্য ইত্যাদির প্রশ্ন না তুলে এবং উচ্চনীচ কোন ভেদ রেখা না টেনে, ব্যক্তির শিক্ষা, বুদ্ধি যে মানসিক ব্যাপ্তির নিয়ামক সে-কথাটাও আপাতত মুলতুবি রেখে আমরা বলব, মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য যে কতগুলি প্রাথমিক প্রয়োজন যে দেশ-সমাজ রাষ্ট্র ব্যাপকভাবে সর্বস্তরে সেই প্রয়োজন মিটিয়েছে সেই সমাজই আদর্শ।

রাজনীতি বা অর্থনীতির কাঠামো যা-ই হোক, সব সমাজেই কি

শ্রেণীবিশেষের উপর বিশেষ কর্মের ভার থাকে না? সুষ্ঠু সমাজ পরিচালনার জন্য শ্রেণীবিশেষের উপর আস্থা স্থাপন করা হয় না? প্রাচীনকাল থেকেই তো এই ব্যবস্থা মানুষের সমাজে। আধুনিক যুগেও সেই একই ব্যবস্থা। কতগুলি মানুষের উপর বিশ্বাস রেখে, আস্থা স্থাপন করে নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করার মনোভাবই কোটি কোটি মানুষের মধ্যে। কিন্তু যদি সেই আস্থাভাজন লোকগুলি যথাকর্তব্য পালন না করে, যদি সমাজের হিতচিন্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আত্মভোগ-স্পৃহা বৃদ্ধি পায় তাহলে অনিবার্যভাবেই বিরোধ বিশৃঙ্খলা অসন্তোষ ক্ষোভ দেখা দেয়।

প্রাচীন যুগে সমাজে ধর্মের প্রভাব ব্যক্তি তথা জনজীবনের সাম্য রক্ষা করেছে। একদল মানুষ বুঝেছে এবং বোঝাবার চেষ্টা করেছে পরিমিতিই ব্যক্তি ও সমাজে সমতা রক্ষার অন্যতম প্রধান উপায় ব্যক্তির মানসিক পরিমিতিবোধ। নীতি, ধর্ম, পরস্পরের প্রতি কর্তব্যবোধ, সর্বোপরি একটি অলৌকিক পরম শক্তিতে বিশ্বাসের ধারণা সমাজে ব্যাপ্ত রাখার চেষ্টা হয়েছে। আজকের যুগে মানুষ বিজ্ঞানের বলে আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী হওয়ায় পরম শক্তিতে বিশ্বাস অনেকটাই শিথিল। কিন্তু মানবিক নীতি, সামাজিক রীতিনীতি বা ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-দেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও কর্তব্যবোধের প্রয়োজন ফুরায় নি, প্রাচীন সমাজেও যেমন ছিল আজও তেমনি আছে এবং অধিকতর মাত্রায়। অথচ আধুনিক শিক্ষা ও শিথিল ধর্ম বিশ্বাসের ফলে, প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকায় আমাদের মানসিকতা বহুলাংশে পরিবর্তিত। আত্মবাদী শিক্ষার ফলে ধনপুঞ্জীভূত করার লোভ ও বস্তুভোগের স্পৃহা বল্গাহীন। শাসনতান্ত্রিক কোন বাধা নেই। ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে জৈব জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপের ফলে সর্বস্তরে জীবন বাস্তবভাবে সুখকর ও আরামপ্রদ করে তোলার জন্য সমাজ সক্রিয় ও তৎপর। নিচুতলার মানুষও যেন সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য আছে। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য দূর করার জন্য পরিমিতিবোধের মানসিক প্রস্তুতি নেই। কাজেই নিদারুণ প্রতিযোগিতা। চীন, রাশিয়া কেন্দ্রশক্তির চেষ্টায় ধনবৈষম্য দমন করে। এ-দুয়ের মধ্যবর্তী একটা পথের সন্ধান হয়তো পাওয়া যায়। ধনসঞ্চয়ের লোভ, ভোগের লোভ, এই গৃধ্নুতা অবদমিত হতে পারে একদিকে যদি জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করবার ভয় না থাকে, পরিবেশ-পরিস্থিতি সহজ ও সুস্থ

থাকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি কায়েম হয় এবং একটি সুচিন্তিত শিক্ষানীতি পরিব্যাপ্ত হয় তবেই সমগ্রভাবে সমাজে পরিমিতিবোধ জাগা সম্ভব হতে পারে।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রকৃতি নিয়মের অধীন, জরা ও মৃত্যুর অধীন। প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই, প্রকৃতি যথাযথ থাকলে মানুষের সমৃদ্ধি নিরাপত্তা। এই অন্তিম পরিণতি জানা সত্ত্বেও তম ও রজগুণের প্রভাবে প্রবৃত্তি-তাড়িত মানুষ উদ্দাম হয়ে ওঠে। অথচ মানুষের চিৎশক্তির অধিকারে ভারতবর্ষের বিশ্বাস— সে-শক্তি জড়প্রকৃতির অতিক্রান্ত শক্তি। সেই বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দেওয়া অপমৃত্যুর সামিল। কিন্তু আত্মবাদী নীতি ও পাশ্চাত্ত্য-জীবনের আদর্শ সেই চিৎশক্তির বিকাশের পরিপন্থী, জড় অমোঘ প্রবৃত্তির উদ্দামতার সহায়ক। জৈব উপাদানের অতিরিক্ত চিন্ময় উপাদানের অস্তিত্ব স্বীকার করাতেই ব্যক্তি-জীবনে সর্বপ্রকার নৈতিক শুচিতায় অধিক গুরুত্ব আরোপিত হয়। এই অন্তর্গূঢ় বুদ্ধি সচেতনভাবে না থাকলেও পরোক্ষ-ভাবে সমগ্র ভারত-সমাজ প্রভাবিত। অধিকন্তু বর্ণাশ্রমের ধারণা দৃঢ়। যে-ভাব, যে-মানসিক উপাদান পাশ্চাত্ত্য-সমাজে সাধারণভাবে দেখা যায় না বহুশতাব্দীর ভাব-জীবনের প্রবাহমানতাই সমাজকে এই মানসিকতা দিতে পারে। অন্যথায় নয়।

কিন্তু নিষ্কাম কর্মেও উপলব্ধি মানসিক উচ্চতায় না পৌঁছালে সম্ভব হয় না। ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্মে সেই মানুষই প্রবৃত্ত হতে পারে যার কাছে কর্মই আনন্দ। সে-ব্যক্তি নির্মোহ। জীবনের অভিজ্ঞতায় যে বোঝে কর্মই মানুষকে বাঁচার শক্তি দেয়। ব্যক্তির প্রকৃতি, বুদ্ধি অভীপ্সা ভেদে সে কর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু ফলের আকাঙ্ক্ষাহীন কর্মে প্রবৃত্ত থাকা ও আনন্দলাভ মানসিক পরিণতির অবস্থা ব্যতীত সম্ভব নয়। এই পরিণতি মুষ্টিমেয়র মধ্যে বিকশিত হয়— জনজীবনে ১৫ আনা মানুষের এই আত্মিক প্রাপ্তির মূল্যবোধই হয়তো জন্মায় না, সে-বোধের উন্মেষও বোধহয় সম্ভব নয়, ফলের উদ্দেশ্যেই মানুষ কর্ম করে। তবে ব্যাপকভাবে সর্বস্তরে ভারতীয় মানসিকতায় যে-পরিমিতিবোধের উপাদান আছে সেই উপাদানই আত্মস্বার্থকে একান্ত করে না তোলার শিক্ষা দিতে সমর্থ। বারবার কেবলি মনে হয় জনশিক্ষার আশু-প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষায় অনুসৃত পাশ্চাত্ত্যনীতির দিক পরিবর্তনের

একান্ত প্রয়োজনীয়তা। সমাজস্বার্থ, ব্যক্তি ও সমাজের সম্বন্ধ যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে বোধহয় ব্যাপকভাবে সামাজিক উন্নতির কথা আমরা ভাবতে পারি না, আবার গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হলেও যথাযথ পালনে সমর্থ হই না। শুধু জনসাধারণের নয়, শাসনতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত নির্বাচিত প্রতিনিধি, নেতৃস্থানীয় শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও সেই মানসিক প্রস্তুতির অভাব লক্ষ করা যায়। সমাজে রাষ্ট্রব্যবস্থায়, শাসনতন্ত্রে বিভিন্ন কর্ম-কেন্দ্রে, প্রতিষ্ঠানে যে যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী একটি যেন বিজেতার মনোভাব পোষণ করে। শক্তি ও শক্তিহীনের শ্রেণী ভেদে একটি বিজিত ও বিজেতার দ্বন্দ্ব যেন গূঢ়ভাবে বিদ্যমান। হয়তো বহুদিনের পরবশ্যতা ও পরশাসনের ফলেই সমাজে এই মনোভাবের সৃষ্টি। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে এই প্রকার নানা বিভেদমূলক মনোভাব লক্ষ করা যায়। পরাধীনতা একটি অভিশাপ। স্বাধীনদেশের জনসমাজে যদি সমত্ববোধ না জন্মায় বাস্তব-জীবনের নিরিখে, তবে সমাজের অভিশপ্ত অবস্থার আশানুরূপ পরিবর্তন বিঘ্নিত হতে বাধ্য।

ভারতীয় মানসিকতায় দয়া-দাক্ষিণ্য, অনুকম্পা, মমতা যতটা প্রবল, দেশ ও সমাজবুদ্ধি ততটা প্রবল নয়। অধিকার-সচেতনতা শ্রেণী-বিশেষে সীমাবদ্ধ। সর্বস্তরের মানুষের বাঁচার অধিকার ও প্রয়োজন সম্বন্ধে সচ্ছল, শিক্ষিত উচ্চশ্রেণী ততটা সচেতন নয়। সম্ভবত এই অভাবই পরোক্ষে বুদ্ধিজীবীর পলায়নী-মনোবৃত্তি জাগায়, শাসনতন্ত্রকে স্বার্থান্বেষী করে তোলে, জনসাধারণ সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হয়, বিত্তশালীর স্বার্থ কায়েম রাখার নিপুণ চেষ্টাও প্রকট হতে দেখা যায়।

প্রতিকারের পথ খুঁজতে যেদিকে তাকাই দৃষ্টি প্রতিহত হয়—অর্থনীতি, উৎপাদন, শিল্প, বাণিজ্য, কার্যক্রম-পদ্ধতি, কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-উদ্যোগের যুগ এটা নয়। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির সুপরিকল্পিত নীতি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সক্রিয় না হলে বৃহৎ সমাজের পরিবর্তন অসম্ভব। কর্মভেদে জাতিভেদ, বুদ্ধি ও রুচিভেদে শ্রেণীভেদ, ধর্মভেদ, ভাষাভেদ সব সমাজে বর্তমান, ঈর্ষা ক্রোধ লোভ ক্ষমতালাভের স্পৃহা সর্বত্র বিদ্যমান। তবু ছোটবড় সকলের কতগুলি সাধারণ বুদ্ধি অধিকারবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা থাকায় পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে কেউ কাউকে ফাঁকি দিয়ে ঠিক রেহাই পায় না। এরা ব্যক্তি-জীবনে শ্রদ্ধা সম্মানের জন্য তৃষিত নয়, সম্ভ্রমবোধ আমাদের তুলাদণ্ডে মাপা যায় না, এরা 'কিল খেলে

পাটকেল দেবার নীতি' মেনে চলে। এদের যৌথ প্রচেষ্টা. উদ্যম, বর্তমান যুগপরিস্থিতি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এদের বাঁচবার সুযোগ দেয়। সমাজে সর্বস্তরের মানুষের এই সাধারণ বুদ্ধি ও বোধই জাতীয় চরিত্রে অসাড়তা দূর করে। একটা সামান্য উদাহরণ দেওয়া যাক, যেটা আমাদের সমাজে হামেশা ঘটতে দেখা যায়। খাদ্যে বা ঔষধে ভেজাল মেশানো। একজন ব্যবসায়ী হয়তো প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারে, বড় শহরে বাড়ি হাঁকিয়ে, গাড়ি হাঁকিয়ে, ব্যাঙ্কে টাকা মজুদ রেখে বেশ সুখে কাল কাটাতে পারে। সেই সঞ্চিত ধন পুত্র-পরিজনের নির্দ্বিধায় ভোগ করতে কোন বাধা থাকে না। কিন্তু তার ফল কি হয়, সমাজের স্বাস্থ্যের আত্যন্তিক ক্ষতি। ব্যক্তির বিরুদ্ধে শুধু রুখে দাঁড়ালেই তো হবে না, ক্ষতিকর অন্যায়টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মতো বুদ্ধি জনজীবনে প্রয়োজন। শাস্তির ভয় দেখিয়ে, জরিমানা করে হয়তো একজন গোয়ালাকে, ব্যবসায়ীকে, ভেজালের কারবারীকে ঘায়েল করা গেল। কিন্তু ব্যক্তি এবং সমাজ যদি না বোঝে সেই বোকামি কতটা ক্ষতিকর এবং পরিস্থিতির যদি প্রতিকার কিছু না হয় তাহলে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এক ভাষা-পরিমণ্ডলে জন্মিয়ে যেমন স্বতস্ফূর্তভাবে সে-ভাষায় মানব শিশুর অধিকার জন্মায়, সমাজের পরিবেশে শিক্ষা সংস্কৃতির অংশীদার হয়ে ওঠে, তেমনি সেই সমাজের অর্থনীতির কাঠামোটা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে। ভাষা, শিক্ষা সংস্কৃতি ধর্ম সমাজ-ব্যবস্থা পরিবেশ অর্থনীতির বিশেষ কাঠামোর আওতায় যখন আমরা পুরুষানুক্রমে বাস করি ও বেড়ে উঠি, তখন অধিকাংশেরই কদাচ সেই পরিস্থিতির বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, ভালোমন্দ তলিয়ে বুঝবার চেষ্টাও আসে না। খুব স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তিই চিরাচরিত প্রথা-বদ্ধ-সমাজ ও রাজনৈতিক আওতায় থেকেও কোথায় গলদ তা বুঝতে পারে এবং পরিবর্তনে পথ খোঁজে বা পথ দেখাতে তৎপর হয়। আজ সহজ গমনাগমনের সুযোগে বহুজনের বহুদেশের সমাজের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হচ্ছে। এই মুহূর্তে আমাদের কাছে খুব স্পষ্ট নয় যে অর্থ নৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হলে সাদা মানুষেরা কালোদের প্রতি কতটা কঠোর এবং নিষ্ঠুর হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষ যেমন বহুধর্মের বহুদেশের মানুষকে যুগ যুগ ধরে ঠাঁই দিয়েছে তেমন সহনশীলতা সহাবস্থান ভবিষ্যতে পাশ্চাত্ত্য-সমাজে যে সম্ভব হবে

তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশের সমাজে ব্যাপকভাবে সেই চরিত্রগুণ আছে কিনা তাও সঠিক নির্ণয় করা যায় না। স্বার্থে ঘা লাগলে ব্যক্তিবাদী স্বার্থপরতা কতটা মাথাচাড়া দেবে তা ইতিহাস প্রমাণ করবে। দ্বন্দ্ব ও দ্বিধায় ক্ষতবিক্ষত না হয়ে একদিন তারা ঘরে ফিরবে আত্মিক সন্তুষ্টির জন্য, সন্তানের ভবিষ্যৎ মর্যাদা রক্ষার গূঢ় এক আশা নিয়ে। যেদিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থে বিত্তে নিবৃত্তি আসবে, যখন পরিণত দেহ একমুঠি অন্নে তুটি ফলে তৃপ্ত হবে, যখন কল্যাণের ভাবনায় মন হবে পরিপূর্ণ, চেতনায় জ্ঞানে কর্মে ব্যক্তিতুষ্টির ব্যস্ততা স্তিমিত হবে, সেইদিন এই স্বতবিরোধের অবসান, বৃত্তের কেন্দ্রটি আবার খুঁজে পাব। সেইদিন যেন বলা যায় বুদ্ধির সচেতনতা কর্মের প্রেরণা যোগায়, জ্ঞানই লুব্ধ প্রলোভন সংবরণ করতে শেখায়, কল্যাণ ভাবনা জাগায়— সে-জ্ঞানের পূর্ণরূপ আধুনিক পাশ্চাত্যে প্রত্যাশিত নয়, এ-সমাজের মানসিক উপাদান ভিন্ন, সে-প্রত্যাশা রূপ নিতে পারে প্রাচ্যে, ভারতের মানসিক উপাদানে কর্ম উদ্দীপনা সঞ্চারিত হলে হয়তো যথার্থই মানবকল্যাণের দৃষ্টান্ত মূর্ত হয়ে উঠতে পারে। সমাজে অর্থ-নৈতিক সাম্য ও সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টিতে কেন্দ্রশক্তি বদ্ধপরিকর হলে অর্থনৈতিক কাঠামো বদল করা সম্ভব হবে। ব্যক্তি-মালিকানা সর্বৈব উচ্ছেদ হয়তো সহজ হবে না, কারণ ব্যক্তি-সঞ্চয়ের স্পৃহা ক্ষুধা ও যৌন আকাঙ্ক্ষার মতোই একটা জৈব প্রবৃত্তি। তথাপি সমাজ শিক্ষা সংস্কৃতি যেমন অপর প্রবৃত্তিকে সংযত ও বিধি-নিয়মের অন্তর্ভূত রাখে তেমনি রাষ্ট্রশক্তির সুনিয়ন্ত্রিত নীতি নিয়মে বস্তুভোগেচ্ছা ধনপুঞ্জীভূতকরণের ইচ্ছা সংযত থাকা বাঞ্ছনীয়। আবার এমন অবস্থাও কাম্য যখন সেই মুষ্টিমেয় শ্রেণী যাদের সমগ্র সমাজ আস্থা স্থাপন করেছে তাদের বুদ্ধি এবং কর্মশক্তি নিয়োজিত হবে সর্বস্তরে সমাজের কল্যাণসাধনে, জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে, সর্বপ্রকার বাস্তব অর্থে। এই মানসিক পরিণতি লাভের জন্যই ভবিষ্যৎ সমাজের শিক্ষায় স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ধারণা যেন দেওয়া যায়, যে ধর্ম, সংস্কৃতি— বাক্‌স্বাধীনতা শুধু নয় ভোগের পরিমিতি অর্থ-নৈতিক সমতা, কঠোর পরিশ্রম কায়িক ও মানসিক এইসব-কিছুর সমবায়ে সমাজের অগ্রগতি। প্রতি নাগরিকের পক্ষে সেই কর্মযজ্ঞে ন্যায্য শ্রম দান করা অবশ্যকর্তব্য। আত্ম-সমীক্ষাই আত্মপ্রত্যয় দেয়, সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করে। সংসদীয় নির্বাচন, প্রাপ্তবয়স্কের ভোট, বাক্‌-

স্বাধীনতা, ধর্ম সংস্কৃতির অধিকার শুধু নয়, অর্থনীতিতে অধিকার, কর্ম-সংস্থান, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের সমর্থ মানুষের কাজ, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা— এক কথায়, বেঁচে থাকবার এবং যথোপযুক্ত জীবনযাত্রার মানে বেঁচে থাকবার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার থাকলে তবেই সমগ্র জাতির জীবনের কর্মচঞ্চলতা জেগে ওঠে। কর্মক্ষেত্রে সর্বপ্রকার নির্বাচনে যদি যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন না হয় তাহলে অযোগ্য ব্যক্তির দায়িত্ববহনেরও ক্ষমতা থাকে না, ফলে সর্ববিষয়ে সাফল্যের পরিবর্তে ব্যর্থতাই প্রকট হয়। ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা, কর্মশক্তি, শিক্ষা, বিশেষ বিষয়ে অধিকার অভিজ্ঞতা সব-কিছুর নিরিখে যোগ্যতা বিচার করে আস্থা স্থাপন করাই সুবুদ্ধির কাজ, নচেৎ আত্মীয়-তোষণ, আশ্রিত তোষণ বা জাতের মোড়ল, পাড়ার পাণ্ডা, দলের মোড়লের তুষ্টিতে যথেষ্ট বিপর্যয়ের সম্ভাবনা। নিরপেক্ষ বিচারের শক্তি তখনি আসা সম্ভব যখন বুদ্ধির পরিণতি ঘটে, কথায় এবং কাজে যখন সামঞ্জস্য থাকে না তখনি চৈতন্য হয়। বাক্যের ফুলঝুরি, উত্তেজনা ও ঝাণ্ডার মাহাত্ম্য বাস্তব-জীবনের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ট নয়। জনজীবনে অবিশ্বাস ও ক্রোধ কি পুঞ্জীভূত হয় নি? শিক্ষার স্ফুলিঙ্গে সমাজবিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠবে, যার বেশি আছে সে অবশ্য ছাড়তে শিখবে, সমাজের গর্ভেই দেখা দেবে নবীন উদ্দীপনা, বিজেতা ও বিজিতের মনোভাব দূর হবে, আর সেই জাগৃতির সূচনা দেখে মূল-ছিন্ন প্রবাসী খুঁজবে মনের আরাম ভারতবর্ষের মাটিতেই। কালের নিয়মে ব্যক্তির অন্তর্ধান ঘটলে ভারতীয় অস্তিত্ব বহমান থাকবে সন্তান-সন্ততির ধারায়, এই মহৎ সান্ত্বনা। সেই আকাঙ্ক্ষিত ভূমিতেই তাদের সম্মান ও দাবী। পাশ্চাত্য-সমাজে একটি অপাঙক্তেয় গোষ্ঠী পরিচয়ের অপেক্ষা সেই পরিচয় শ্রদ্ধেয়, কাম্য ও অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

দেহের পুষ্টি অর্থাৎ বেঁচে থাকার জন্যই মানুষের সংগ্রাম বটে, সেই প্রয়োজন আংশিক মিটলেই মানসিক পুষ্টির সন্ধান। প্রশ্ন জটিল সন্দেহ নেই, কারণ, পুষ্টি ও তুষ্টির ধারণার তারতম্যেই জটিলতা মানব-সমাজে। কিন্তু প্রত্যয় একটি — আত্মানুসন্ধানে তৎপরতা, তারই উপযুক্ত অবসর, অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সমাজের সমবেত চেষ্টায় বাস্তব-জীবনের দৈন্য ঘুচাবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া।

প্রতিশ্রুতি ও অন্বেষণ

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে আর্থিক অবস্থার বৈষম্য দূরীকরণ লক্ষ্য এবং ব্যক্তির আর্থিক নিরাপত্তা, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আর্থিক অবস্থার সমতা কাম্য। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজে আথিক অবস্থার বৈষম্য থেকেই যায়, বিশেষত 'Free enterprise way of life'-এর ফলে প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। কল্যাণ রাষ্ট্রের নীতি অনুসৃত না হলে শক্তিহীন প্রতিযোগিতায় হার-মানা মানুষের আর্থিক নিরাপত্তার কোন আশ্বাস থাকে না দেশের সরকার বা শাসন ব্যবস্থার মালিকের বা গোষ্ঠীর কাছে। 'Survival for the fittest' ও 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এই প্রবচন যদি সমার্থক হয় তাহলে পূর্ব-পশ্চিম সমাজের মানুষের জীবনদৃষ্টির পার্থক্য সূচিত করে না। এই ভাব যেমন পূর্ব-পশ্চিমের সমাজে বিদ্যমান তেমনি সকল সমাজই হৃদয়ঙ্গম করে যে বলহীন, অশক্ত, প্রতিযোগিতায় হার-মানা মানুষেরও বাঁচবার অধিকার আছে। কিন্তু দেশ বিশেষে অনুসৃত রাজনৈতিক সমাজনৈতিক আদর্শ বা নীতির উপর ব্যক্তি-পরিবার-গোষ্ঠী তথা শ্রেণী বিশেষের আর্থিক জীবনমান নির্ভরশীল এবং পারস্পরিক বহুবিধ দায়-দায়িত্বের নির্ভরতাও অনুরূপভাবে সেই নীতি বা অবস্থা-সাপেক্ষ।

দেশে দেশে মানুষের জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রয়োজনগুলির বিধি ব্যবস্থায় পার্থক্য থাকলেও বর্তমান যুগে গোটা পৃথিবীর সভ্য মানব-সমাজে বিদ্যমান, আর্থিক ব্যবস্থায় উপরিউক্ত দুই তন্ত্রেরই রকমফের। ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অবস্থা বৈগুণ্যেও প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থার ফলে সমাজে সুখসমৃদ্ধির ধারণা ও জীবনযাত্রায় তারতম্য। মানুষের বাস্তব-জীবনের মূল চাহিদাগুলির প্রয়োজন-সিদ্ধির উপরেই সমাজ নির্মিত, একথা যদি স্বতঃসিদ্ধ হয়, তাহলে মানতে হয় যে সমাজে ভাবাদর্শ গড়ে ওঠার মূলেও প্রয়োজন-সিদ্ধির বিধি ব্যবস্থাই সক্রিয়। মানুষের জৈব-তাড়নাগুলি মেটা চাই

সমাজ-আদর্শের অনুকূলভাবে, নচেৎ সামাজিক মানুষ শান্তি পায় না, তা সে কৃষিকেন্দ্রিক শিল্পকেন্দ্রিক বা মিশ্র-অবস্থার সমাজ হোক, সেই সমাজে প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত অবস্থাই সেই সমাজের মানুষের কাছে শ্রেয় বোধ হয়। কিন্তু যেহেতু আজকের যুগে সহজ গমনাগমনের ফলে এক দেশের প্রভাব আর একদেশে গিয়ে পড়ে সেই হেতু উন্নত ধনী দেশ-গুলির সমৃদ্ধ জীবনযাত্রা দরিদ্র দেশগুলির ধনী সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, দেশের শাসন ব্যবস্থা-ব্যবসাবাণিজ্য অধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠী সকলেই আর স্বল্পে সন্তুষ্ট হতে পারে না। পরস্পর প্রতিযোগী হয়ে ওঠে বাস্তব-জীবনের সুখসমৃদ্ধির উপকরণ বাহুল্যের তাড়নায়। এবং তা একমাত্র অর্থের বিনিময়েই আজ পাওয়া সম্ভব। এই কারণেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের চেষ্টাই জীবনের যেন একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। যারা যোগ্যতা অর্জন করে এবং যারা করে না, যারা প্রতিযোগী হতে সক্ষম হয় এবং যারা হয় না, যারা প্রতিযোগিতায় জয়ী হয় এবং যারা হার মানে— যেন এই দুই দলে গোটা সমাজই বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারই ফলশ্রুতি দমন প্রতিদমন, দ্বেষ, আক্রোশ, নিয়ত বিবদমান রেষারেষি সমাজে, আর্থিক অবস্থায় অপরিসীম বৈষম্য আর্থিক ব্যবস্থারই ফল।

উপরিউক্ত দুই তন্ত্রেরই ভালোমন্দ দুটি দিক আছে। উভয়ের মৌলিক স্বাতন্ত্র্য এই যে একতন্ত্রে সর্ববিষয়ে অতীব রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণই ব্যক্তি-জীবনে, অপর তন্ত্রে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি-স্বাধীনতা অধিকাংশ বিষয়ে। এক এক শ্রেণীর এক এক অবস্থার মানুষের কাছে এই দুই আদর্শ বিশেষ অর্থবহ। জটিল প্রশ্নে ভারাক্রান্ত না হয়েও আজকের দুনিয়ায় সাধারণ মানুষের মনে এই চিন্তা বলবৎ যে, সমস্যাসঙ্কুল জনভারাক্রান্ত দেশ-গুলিতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিই তুলনামূলকভাবে শ্রেয়। কিন্তু কীভাবে সেই নিয়ন্ত্রিত অবস্থা সমাজে প্রবর্তিত হবে তা কার্যত নির্ভরশীল বিশেষ বিশেষ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার উপর এবং দেশের মানুষের চারিত্রিক মানসিক শক্তি শৃঙ্খলাবোধ, দলবদ্ধ সংহতি ও সুপরিচালিত নেতৃত্ব, প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার উপর। আধুনিক যুগের ইতিহাসে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলির আদর্শ প্রবর্তনের কঠোরতায় দমননীতি যে আকার নেয় এবং পৃথিবীর বৃহৎ শক্তিগুলি দুই দলের জোট বেঁধে একে অপরের সঙ্গে যেভাবে নিষ্ঠুর নির্মম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

মুখর হতে দেখা যায়, তাতে আশঙ্কা হয় দরিদ্র দেশগুলিতে আদৌ আর্থিক অবস্থার কোন সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব কিনা। এমন সংশয়ও জাগে যে, এক দেশে যেভাবে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে সবদেশে সেইভাবেই সমাজ পরিবর্তনের চেষ্টা কতটা কার্যত বাঞ্ছিত। বিভিন্ন দেশে নিয়ন্ত্রণের যে রীতি পদ্ধতির পরিচয় আমরা পাই, বিশেষ বিশেষ নীতি আরোপের যে দৃষ্টান্ত আমরা দেখি তাই চূড়ান্ত এবং মানবকল্যাণের জন্য একান্ত বলে বিশ্বাস হয় না। সমগ্র সমাজের শুভবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত পরিমিতি-বোধের একটি পথই শ্রেয় বোধ হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে দেশের শাসন পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাহলে সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা সেভাবে সম্ভব নয় কেন, এই প্রশ্ন জাগে। শান্তিপূর্ণভাবে এই নীতির প্রতিষ্ঠা কতদূর সাধ্য, সমাজ পরিস্থিতির স্থিতাবস্থার জন্য অনুকূল মানসিকতা সৃষ্টি কতদূর সম্ভব বা আদৌ সম্ভব নয়— এই সকল প্রশ্ন প্রচ্ছন্নভাবে সামাজিকের চিন্তায় আসে।

কোন কূটতর্কে প্রবেশ না করেও সামাজিক আত্মসমীক্ষার পথে সমাজ-সমীক্ষা করতে পারেন। এই ভাবে সমাজ মানসিকতা সৃষ্টির অনুকূল একটি পথের অনুসন্ধানেও প্রবৃত্ত হওয়া যেতে পারে। যারা বঞ্চিত, সে যে কারণেই হোক, তাদের ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। এই বঞ্চনা দূর করার উদ্দেশ্যেই সমাজে আর্থিক অবস্থা পরিবর্তনের দাবী। আবার সেই পরিবর্তনকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্যই সমাজ মানসিকতায় সমতা থাকা প্রয়োজন। আমরা দেখি অভাব না মিটলে মানুষ মরীয়া হতে পারে, আবার অভাব মিটলেও লোভের তাড়নায় মানুষ তাড়িত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা— ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য— অপরের জীবনযাত্রা নিয়ত আমাদের লুব্ধ করে। আমরা অভাবেও ভুগি, লোভও আমাদের ভোগায়। শুধু আর্থিক নিয়ন্ত্রণ, ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন হ্রাসই কি সমাজে সমতা এনে দিতে পারে? দাবী প্রতিষ্ঠা, মূল্য আদায় সব মানুষ কি সমানভাবে করতে পারবে? অথবা মানবজীবনের মূল্যবোধের ধারণাই মানুষকে এমন পরিণতি দেবে যাতে সমাজজীবনে সমতা রক্ষা সম্ভব? কিন্তু কীভাবে এবং কী মূল্যবোধের ধারণায়? এই প্রশ্নগুলির একটি সহজ উত্তর হতে পারে যে, স্বল্পে সন্তোষ ও পরিমিতিবোধের শিক্ষায় বহু সমস্যা আয়ত্তে আনা সম্ভব। অর্থাৎ সমগ্র

সমাজের অভাবমোচনের চেষ্টায় সমবেতভাবে আত্মনিয়োগ।

ব্যক্তি-মানুষের বল-বুদ্ধি-শক্তি-সামর্থ্য প্রয়োজনের তারতম্যের কথা চিন্তা করে সমাজে নানা প্রকার বিধি-ব্যবস্থা মানবের শুভবুদ্ধি-প্রসূত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অবস্থার বৈষম্য দূরীকরণের কামনা, দারিদ্র্যমোচনের চেষ্টা, মানব-স্বভাবের শুভবুদ্ধি থেকেই উৎসারিত। কেবল একটি সমাজ নয়, সর্বমানবের কল্যাণকামনা মানবত্বের নিদান। আবার ধনভোগের ইচ্ছা, লোভ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধ মানুষের স্বভাবগত। অথচ মানবশিশু মাত্রেই কোন একটি বিশেষ সংস্কার নিয়ে জন্মায় কিনা বলা কঠিন, তবে পরিবার-সমাজ-পারিপার্শ্বিক জীবন শিক্ষা তাকে বিশেষ মানসিকতা গঠনে সহায়তা করে একথা নিশ্চয় বলা যায়। মানবের শুভবুদ্ধির উদ্বোধনে এই কারণেই প্রাচীন সমাজ নীতি ও ধর্মের অনুশাসন অনু-প্রেরণায় বিশ্বাসী ছিল। সেই বিশ্বাসের সুফল-কুফলের আলোচনা এখানে উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক মানুষের ঐশী (বিশ্বাস) আস্থাহীন (অপ্রয়োজন বিধায়) মানসিকতাবোধের সাফল্য নির্ণয়ও উদ্দেশ্য নয়। ভালোমন্দ প্রতিপন্ন করা নয়, বরং একটি সমীক্ষার নিরিখে পথের অনু-সন্ধান এই নিবন্ধের প্রচেষ্টা। রাজনৈতিক, দার্শনিক বা সমাজনৈতিক পাণ্ডিত্যের দাবীহীন এই প্রচেষ্টা অনেকটা অন্ধকারে হাৎড়ে হাৎড়ে পথ খোঁজার মতো। আকস্মিক বিদ্যুতের ঝলকানিতে ক্ষণিক দৃষ্টি বিভ্রান্তি হলেও দূর পথের নিশানা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

দেহ-মন উভয়ের পুষ্টিসাধনে ব্যক্তি-জীবনের সমৃদ্ধি তথা সমাজ-জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। সমগ্র সমাজের অন্তর্নিহিত ও সম্মিলিত শক্তি বুদ্ধির এমনভাবে পরিচালনা চাই যাতে সমগ্র সমাজের দেহ-মনের পুষ্টির সম্ভাবনা বলবৎ থাকে। বাহুবল নয়, বুদ্ধিবল মানসিক বলই সমগ্র কল্যাণবোধের প্রেরণা ও উদ্দীপনা। একক সমৃদ্ধি নয়, সমগ্রভাবে অগ্রসর হওয়া— সে জীবন-সংগ্রাম— বাঁচার লড়াই, ক্ষুধায় রোগে-ভোগে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যেমন, বিজ্ঞান-শক্তি প্রয়োগে, মানস উন্নয়ন শুভবুদ্ধির উদ্বোধনেও তেমনি ; নিয়ত সম্মিলিতভাবে। এ-যুগ একক প্রচেষ্টার যুগ যেমন নয়, একক সমৃদ্ধিরও নয়। অথচ ধনতান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা ও শিক্ষাদর্শ বাস্তব-ভাবে ব্যক্তি-জীবনের সমৃদ্ধিকেই একান্ত বলে বুঝতে শেখায়, পূর্ণমাত্রায়

অনুকূলতা দেয়। উপরন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় সমাজে ধর্মভাবের যে গুরুতর প্রভাব ছিল সেই প্রভাব সম্পূর্ণ শিথিল হওয়ায় ব্যক্তিবাদ-ব্যক্তিভোগ আত্মতন্ত্রবাদ অধিকাংশ মানুষকে এযুগে চূড়ান্তভাবে আচ্ছন্ন করেছে।

কারণ ও ফলাফলের সতত অবস্থিতির মতো সমাজে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, প্রগতি নিম্নগতি, প্রগতিশীল শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির উপস্থিতি, পুনরপি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গ্রহণের শক্তি বর্জনের শক্তি, অগ্রসরণের শক্তি, অনুসরণেব শক্তি সামর্থ্য ভেদ, গুণগত বুদ্ধিগত ভেদ, প্রকৃতিগত প্রবণতা ভেদ বিদ্যমান। কোন অবস্থাতেই অগ্রগতি নিয়মমাফিক বা ফলভোগ সম-ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। তথাপি সম্মিলিতভাবে অগ্রসরণ, কোটি কোটি বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনামুক্তি, মানব অধিকার দানের স্বীকৃতি, প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ— এই আদর্শে পূর্ণ আস্থার মনোভাব সমাজে বজায় থাকাই সমবেত কল্যাণের পক্ষে উপযোগী। আজকের বিজ্ঞান-প্রত্যয়িত জীবনবোধ মানুষের এই মনোভাব বজায় রাখার সহায়ক। যন্ত্রপ্রযুক্তি-বিদ্যা একদিকে যেমন মানুষের বাস্তব চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপায় বৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি অপরদিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ব্যক্তি-শক্তি, ব্যক্তি-জীবনের অকিঞ্চিৎকরতার প্রত্যয়ও এনে দেয়। এই প্রত্যয় ধর্মবিশ্বাসেও একভাবে আসে। পার্থক্য এই যে, ধর্মবিশ্বাস আবেগ-জড়িতভাবে মানবসত্তাকে আচ্ছন্ন করে ; বিজ্ঞান বুদ্ধি ও এষণায় দৃষ্টির স্বচ্ছতা এনে দেয়। কাজেই ধর্মশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষা পরস্পর-বিরোধী মনে না করে যদি পরিপূরকভাবে গ্রহণ করা যায় তবে মানব-সমাজের কল্যাণ হয়— ধর্ম ও বিজ্ঞানের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যক্তিবাদী স্বার্থতন্ত্রতার মোড় ঘোরাতে পারে। ধর্ম বলতে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস, পূজা অর্চনা, নীতি নিষেধে পর্যবেসিত জীবনচর্চা না বুঝে, যদি আত্মবিস্তার সন্তোষ সংযম অহিংসা ও শৃঙ্খলাবোধের জীবনচর্চা বলেও বুঝি তবে সহজভাবেই প্রতীতি হয় যে, এ-শিক্ষা একটি মানসিক পর্যায়ে উন্নয়নের শিক্ষা। জ্ঞানবিজ্ঞান মানুষকে সেই বিস্তৃতির দিকেই অগ্রসর করে দেয়। বোধ এবং বুদ্ধির চর্চায় অনুসন্ধিৎসু মনের সংশয় জিজ্ঞাসার প্রক্রিয়াতে যে পথের নিশানা মেলে তা হিংসাকে পরিহার করে, এমন আশা নিশ্চয় করা যায়।

আধুনিক সভ্যতার নিদান যে নিরতিশয় আত্মকেন্দ্রিকতা, তৈজসপত্র

সংগ্রহের বাহুল্য, মুদ্রাসঙ্গতির মানে যে জীবনমান অর্থাৎ বাহ্যিক জীবনের অবস্থা ও মানসিক ভাব এই দুয়ের যৌগিক উপাদান-আশ্রিত যে অবস্থা তারই একটা সীমারেখা কোথাও আমাদের প্রয়োজন, একটি আদর্শে লক্ষ্য স্থির থাকা প্রয়োজন। সম্পদের ধারণা নিয়ে মানবশিশু জন্মায় না। পরিবার-পরিবেশ-সমাজই তাকে শেখায়, মানসিক সম্পদের মূল্য ও বস্তু সম্পদের অধিকারের মূল্যবোধ সমাজই তার মনে জাগায়, মুদ্রার বিনিময় মানে জীবনযাত্রার মান, সে-চেতনাও ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জীবনের অভিজ্ঞতা বোধবুদ্ধি শিক্ষার মার্জনা ব্যক্তিকে গ্রহণ-বর্জনের ক্ষমতা দেয়, এগুলিই ব্যক্তির মানসিক পরিণতির সহায়ক। সন্তোষ ও নিবৃত্তি নিজের মনের তৃপ্তি ও সুখবোধের উপর।

প্রত্যেকেই আমরা শিক্ষা পাই আমাদের পিতামাতা পরিবার থেকে, আমাদের স্ব-স্ব সামাজিক স্তরে প্রচলিত শিক্ষা অনুযায়ী এবং প্রাতিষ্ঠানিক যে শিক্ষা আমাদের পক্ষে সুগম সেই অনুযায়ী। সুগম প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন অক্ষর পরিচয় করানো প্রাথমিক রীতি, তেমনি সামাজিক স্তরভেদ নির্বিশেষে, ব্যক্তির বুদ্ধি মেধা রুচির পার্থক্য নির্বিশেষে জীবনের কতগুলি ধ্যান-ধারণা আদর্শের শিক্ষাও একান্ত কাম্য। অর্থ ও বস্তু সম্পদের অধিকার-প্রসূত, ক্ষমতা ও শক্তির ঐকান্তিকতা-জনিত ব্যক্তি-গৌরবের পরিচয় আত্মশ্লাঘা অর্থহীন মনে হতে পারে তখনি, যখন অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতে বিস্তৃত এই সংসার চক্রের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি-জীবনের অকিঞ্চিৎকরতা, অখণ্ড মানব-জীবনের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি-জীবনের ক্ষণ-উপস্থিতির তুচ্ছতা উপলব্ধি হয়। ধর্মশিক্ষা এই অন্তর্দৃষ্টি জাগতে সহায়তা করে, এবং সমাজে ব্যক্তির দেয়, কৃত্য, কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে। সমভাবে যদি আমাদের দেশ-প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য, সমাজ-জীবনের আদর্শ, জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য ও মূল্যবোধের ধারণা দিতে সক্ষম হয় তবে আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের পরিবর্তন ও মানবের সম-অধিকার তত্ত্বেবিশ্বাস সমাজ-মনে সহজেই ব্যাপক হতে পারে। মানবের সম-অধিকারবোধ সর্বমানবসম্পর্ক-বোধের অনুষঙ্গ রূপে ধর্মদেশনার দ্বারা যত সহজে জাগানো যায় কেবলমাত্র ঔচিত্যবোধে ততটা হয় না।

বিশেষত মতবাদ অর্থাৎ রাজনৈতিক মতবাদ আরোপ, শাসনতান্ত্রিক রদবদলের চেষ্টায় ক্রোধ-সংঘর্ষ হিংসার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই অবস্থা এড়াবার জন্যই সমাজ-মানসিকতা প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টি জাগানোর আবশ্যকতা।

এই প্রসঙ্গে human rights-এর কথা উল্লেখ করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে জাতিসংঘের উদ্যোক্তাগণ বিশ্বশান্তির যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মূল কথা হ'ল মানবের অধিকার-রক্ষা ও মুক্তির স্বপ্ন সহজ সফল করা। মানবের জন্মগত কতগুলি অধিকারের স্বীকৃতি ঘোষণা করা। সকল দেশ সকল রাষ্ট্র প্রতিটি মানুষের নাগরিক, অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার বজায় রাখবে। ক্রমে শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার, আদর্শ ও শান্তিবাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, জাতিবিদ্বেষ দূরীকরণ, ঔপনিবেশিকতার অবসান, সংঘবদ্ধ আত্ম-প্রত্যয়ের স্বীকৃতি, উদ্বাস্তু-সমস্যার দায়িত্ব গ্রহণ, দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, শিক্ষা ও পেশার ক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে ভেদ দূরীকরণ, ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে স্বীকৃতি এই আন্তর্জাতিক সংস্থা ঘোষণা করে। ব্যাপকভাবে মনুষ্য-সমাজে মানসিক প্রস্তুতি না থাকলে কোন স্বীকৃতিই আশানুরূপভাবে কার্যকরী হওয়া দুষ্কর।

মানুষ জন্মগতভাবে মুক্ত, সকলেই সমান সম্মানে ও ব্যক্তি-অধিকারে অর্থাৎ মনুষ্যজন্মের ফলে মানবিক অধিকারে সকলে সমান। জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম রাজনৈতিক মতবাদ, বিত্তবান কি নিঃস্ব, উচ্চ কি নীচ, সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে বেঁচে থাকবার, মুক্ত থাকবার, নিরাপত্তা পাবার, ব্যক্তিত্ব বজায় রাখবার অধিকার প্রতি ব্যক্তি-মানুষের। আইনের চোখে প্রত্যেকে সমান। দেশের আইন বিধি-ব্যবস্থা প্রতি ব্যক্তিকে সমানভাবে রক্ষা করবে। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি পাবার অধিকার সকলেরই। প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র্য স্বকীয়তা বজায় রাখবার, পরিবারের সম্মান সম্ভ্রম বজায় রাখবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের যে-কোন স্থানে মুক্তভাবে চলাফেরা করবার অধিকার আছে, অপর দেশে গমনাগমন বসবাসের অধিকারও আছে, আর আছে নিজ দেশে প্রত্যাগমনের অধিকার এবং জাতীয়তা পরিবর্তনের স্বাধীনতা আছে। যে-কোন জাতি বর্ণের মেয়ে পুরুষের বিবাহবন্ধনে বাধা নেই, বিচ্ছেদের স্বাধীনতা স্বীকৃত। ব্যক্তির ধনসম্পত্তি ভোগের অধিকার

স্বীকৃতি পেয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্ম অনুসরণের স্বাধীনতা, প্রচার পূজা-অর্চনার স্বাধীনতা, সভায় যোগদান, রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ, ইত্যাদি স্বীকৃত। দেশের কর্মব্যবস্থায় যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই সমান অধিকার। সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রত্যেকের, কেননা এই আর্থিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অধিকার মানবিক সম্মান রক্ষায়, ব্যক্তিত্ব বিকাশে একান্ত অপরিহার্য। প্রত্যেকের কাজ পাবার ন্যায় সঙ্গত দাবী ও অধিকার আছে, বেকার অবস্থায় আর্থিক সহায়তা লাভের দাবী ন্যায়সঙ্গত। শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত বেতনপ্রাপ্তির অধিকার প্রত্যেকের, যেন সভ্য সুস্থভাবে দিনাতিপাত করা যায়। সমান শ্রমের বিনিময়ে সমপরিমাণ বেতনপ্রাপ্তিব অধিকার নারীপুরুষ নির্বি-শেষে কাম্য। অবকাশযাপন, বিশ্রাম-উপভোগের অধিকার, কাজের পর সবেতন ছুটির অধিকার সকলের। শ্রমিক-সংস্থায় যোগদান ও ধর্মঘটের স্বাধীনতাও সকলের। সুস্থভাবে খেয়ে-পরে জীবনের একটা মান বজায় রাখবার অধিকার, আহার পরিধেয় বাসস্থান, রোগের চিকিৎসা পাবার অধিকার সকলের। প্রাথমিক শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও আবশ্যিক। গুণ-গত যোগ্যতার বিচারেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভ ঘটবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে মানবের পূর্ণবিকাশ— ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার। সমাজের প্রতি ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য আছে। সর্বোপরি, একের ন্যায়সঙ্গত দাবী, প্রতিষ্ঠা, সামাজিক অবস্থা যেন অপরের স্বাধীনতা সম্মান অধিকার ক্ষুণ্ণ না করে— স্বাধীন সমাজের সাধারণ কল্যাণ-ব্যবস্থা বিধিবিধান শান্তি-শৃঙ্খলা নৈতিক মান যেন ব্যাহত না করে।

উপরিউক্ত বিবরণই human rights-এর মূল কথা। মানুষের সম্মান সম্ভ্রম জাগতিক জীবনের নানাবিধ প্রয়োজন স্বীকারেরই অভিব্যক্তি এই ঘোষণা। যদিও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে মূলত নগরকেন্দ্রিক শিল্প-পণ্যোৎপাদী সমাজ তথা সভ্যতার মুখ চেয়েই এই ঘোষণা। আর বাহ্যিক-ভাবে বহু দেশের সম্মতি সায় থাকলেও মুষ্টিমেয় মানবতাবাদীই এই স্বীকৃতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করে কার্যকরী করার চেষ্টায় ব্রতী থাকবে। কেননা বাহ্যত স্বীকৃতি ও কার্যত বাস্তবে রূপায়ণ ঠিক এক ব্যাপার নয়। দুঃখজনক অসঙ্গতি নিয়তই দৃষ্ট হয়। কী ধনী কী দরিদ্র সব দেশেই। অথচ মানব অধিকারের এই ঘোষণা - ভয় থেকে অভাব অনটন বুভুক্ষা, অন্যায়ের অত্যাচার থেকে মুক্তির সনদ। আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার বলে

মানুষের রাজনৈতিক আর্থিক সামাজিক সাংস্কৃতিক উন্নয়নের অধিকার বর্তায়। কোনভাবেই কোন ব্যক্তি যেন তার রুজি-রোজগার আয় অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়। রাষ্ট্রের তথা সরকারের বিশেষ দায়িত্ব প্রত্যেক সামাজিকের নাগরিক কল্যাণবিধানে, মানবিক সম্মান রক্ষায়। খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বণ্টন ব্যবস্থায় সর্বাধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য-কর্তব্য। ভূমি সংক্রান্ত সর্ববিধ সংস্কারসাধনের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদ বৃদ্ধির আত্যন্তিক চেষ্টা প্রয়োজন, পুষ্টি-সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বাধুনিক জ্ঞান আহরণ করা অতীব প্রয়োজন। শিশুর সুস্থতা, জন-স্বাস্থ্যরক্ষা, নির্মল মুক্ত স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ সৃষ্টি, রোগের উপশমের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও শিক্ষা— যে-শিক্ষা ব্যক্তিকে সমবেতভাবে সমগ্র-কল্যাণের পথে পরিচালিত করে, এমন শিক্ষা – প্রচলনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা— যথা, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান-বিষয়ক, শিল্প-সংক্রান্ত, প্রযুক্তিবিদ্যাবিষয়ক, ইত্যাদি যেন সকলের পক্ষে সুগম হয়। কোনপ্রকার বিদ্বেষ— জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ— আইনের দ্বারা রোধ করা, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শিশুর রক্ষা, বয়স্কের রক্ষা, ভোটদানের অধিকার রক্ষা – এসব-কিছু দায়িত্ব রাষ্ট্রের।

এর পরেই আসে বিশেষভাবে শিশুর অধিকারের কথা। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মতোই ব্যক্তি হিসাবে শিশুরও দাবী আছে সমাজে। অধিকন্তু তার শারীরিক ও মানসিক অপরিণত অবস্থার কথা চিন্তা করে সমাজ তাকে সর্ববিষয়ে রক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং ভবিষ্যতের দায়িত্বপূর্ণ সুস্থ সবল নাগরিক করে গড়ে তুলবে। বিশেষভাবে বিবৃতিতে আছে স্বাস্থ্য-রক্ষা, পরিমিত সুসম খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার বিষয়ে সমাজের পূর্ণ দায়িত্বের কথা।

মানবের জন্মগত অধিকারের ঘোষণা শিশুর অধিকারের ঘোষণা সমাজ তথা রাষ্ট্রের দায়িত্বের এই স্বীকৃতি মানবসমাজের মুখপাত্র জাতি-সংঘের শুভ ইচ্ছার মানবিক দায়িত্ববোধের অভিব্যক্তি। এই স্বীকৃত নীতি তথা এই বিবৃতি ঠিক আইনের অধিকার নয়। তথাপি প্রকৃত অর্থে প্রতি সমাজ প্রতি রাষ্ট্রের নৈতিক দায়িত্ব এই স্বীকৃতিতে যারা স্বাক্ষর দিয়েছে

—এই বিবৃতি অক্ষরে-অক্ষরে আন্তরিকভাবে অনুসরণ করা।*

প্রশ্ন এই যে, সত্যই কি দেশে দেশে এই শুভ ইচ্ছা সৎ প্রচেষ্টা সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত? আজ জাতিসংঘ সমগ্র মানব সমাজের কথা ভাবে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীন সত্তা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক ঘনিষ্ঠ আদান-প্রদান ব্যতীত আজকের যুগে কোন দেশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন দরিদ্র দেশের আম-জনতার কাছে এসব সংবাদ কী পৌছায়? কীভাবে পৌছায়, কতটুকুই বা, কী মূল্য তার! এই মুহূর্তে উগাণ্ডায় সুদানে কাম্বোডিয়ায় বুভুক্ষু রুগ্ন মানুষের দুর্দশা মৃত্যুর জন্য অপেক্ষার দৃশ্য যেমন চোখে দেখা যায় না, তেমনি আমাদের দেশের বহু মানুষের জন্মাবধি দুর্দশাময় যে-জীবনচিত্র তা দেখেও সমাজের রাষ্ট্রের সৎ প্রচেষ্টার প্রতি বিশ্বাস রাখা কঠিন হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় রোগ মহামারীর প্রকোপের সময় নিদারুণ খাদ্যাভাবে কিছু সাহায্য, প্রতিকারের ব্যবস্থা দেখে মানুষ। কিন্তু তেমন দুর্যোগ না হলে, মানুষের অভাব মোচনের তৎপরতার পরিচয় বিশেষ মেলে না। রাজনৈতিক নেতাদের মুখে জনসভায়, নির্বাচনী-আসরের মুখোমুখি কখনো উত্তেজিত দাম্ভিক প্রতিশ্রুতি, কখনো ভাসা ভাসা বুলি বুক্‌নি যা আমরা শুনি বা আমলাতন্ত্রের মারফৎ যে-ধরনের ব্যবস্থা আমাদের কাছে পৌছায় তাতে আমাদের বিশেষ কিছু উপকার বা স্থায়ী সুরাহা হয় না। সাধারণ দুঃস্থ মানুষ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে।

বেশি জানলে বুঝলে নিচুতলার মানুষেরা সচেতন হয়ে উঠবে, আর তাতে উপরতলার মানুষের কায়েমী স্বার্থের ভিত নড়ে যাবে এমন আশঙ্কা যেমন নির্বুদ্ধিতা, তেমনি আন্তর্জাতিক সংস্থার পরিচয় জ্ঞানে সাধারণের মনে দেশের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের লাঘব ঘটবে এমন আশঙ্কাও অমূলক। বরং নিচুতলার মানুষের আত্মপ্রত্যয় ও সচেতনতা জাগলে সর্বপ্রকার পরিকল্পিত কাজ সুষ্ঠুভাবে হবার অধিকতর সম্ভাবনা, নানা-জাতীয় অপপ্রচার, অপচয়, দুষ্কৃতি দমিত হবার সম্ভাবনা, দায়িত্বভার ন্যস্ত শ্রেণীর বিশ্বাস ও আস্থা অর্জনের চেষ্টায়, দক্ষতা ও পটুতা অর্জনের চেষ্টায়, নিজেদের ত্রুটি ও গলদ দূর করার চেষ্টায় অধিকতর তৎপর

হবার সম্ভাবনা। অপরপক্ষে আন্তর্জাতিক সংঘের পরিচয় সূত্রে বিভিন্ন দেশের মানুষের প্রতি বিশ্বাস ও প্রীতির ভাব গড়ে ওঠা সহজ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় ১৯৭৯ খৃষ্টাব্দ ছিল বিশ্ব-শিশুবর্ষ। দেশে সভা-সমিতি হয়েছে। প্রচলিত উন্নয়ন রীতি অনুযায়ী পার্ক, ইস্কুলবাড়ি, গ্রন্থাগারে সংযোজন ইত্যাদি বড় শহরে জেলা শহরেও হয়েছে। কিন্তু মূল যে-সমস্যা—বহুশিশুর দৈহিক পুষ্টির জন্য পরিমাণ-মতো খাদ্য, শীতাতপে রক্ষার জন্য পরিধেয়, বাসের জন্য আশ্রয়, রোগ নিরাময়ের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, সেদিকে রাষ্ট্রে কতটা বাস্তব সমাধানের চেষ্টা হয়েছে তা বিবেচনা-সাপেক্ষ। যদি স্মরণ রাখা যায় যে দরিদ্র দেশগুলিতে ১৫ মিলিয়ন শিশু প্রতিবছর মারা যায় অপুষ্টির জন্য, সামান্য ধরনের চিকিৎসার অভাবে ঔষধের অভাবে ; ১৫৬ মিলিয়ন কিশোর বালক-বালিকা বাস করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, উপযুক্ত খাদ্য জোটে না ; তাহলে আর গুরুত্ব এড়িয়ে থাকা যায় না। একথাও অস্বীকার করা যায় না যে মানবতা-বোধ ও ধর্মবোধ সমাজে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর তখন কি মনে প্রশ্ন জাগে না ভারতবর্ষে এই দুর্ভাগারা সংখ্যায় কত? রাষ্ট্র কবে এই প্রাথমিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবে, বাস্তবভাবে দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হবে? যেখানে অভাব অনটন সেখানে কেনই-বা শিশুর জন্ম হয়, হায়, যদি জন্ম হয়ই কেনই-বা এমন দুর্দশা? প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই? ভাগ্য ও ভগবান-নির্ভরতা যদি এই সভ্যতা কাটিয়ে উঠে থাকে তবে হতাশা ও দুর্দশা থেকে মুক্তির বাস্তব উপায় ও আত্মপ্রত্যয় জাগানোর প্রতিশ্রুতি কি রাষ্ট্রই দেবে না?

এ-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে সব সমাজেই দরদী সামাজিকেরা পথ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, নিঃস্বার্থ সেবাব্রতীরা সমাজসেবা করে চলেছেন। কিন্তু নিবন্ধের শুরুতেই উপস্থাপনা করার চেষ্টা করেছি যে এযুগ একক প্রচেষ্টার যুগ নয়। আমাদের উপরি-উক্ত প্রশ্নগুলির একটি সরলীকৃত উত্তর মিলতে পারে— শিক্ষার দ্বারা অজ্ঞতা দূর করা, আত্মপ্রত্যয় জাগানো, সংঘবদ্ধ জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও ব্যক্তি-অধিকারের ব্যক্তির দায়দায়িত্বের চেতনা জাগানো। বলাই বাহুল্য যে এই চৈতন্য-উদ্বোধনের চেষ্টায় ধর্মঘট হিংসাত্মক কার্যকলাপ বা ধ্বংসাত্মক কোন পরিকল্পনা বা গোষ্ঠীস্বার্থমূলক কার্যকলাপের কোন সম্বন্ধ নেই। সমাজে প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য যতদিন না স্থিরীকৃত

হবে ততদিন জাতীয় জীবনে সামগ্রিক উন্নয়ন পিছিয়েই থাকবে। আপামর জনজীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই বাস্তবভাবে ব্যক্তি-স্বার্থের সঙ্কোচ যেমন প্রয়োজন, তেমনি সেই অবস্থায় উপনীত হবার উদ্দেশ্যে সমাজ-মানসিকতা গঠনের জন্য ধর্ম ও বিজ্ঞানের যুগ্ম অন্তর্দৃষ্টি, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতার জ্ঞান একান্তভাবে প্রয়োজন।

নিঃসন্দেহে দেশের শিক্ষাবিদগণ পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে জনজীবনে সমাজবোধ, নাগরিকতাবোধ, জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টায় রত আছেন। NCERT নানারকম আলোচনা প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। সংবিধানে স্বীকৃত সমানাধিকার, সমান সুযোগ, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, নাগরিকত্ব, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায্য বিচার, রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, সংখ্যালঘুসম্প্রদায়ের দাবীরক্ষা, সেকুলরিজম, ইত্যাদি বিষয়ের পঠন-পাঠনের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সেকুলরিজম বলতে বুঝতে হবে ধর্মীয় সহনশীলতা, সর্বধর্মে শ্রদ্ধা, বিপজ্জনক উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কর্মতৎপরতা থেকে দূরে থাকা, ইত্যাদি।

কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে শিক্ষাব্যবস্থায় বিষয়শিক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের দিকে যতটা গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ; আর্থিক চেতনা, ব্যক্তির দায়দায়িত্ব, ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক নির্ভরতা, সর্বোপরি ব্যক্তিস্বার্থের সংযমনের শিক্ষায় তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপিত হয় নি। যেন সেসব চিন্তা বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই আবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন বাস্তব দিকটির প্রতি উপেক্ষা তেমনি মানসিক সুষমতা গঠনের প্রতি উপেক্ষা থাকায় শিক্ষা শুধু সংবাদ আহরণ পরিবেশনের নামান্তর হবে, এ আর আশ্চর্য কি? খাদ্য-স্বাস্থ্য-বিশ্বাস-আশ্বাস-কর্তব্য-প্রয়োজনীয় ভিত্তিমূলক জীবনের এই মূল কতগুলি দিকে আদৌ নজর না দেওয়া, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করা, বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না করা যেন ভূতপূর্ব বৈদেশিক শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ। জাতীয়তাবোধ, সমগ্র সমাজবোধের উন্মেষ বিকাশের জন্যই নাড়ির যোগ কোথায় তা জানা দরকার উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে।

শিক্ষা অর্থে গৌণত লেখাপড়া শেখা, অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে লিখতে পড়তে শেখা, কিছু সংবাদ সংগ্রহ, কোন একটা বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা অর্জন যেমন বোঝায়, তেমনি মুখ্যত মানসিক পরিণতিলাভ বোঝায়। যুক্তিসিদ্ধ বিচার, বিবেচনা-বুদ্ধি, পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সচেতনতা, সমাজের

মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে শ্রদ্ধা— এসব-কিছুর সমন্বয়ে যে মানসিক সুষমতা সেই প্রাপ্তিই শিক্ষা। আবার কতগুলি প্রত্যয়িত বিশ্বজনীন নীতি-ন্যায় প্রীতি শান্তি-পরিমিতি-সৌন্দর্যবোধের উদ্বোধনের দ্বারা ব্যক্তির আত্মজাগরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিনিময়ে আর্থিক সমৃদ্ধি সচ্ছলতা লাভ— এসবই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

আজ আমাদের সমৃদ্ধির ধারণা বস্তুমুখী। শিক্ষাও একঝোঁকা। আমাদের লক্ষ্য মূলীভূত একটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে, বৃত্তিমূলক কর্মপটুতায়, বিশেষ-বিশেষ পেশায় যার একমাত্র উদ্দেশ্য বিনিময়ে অর্থ-উপার্জন।

এযুগে বিজ্ঞান, যন্ত্র, প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের শক্তিবর্ধন করেছে, এই শক্তি দিয়েছে আত্মপ্রত্যয়। কাজেই আত্মপ্রত্যয়ী বাস্তবধর্মিতা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই আত্মপ্রত্যয়ী বাস্তবধর্মিতা ও পরিণত মানসিকতা লাভের যে আঙ্গিক উভয়ের সমন্বয় শিক্ষা ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন। সমৃদ্ধ শ্রেণীর দৃষ্টি পরিবর্তন ও আম-জনতার আত্মজাগরণ এই দুই পরিপূরক মনোভাব সমাজ অগ্রগতির লক্ষণ সূচিত করে— শ্রেণী-নির্বিশেষে প্রতিশ্রুতি রক্ষার দায়িত্ব ও সংকল্পের দৃঢ়তা শিক্ষার দ্বারাই জাগা সম্ভব। ক্ষুৎপিপাসা, আশ্রয় ও রোগের উপশমের, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে কিছুটা রক্ষা পাবার মতো অবস্থা মানুষের আয়ত্তে। অপেক্ষা, সমবেত সহযোগী প্রচেষ্টা। সদ্ভাব, সদিচ্ছা, ব্যক্তিস্বার্থ, সঙ্কোচ ইত্যাদি শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে সমাজ সমবেতভাবে অগ্রসর হতে পারে— জীবনের কতগুলি মূল সমস্যার সমাধানে। জাতিসংঘের ঘোষণা এই আশা ফলবতী করার একটি প্রচেষ্টা। প্রত্যেক দেশের সমাজে সক্রিয়তা না থাকলে দরিদ্র একদা ঔপনিবেশিকতার আওতায় থাকা দেশগুলি লক্ষ্যে উপনীত হওয়া দূরে থাকুক হতমান দারিদ্র্য ও বিবদমান জটিলতা থেকে ও মুক্তি পাবে কিনা সন্দেহ।

জাতীয়-জীবনে শিক্ষার গুরুত্বের কথা মহাজনেরা বলে গিয়েছেন। বর্তমান নিবন্ধে অবতারণার চেষ্টা এই যে আজকের যুগসন্ধিক্ষণে সমাজ মানসিকতা প্রস্তুতির ভিত্তিস্থাপন রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অন্যতম লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। পুনরুক্তি করি যে এযুগে ব্যক্তি প্রচেষ্টায় বৃহৎ সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো সহজ নয়। দ্বিতীয়ত, বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ খুব অল্পসংখ্যকের ভাগ্যে জোটা সম্ভব।

কাজেই জনশিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থায়, প্রাতিষ্ঠানিক সর্বপ্রকার শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলি মূল অনুস্যূত থাকা দরকার— যা ব্যক্তি ও আঞ্চলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র সমাজে একটি সমদৃষ্টিভঙ্গি আনয়নের অনুকূল।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে বক্তব্য রাখার চেষ্টা হয়েছে যে, সমাজে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণে সমাজ মানসিকতার প্রভাব সৃষ্টির গুরুত্ব সমধিক, জাতিসংঘের ঘোষিত হিতৈষণার সফলতা এই প্রভাবের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল; সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন ও অনুকূল মানসিকতা প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে অনুকূল শিক্ষা ব্যবস্থাই অন্যতম পন্থা — কি স্বাধীন ভারতবর্ষে, কি ধনী দরিদ্র সকল দেশে; এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে লব্ধ অন্তর্দৃষ্টির যুগ্ম শিক্ষা বিস্তার এই পরিবর্তন— অনুকূলতার পক্ষে বিশেষ কার্যকরী শিক্ষা বলে বোধ হয়। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের আশ্রয় ব্যতিরেকেই সামাজিক এ-বিষয়ে অভিনিবেশের যোগ্য। এইটিই দুই চরম পথের মধ্যবর্তী তৃতীয় পন্থা হতে পারে।

নিবন্ধের এই বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অবতারণায় সমীক্ষার চেষ্টা করা যাক:

> বাহ্যিক উন্নয়নের রূপ,
> বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা,
> সচ্ছল ও দরিদ্র-সমাজে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য,
> বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত চাকরির ধারণা পরিবর্তনের দ্বারা সাময়িক সমাধানের সম্ভাব্য পরিকল্পনা।

যানবাহন, যন্ত্র-ব্যবহার বিস্তৃতি, কলকারখানার সম্প্রসারণ, চিকিৎসা ব্যাপার ঔষধপত্র, সেচব্যবস্থা, বিদ্যুৎ-ব্যবহার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পথঘাটে নিরাপত্তা, সংবাদ সরবরাহ ইত্যাদি বহুবিধ প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এযুগে। আর এযুগের শিক্ষা আমাদের শহরবাসী হতে শিখিয়েছে কারণ, বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষে যে-ধরনের পটুত্ব আমরা লাভ করি তা গ্রামের জীবনে কোন বিশেষ কাজে আসে না— সে-বিদ্যা বা পটুত্বের-দক্ষতার বিনিময়ে শহরে অথবা শিল্পাঞ্চলে অর্থ উপার্জন সম্ভব। ধীর-স্থির গ্রাম-জীবনের ছন্দ আধুনিক জীবনের নয়। অথচ শিল্প বিপ্লবোত্তর দুশো বছরে কেবল ধনী পাশ্চাত্য সমাজগুলিতে আর অন্যান্য দেশের কেবলি সমাজের উপরিতলের কিছুসংখ্যক মানুষ ছাড়া দেশে দেশে কোটি কোটি

মানুষের কাছে সভ্য-জীবনের প্রসাদ সর্বথা লভ্য নয়। By-product হিসাবে কিছু সুবিধা উন্মুক্ত আছে বটে, কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক বিন্যাস ব্যবস্থার ফলে আর্থিক দিক থেকে যোগ্যতাধীনের পক্ষে কিছুই সাধ্য নয়। ভারতবর্ষেও বিদেশী শাসনের সূত্রে যে বাহ্যিক উন্নতির সূত্রপাত, সেই পথ ধরেই এযাবৎকাল উন্নতির চেষ্টা চলেছে। অল্পবিস্তর এই চিত্র দরিদ্র দেশগুলিতে, উপরিতলের মানুষের কিছু বাস্তব সমৃদ্ধি, কিছু তৈজসপত্র বৃদ্ধি সাধারণের। অর্থের বিনিময়ে যাদের কেনার ক্ষমতা আছে তাদেরই ভোগ করার সামর্থ্য। অন্যথায় বঞ্চিত থাকা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জনসাধারণের কাছে human rights, social rights, political rights, citizen's rights, ইত্যাদি কোন অধিকার বোধের ধারণা পূর্বেও যেমন স্পষ্ট ছিল না, আজও নেই। অধিকন্তু গণতন্ত্রের নিগূঢ় অর্থও জানা নেই। শিক্ষার প্রসার ঘটে নি আশানুরূপভাবে শুধু এই কারণের জন্যই যে অজ্ঞতা তা নয়, দেশের জনশিক্ষা ব্যবস্থায় উপযুক্তভাবে এই মূল্যবোধের ধারণা জাগাবার চেষ্টার অভাবই অন্যতম কারণ।

দেশপ্রচলিত আইনকানুন, বিধিব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা জনকল্যাণের জন্যই, নচেৎ এর কোন মূল্য থাকে না। নিবন্ধের প্রারম্ভেই এই সত্যে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছি। সমাজে নিরাপত্তার প্রশ্নের সঙ্গে কল্যাণরাষ্ট্রের সম্বন্ধ ওতপ্রোত। দুর্বলকে রক্ষা করার ভার সবলের, অপারগ অসমর্থকে রক্ষা করার ভার সমর্থের। আমি এবং আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে যে আত্মবিস্তৃতি তাও মানুষেরই। বিভিন্ন দেশের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস, বর্তমান বিধিব্যবস্থা এইটি সহজবোধ্য করে যে-সমাজের শাসক বা পরিচালকশ্রেণী তথা সরকার যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে যে আদর্শ রূপদানের চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে, সমাজে তারই প্রতিফলন দেখা যায়। সমাজের আর্থিক কাঠামো সমবেতভাবে বদল করা যায়। কোন এক অদৃশ্য শক্তির নিয়ন্ত্রণে সমাজ ব্যবস্থা চলে না, মানুষই নিয়ন্ত্রিত করে। আমরা অভ্যস্ত জীবনযাত্রাই একান্ত মনে করি, সমগ্র সমাজের হিতসাধনই যে বিধিব্যবস্থা পরিকল্পনার উদ্দিষ্ট সে-কথা ভুলে যাই। শ্রেণী বা গোষ্ঠী-বিশেষের উপযোগী প্রচলিত সুবিধাজনক অবস্থা-প্রথা-রীতিকেই সত্য ও একান্ত বলে বিবেচনা করি। আবার সমসাময়িক আকাশে, বাতাসে যে-ভাব তুমুল আন্দোলিত তাই মানতে বাধ্য

হই। নিজেকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাতেই জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। আর্থিক নিরাপত্তার অভাবে অধিকাংশই আমরা অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগে ভুগি। অনেক বিষয়েই আমরা উদাসীন থাকি বা বিপজ্জনক সান্নিধ্য সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। অনুসন্ধিৎসা-সংশয়-জিজ্ঞাসার তৎপরতা সাধারণের মধ্যে কমই দেখা যায়। অথচ এই প্রক্রিয়াতেই সমাজ-মন সতেজ ও সচল থাকে।

বহুকাল পরবশ্যতার ফলে একদা ঔপনিবেশিক দেশগুলির সমাজে এক ধরনের শিথিল মনোভাব, অনীহা, গা-বাঁচানোভাব ও ক্রুদ্ধ হিংসায় বিশৃঙ্খল আক্রোশে ফেটে পড়ার ভাব দেখা যায়। উপরিতলের ক্ষমতা-বান বিত্তবানের অধিকাংশের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাও ক্ষুব্ধ জনতার আক্রোশ জিইয়ে রাখে। নানা-জাতীয় বিশৃঙ্খলা বিড়ম্বনার আশুপ্রতিকারের উপায় না দেখে বীতশ্রদ্ধ হয়ে অথবা উচ্চাশা-বশত, অধিকতর আর্থিক সমৃদ্ধি জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় ধনী পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির দিকে ধাবিত একদল। প্রাচীনকালে এমনতর ঘটনা ঘটেছে মূলত ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে, ধর্মবিজয়ের উদ্দেশ্যে কী রাজ্য জয়ের আকাঙ্ক্ষায়। কোন একটি গোষ্ঠী রাজনৈতিক কারণে বিতাড়িত হয়েছে; লুঠতরাজ ধন প্রাণ হানি করে কখনো একদল মানুষ আর একদেশের সমাজকে ছিন্নভিন্ন করেছে। আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় ইয়োরোপীয়ের ইতিহাসও অনেকটা সেই ধরনের। একদেশ থেকে অপর দেশে শ্রমিক-দাস বসবাসের ইতিহাস সকলেরই জানা। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পরেই এযুগে ভাগ্য-অন্বেষণে বসবাসের আকাঙ্ক্ষায় বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত দক্ষ কারিগর, কর্মী, পেশাদারী, বৃত্তি-ধারী শ্রেণীর মানুষের গমনাগমন বৃদ্ধি পেয়েছে। বাস্তব সমৃদ্ধির সম্ভাবনা দেশে দেশে একই পর্যায়ে না থাকায় সম্ভাবনাময় পাশ্চাত্ত্য-সমাজে বসবাসের জন্য আগ্রহ। কিন্তু এই পলায়নী-প্রবৃত্তি কোন স্থায়ী সমা-ধানের পথ নয়, কিছু সংখ্যকের স্থান জুটছে এবং জুটবে; বহুসংখ্যকের জীবনমানের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন— দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শাসন ব্যবস্থায় শিল্পসংস্থার পরিচালন ক্ষমতায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের মালি-কানায় নেতৃত্বে, শিক্ষা ব্যবস্থায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্বপ্রকার কর্মপ্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে যারা আসীন তাদের সমবেত সুবিবেচনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টা।

একদা উপনিবেশিকতার আওতায় থাকা দেশগুলিতে যে-ধরনের আত্ম-স্বার্থসিদ্ধির মনোভাব, লুব্ধ অর্থগৃধ্নু মতলবী মনোভাব শ্রেণী-বিশেষে প্রকট তা সমাজ উন্নয়নের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যারা বৈষম্য বিশৃঙ্খলার বিরোধী, সুস্থতা-সমতা শৃঙ্খলা যাদের কাম্য অথচ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের প্রতিকারের ক্ষমতা বা নেতৃত্বদানের ব্যক্তিত্বে অপারগ, তাদের এক নিদারুণ হতাশার মনোভাব। যারা বিশেষ মত বা পথের অনুসরণকারী অথচ সমগ্র সমাজ তাদের লক্ষ্য নয়, তারা শিক্ষিত বেকার, শ্রমিকের বৃহৎ অংশের রুষ্ট ক্ষুব্ধ মনোভাবকে হাতিয়ার করে নিষ্ঠুর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছে দেখা যায়। অপরদিকে একশ্রেণীর আশা-বাদীর চিরায়ত পরিমিতি ও সন্তুষ্টির মনোভাব— আর অগণিত জনতার গতানুগতিক নিরুদ্যম অথচ কখনো রুষ্ট কখনো মার-খাওয়া পর্যুদস্ত দিশাহারার মনোভাব।

এই বহুধা-বিভক্ত খণ্ডিত মনোভাবের সমাজে ব্যক্তি, সমাজ তথা জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ধ্যান-ধারণাও খণ্ডিত। যে-সমাজে দারিদ্র্য, বৈষম্য বিশৃঙ্খলা, বহুতর খণ্ডিত মনোভাব, যেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে সর্বক্ষেত্রে পেশায় বৃত্তিতে প্রতিযোগিতা, ব্যক্তি সম্পর্কে ব্যব-সায়িক মনোবৃত্তির বৃদ্ধি, যেখানে মানুষের সংঘবদ্ধতা শুধু স্বার্থনির্ভর, রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতার উদ্দেশ্য ক্রূর দমন জবরদস্তি, পশ্চাতে মারণাস্ত্র জিঘাংসা প্রবৃত্তির উদ্দামতা, সেই সমাজ, সেই সভ্যতা মানবের নৈকট্য বুদ্ধি, শান্তি ও সুস্থ জীবনের স্বপ্ন বিঘ্নিত বিচলিত করে। একথা বলাই বাহুল্য, যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর কোন সমাজের শান্তি সুস্থ ও পুষ্ট জীবনের স্বপ্ন সফল করতে পারে না যদি-না সেই সমাজের সামনে জাতীয়-জীবনের ঈপ্সিত উদ্দেশ্য অভীষ্টের স্পষ্ট ছবি থাকে। এক এক মনোভাবের মানুষের কাছে এক এক আশা, আকাঙ্ক্ষা। সমগ্র সমাজের কি অভিপ্রেত? সমানভাবে দুটি অন্নবস্ত্রের সংস্থান অথবা যে যেমনভাবে দুর্দশায়-ক্ষুধায়-রোগেভোগে দিনাতিপাত করছে বা প্রতিযোগী ব্যবস্থার গুণে নিজেকে নিয়ত ক্ষয় করে চলেছে এমনই চলতে থাকাই অভিপ্রেত?

ক্রম-অগ্রসরণের পথে অনেক সভ্যতার পতন হয়েছে, অনেক সমাজ-ধ্বংস হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়েছে বহু মতবাদ, আদর্শবাদ— সেই ধ্বংসাত্মক ভয়াবহ ঘটনা মানুষের মনে থাকে না। সমসাময়িককালে যারা সুখে

সমৃদ্ধিতে বাস করছে তাদের দেখে আমরা বিমোহিত। কিন্তু বিমুগ্ধতাই কোন সমাজকে বাস্তব সমৃদ্ধি এনে দেয় না। আমরা শুনি রাষ্ট্রিক সমবেত আর্থিক উৎপাদন মূল্যে সমাজের আর্থিক সচ্ছলতা অব্যাহত থাকে। শুধু তাই নয়, সমবেত সম্পদ সঙ্গতি সুচিন্তিতভাবে সদ্ব্যবহারেই সমগ্র সমাজকে দারিদ্র্যের কবল মুক্ত করা সম্ভব হয়। দেশের খনিজ প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প-কৃষি উৎপাদন ও মানুষের কর্মক্ষমতার সহযোগ সমবায়ই দেশের সমবেত সম্পদ।

দয়ার্দ্র যুক্তিবাদী সক্ষম সচ্ছল সমাজের লক্ষ্য থাকে যেন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরও দুটি মোটা-ভাত কাপড়ের সংস্থান হয়, মাথায় আচ্ছাদন জোটে, অশক্ত রুগ্ন পঙ্গুদের সন্তান-সন্ততি অশিক্ষিতের সন্তান-সন্ততিরাও যেন রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ কর্মক্ষম হয় তবে তারাও শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদনের অংশ পাবার যোগ্য হবে। অর্থাৎ অহেতুক জঞ্জাল বলে যাদের আমরা মনে করি তারাও দেশের জনসম্পদের অঙ্গীভূত হতে পারে।

মানসিক সুখ-শান্তি যে ঠিক, কি বস্তু তা বলা কঠিন বোঝা আরও দুরূহ। তবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের এই অবস্থাটুকু কাম্য যাতে আর্থিকভাবে সচ্ছল অবস্থা থাকে, সকলে খেয়েপরে বেঁচেবর্তে থাকে, রোগভোগের তাড়না না থাকে বা উপশমের উপায় থাকে, কর্মক্ষম সুস্থ শরীর মন থাকে— এতেই আমরা একধরনের তৃপ্তি অনুভব করি। কিন্তু সুখের ধারণা সব মানুষের একরকম নয়, আর্থিক সচ্ছলতার ধারণাও এক নয়, প্রাপ্তির ইচ্ছাও বিচিত্র। তথাপি যে-ধরনের দারিদ্র্য, অভাব বঞ্চনায় দেশের ৮০/৯০ ভাগ মানুষ আমরা ভুগি, সেই ভোগ-ভোগান্তি ঘুচলে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা নিরাপত্তা থাকলে, জনস্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা বিস্তৃত হলে এবং জনশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপক হলে সাধারণ মানুষের সুস্থ সুখী জীবন হয়, তাদের ক্ষোভের-ভাব প্রশমিত হয়। কাজেই অনুমান করি দরিদ্র দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠের কথা চিন্তা করে প্রথমত একটি লক্ষ্য স্থির রাখা কর্তব্য। দ্বিতীয় সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে সমগ্র সমাজে এক মনোভাব সৃষ্টি চাই। তৃতীয়ত সমবেত চেষ্টায় সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য বা উদ্দেশ্যে সফলতা লাভের জন্য সুপরিকল্পিত পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন। পরিবারে যেমন পরস্পরের দায়-দায়িত্ববোধের অভাব দূরত্ব এসে পড়ে, সমাজেও শ্রেণী সম্প্রদায় বিশেষের দায়িত্ববোধের অভাবে

আপন গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধিই উন্নতি বলে প্রতীতি জন্মায়।

সমাজে শ্রেণীভেদ থাকলেও ব্যক্তির কর্ম প্রাচীনকালের মতো স্বধর্ম আখ্যা পায় না, চাষী ও শ্রমিকের কাজ একপ্রকার বংশানুক্রমিক কুলকর্ম হয়ে উঠলেও আজকের দিনে সেকথা কেউ উচ্চারণ করে না। ব্যবসা-বাণিজ্য, খনি, কলকারখানার মালিকানা, শিল্প উৎপাদনের মালিকানা ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানায় বংশানুক্রমিক ভোগাধিকার অটুট থাকে। গচ্ছিত ধনে অধিকার সন্তান-সন্ততিতে বর্তায়, ব্যক্তির স্ব-দক্ষতা-জনিত, বুদ্ধি-প্রসূত শ্রমলব্ধ ধনার্জন সমর্থন পায়। কেবল জমিদারি-প্রথা উচ্ছেদ, রাজন্যবর্গের মাসোহারা লোপ ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ব্যতীত আর্থিক ব্যবস্থার বিশেষ রদবদল কিছু দেখা যায় না। মানব অধিকারের তত্ত্ব ভাসা-ভাসাভাবে স্বীকৃত হলেও দেশের সমগ্র উৎপাদন-আয় সমভাবে বিলিব্যবস্থা বা সমান ভোগের আদর্শ আদৌ স্বীকৃত নয়। শহর, গ্রামের পারস্পরিক নির্ভরতা তুল্যভাবে সমর্থিত নয়। শ্রমও বিনিময়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রাপ্তির অবস্থাও পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান নয়। সর্বত্রই কাজের সম্বন্ধে এযুগের রীতি অনুযায়ী দাবীর বোধ যতটা কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ তার চেয়ে লঘু প্রতীয়মান হয়।

শ্রেণীবিহীন সমাজ কোন দেশেই নেই— এই কথাটা সহজভাবে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিরতিশয় আর্থিক বৈষম্য বাস্তব-জীবনের অবস্থার বৈষম্য দূর করাই মানবিক মূল্যবোধের বিকাশের প্রথম সোপান। কতগুলি বাঁধাধরা বুলি শেখানো আর শ্রেণী-সংগ্রামের নামে পরস্পর বিরোধ জিইয়ে রাখায় জাতীয়-জীবনের বনিয়াদ সুগঠিত হবে কিনা সন্দেহ, বরং তা বিরোধ হিংসা প্রতিহিংসা দমন প্রতিদমন টিকিয়ে রাখার পক্ষে অনুকূল। অভীষ্ট যদি হয় জনকল্যাণ, জনজীবনের মান উন্নয়ন, বঞ্চিত, আহত জনতাকে মানব অধিকার দানের সঙ্কল্প তবে সমগ্র সমাজে অনুকূল মানসিক ভাবের স্থিতাবস্থা একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের মতো ধন হস্তান্তরে বা শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনা হস্তান্তরে, অবস্থার ইতর বিশেষ হবে বলে বোধ হয় না। শিক্ষার নীতি ও আদর্শ নির্ণীত না হলে অভীষ্ট ফল লাভের সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়াই সম্ভব। জাতীয় চরিত্রগঠনে সমাজের শিক্ষা-ব্যবস্থার দায়িত্ব অপরিসীম। ব্যক্তির চাহিদার, ভোগের, উপকরণের পরিমিতি-বোধ ; মানবিক গুণের উৎকর্ষসাধন এবং দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ও শৃঙ্খলা-

বোধের ধারণা— এগুলির আন্তরিক চর্চা শিক্ষানীতির অভিপ্রেত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় মানসিক প্রস্তুতিহীন সমাজে ধন হস্তান্তর বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতির প্রশ্রয়ে নব্যসম্প্রদায় সৃষ্টির সম্ভাবনা ও বিরোধের সম্ভাবনা।

এ-যুগের চিন্তায় হয় প্রতিযোগী ব্যক্তিবাদ নয় শ্রেণীসংগ্রাম প্রাধান্য পায়। এ-দুয়ের মধ্যবর্তী কোন পথ, কোন রাজনৈতিক মতবাদ সমাজ অগ্রগতির পন্থা বলে চিহ্নিত করে না। অথচ দেশে-দেশে সভ্যতার ইতিহাসে মনীষী মহাজনদের বাণী দুই চরমপন্থা পরিহারের পক্ষে রায় দেয়। রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি জীবনের যে অবস্থার বিধিব্যবস্থার উপযোগী নীতি সেই নীতি অর্থাৎ দেশের রাজনৈতিক অবস্থার বা রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুসৃত নীতির উপর দেশের অর্থনীতি তথা ব্যবহারিক জীবনের কাঠামো, অর্থনৈতিক বিন্যাসের উপর শক্তি ক্ষমতা কর্তৃত্বের শ্রেণীবিন্যাস। সমাজের শিক্ষাও সেই নীতির অনুকূলে, একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন এইজন্য যে জাতির শিক্ষা যেন কেবলমাত্র সেই দৃষ্টির বাণীবাহক হয়ে একদেশদর্শী অপূর্ণ প্রচার-মূলক না হয়ে পড়ে এবং সমসাময়িক অবস্থার সমস্যাও যেন এড়িয়ে না যাওয়া হয়।

পুনরুক্তি করি, শ্রেণীহীন সমাজ কোথাও নেই এই অর্থে যে, সমাজতান্ত্রিক আর্থিক অবস্থার দেশেও কর্মের-পরিচালনার-ক্ষমতার-পেশার শ্রেণীভেদ অবশ্য বিদ্যমান, —এটাই স্বভাবিক। দূর হয়েছে শ্রেণীগত উত্তরাধিকার বা বংশপরম্পরাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ। এ-যুগে আমাদের দেশেও বংশপরম্পরাগত সামাজিক শ্রেণীভেদের শিথিলতা এসেছে। শিক্ষাগত যোগ্যতায় লব্ধ আর্থিক উপার্জনের সূত্রেই সে-ধরনের শিথিলতা। ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ভরতা, কর্মক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই সুযোগ প্রাপ্তি, অশক্ত অক্ষম বৃদ্ধ বা অপরিণত বয়স্কের সমাজিক নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ আয়ের সীমাবদ্ধতা আইনসিদ্ধ হলে, শিক্ষা রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের দায়িত্বে পূর্ণমাত্রায় বর্তালে— ব্যক্তি-জীবনে আর্থিক অনিশ্চয়তা দূর হয়; তার ফলেই ধীরে ধীরে সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। বংশানুক্রমিক আর্থিক অধিকারে শিথিলতা ঘটতে পারে বিধিবদ্ধ আইনের মারফত। মনে রাখতে হবে রাষ্ট্রিক সমবেত আয় ও সমগ্র সম্পদের ভিত্তিতে দেশের জনসংখ্যার অনুপাতেই সামাজিক নিরাপত্তাদানের প্রতিশ্রুতি প্রতি ব্যক্তিকে দেওয়া সম্ভব। এখানে আয় এবং

আর্থিক অবস্থার বৈষম্য সঙ্কোচের কথা বলা হচ্ছে, সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী করা ও সফলতায় পৌঁছানোর পথে যুগ্মভাবে দেশের আইন এবং শিক্ষানীতির সমধিক গুরুত্ব। সমগ্র সমাজের বাস্তব-জীবনের সুস্থ সমৃদ্ধ অবস্থা বজায় থাকলে মানসিক পরিণতির একটা অবস্থায় উর্ধ্বায়ণ সম্ভব বোধহয়। অপর দিকে বাস্তবভাবে আর্থিক একটি সুস্থ সমৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত গোষ্ঠী, শ্রেণী সম্প্রদায়ের উপরেই প্রত্যাশা যে তাদের পরিমিতিবোধ ও শুভবুদ্ধি বঞ্চিত আহত জনতার হিতসাধনে তৎপর হবে। এই তৎপরতা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই উভয়ত সমশিক্ষানীতির প্রভাবে প্রভাবিত হবার অপেক্ষা রাখে। সে-শিক্ষা দেশের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি মূল্যবোধের সঙ্গে অন্বিত হলেই সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও স্থায়ী হওয়া সম্ভব। অন্যথায় বিশেষ মতবাদে পুষ্ট অপরিচিত পন্থা কৌশল শক্তিপ্রয়োগ সমাজে সমর্থন লাভের পরিবর্তে দ্বন্দ্ব-বিরোধ-ক্ষমতার-লড়াই জোর-জবরদস্তির রূপ নেয়, পরিশেষে হিংসামূলক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে পর্যবসিত হয়ে জনজীবনে কল্যাণের অপেক্ষা অকল্যাণ অশান্তিই ডেকে আনে।

এই দিকটি স্মরণ রেখে আমরা পূর্বকথায় ফিরে যাই, যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয়ী শিক্ষাই ভারতীয় জন-শিক্ষানীতির লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়, কেননা বহু বিড়ম্বনা অধোগতি দারিদ্র্য উত্থান পতন সত্ত্বেও ভারতীয় জন-জীবনে ধর্মদ্দেশনা বহমান আছে। সেই কেন্দ্রীয় ভাবটিকে উপযুক্তভাবে গ্রন্থন পরিমার্জনের সূত্রে বৃহৎ সমাজবোধের উন্মেষ বিকাশ ঘটানোই যথার্থভাবে জনচিত্ত-জাগরণ, তথা জাতীয়-চরিত্রের বনিয়াদ গঠন। ধর্ম-পরিবার ও সমাজবন্ধনের যে-রূপ, যে-আদর্শ আজও বর্তমান তার মূলটিকে উৎসাদন ক্ষতিকর। বর্তমানে সমাজে শিক্ষিত ক্ষমতায় আসীন উচ্চকোটির শ্রেণীতে আর্থিক অবস্থার সমতা স্থাপনের কোন সর্ববাদীসম্মত আদর্শ নেই, নিরতিশয় বৈষম্য দূরীকরণে অধিকাংশের সমর্থন থাকলেও দেশের দরিদ্র জনতার জীবনমান উন্নয়নের কোন বাস্তব লক্ষ্যও স্থির নেই। রাষ্ট্রের তথা সরকারের লক্ষ্য কি, এই বিশেষ সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টায় সে-সম্বন্ধেও কোন স্পষ্ট ধারণা আমাদের জন্মায় না। চাকরিজীবী, স্বল্পবিত্তের মানুষ, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী পেশাদারী বৃত্তিজীবী নির্দিষ্ট আয়-উপার্জনের শহরবাসী, গ্রামবাসী দেশে দ্রব্যমূল্য স্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উনতা, প্রশাসনে অব্যবস্থা ও

পরিস্থিতির বিশৃঙ্খলায় যতটা অসুবিধাভোগ করে বিত্তবান ধনী সম্প্রদায়ের ততটা ভোগ হয় না বা অসুবিধার অভাবের পরিস্থিতিতেও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বজায় রাখতে সমর্থ হয়, গ্রামের চাষী গৃহস্থ ও শহরের মানুষের মতো খাদ্যদ্রব্যের অপ্রাপ্তি অভাবের দরুণ ততটা ভোগে না। নগরবাসী মানুষের এই অবস্থার উপরে আর-একটি চাপ পড়ে শিক্ষিত বেকার সমস্যার দরুন। নগর-জীবনের এটি একটি পীড়া। শহরের জনসংখ্যার একটি অংশের মানসিক ও ব্যবহারিক দুরবস্থা ভোগের এই এক কারণ। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে কর্মহীন মানুষের দায়িত্ব এযাবৎ প্রতি-পালিত হয়েছে যৌথপরিবারের দ্বারা ও সমাজের দয়া-দাক্ষিণ্যে। বর্তমান যুগে যৌথপরিবারের ধারণা আমাদের বদলেছে। ভূমিকেন্দ্রিক কৃষি উৎপাদন-কেন্দ্রিক পরিবারের পক্ষে বহু আশ্রিতের প্রতিপালন ক্ষমতা যে-অবস্থায় ছিল, শহরের নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের সে-ক্ষমতা নেই এবং এ-যুগের শিক্ষাও আমাদের স্বার্থত্যাগের ধারণা বদলে দিয়েছে। যাদের ক্ষমতায় কুলায় না তাদের কথা উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যাদের ক্ষমতায় কুলায় তারাও আশ্রিত প্রতিপালনের বা পরিবারের দায়-দায়িত্বের অধিক সামাজিক দায়িত্ব সকলেই বোধ করে না। এ-যুগে আমরা আশা-করি রাষ্ট্রই এ-দায়িত্ব গ্রহণ করবে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সমাজে প্রতি ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তার ভার রাষ্ট্রের। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে দেশের সামগ্রিক সম্পদ আয় ও লোকসংখ্যার অনুপাতে আর্থিকবিন্যাসে পরিবর্তন, উচ্চকোটির নিম্নকোটির মানুষের দায়-দায়িত্ববোধের সম্পর্ক সহযোগিতার ধারণা স্পষ্ট রাখার প্রয়োজনে শিক্ষানীতির পরিবর্তন, দেশের শিল্প কৃষি উৎপাদন ও মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য আইনসঙ্গতভাবে আর্থিক বণ্টনের নীতি গ্রহণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমগ্র সমাজের কথা চিন্তা করে ঈপ্সিত সম্মানজনক সুস্থ উন্নত বাস্তব জীবনমানে উপনীত হবার পথে এই বিষয়গুলি ওত-প্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের চাকরির ধারণায় সামান্য রদবদলের দ্বারা বর্তমান শিক্ষিত বেকার সমস্যার কোন সাময়িক সমাধান হওয়া সম্ভব কিনা ভেবে দেখা যাক। আমাদের দেশে আপিস কাছারি ব্যাঙ্ক আদালত ইস্কুল কলেজ দোকান বাজার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে কাজ হয় সোমবার থেকে শনিবার। বহু কলকারখানায়, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে,

যানবাহন ব্যবস্থায়, বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে, হাসপাতালে চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রতিদিনই কাজ চলছে। যে-সংস্থায় প্রতিদিন কাজ চলে এবং যেখানে সোম থেকে শনি ৯—৫টা বা ১০—৫টা কাজ হয়, উভয় ক্ষেত্রেই সময় ব্যাপ্তি দু'ভাগে বিভক্ত করে সোম বুধ ও বৃহস্পতি-শনি অথবা সোম থেকে বৃহস্পতির অর্ধেক ও বৃহস্পতির বিকেল থেকে রবিবার সন্ধ্যা যদি এই-ধরনের বিভাগ সম্ভব হয় তাহলে একই ধরনের শিক্ষায়, পেশায়, বৃত্তিতে শিক্ষিত বা দক্ষতালাভ করেছে এমন দুই দল ব্যক্তি নিয়োগের ব্যবস্থা হতে পারে -- ফলে একদিকে যেমন বহুজনের কর্মসংস্থান হয় একই কর্ম-প্রতিষ্ঠানে, তেমনি অপরদিকে এই নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বপ্রকার কর্ম-প্রতিষ্ঠানেই কিছু কাজও বেড়ে যাবে। তাতেও কিছু শিক্ষিত লোকের কর্মসংস্থান হবে। অর্থাৎ চাকরির ধারণাতে কিছু সংযোজন বিয়োজন ও প্রতিষ্ঠানের লাভ মুনাফা খরচের ধারণাতে কিছু রদবদলের প্রয়োজন।

বেকার-ভাতার তুলনায় স্বল্প সময়ে নির্দিষ্ট কাজের ব্যবস্থা অনেক দিক থেকে ভালো। এই যৎসামান্য বেকার-ভাতা দেশের যুব-সম্প্রদায়কে মেরুদণ্ডহীন কর্মবিমুখ করে তুলতে পারে। স্বল্প সময়ে নির্দিষ্ট কাজ, বিবাহিত সন্তানবতী শিক্ষিত মেয়েদের পক্ষে সুবিধাজনক। শহর-জীবনে খরচ চালানোর দায়ে আজ বহু মেয়েকেই রোজগারের পথ দেখতে হয়। সদ্য-পাশ-করা ছেলে-মেয়ে উভয়ের পক্ষেই এ-ধরনের ব্যবস্থা উপযোগী। যারা স্বল্প আয়ে পিতামাতার আশ্রয় বা যৌথপরিবারের আশ্রয় ছেড়ে অন্যত্র যেতে ভরসা পায় না তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পুরো দায়িত্বভার দেওয়ার চেয়ে তত্ত্বাবধানে স্বল্প দায়িত্বে কাজ শিখিয়ে নেওয়ার পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত। বহু বয়স্কব্যক্তি অভিজ্ঞ কর্মী শারীরিক কারণে হয়তো সপ্তাহে ৬ দিনই সমানভাবে খাটতে পারেন না. বা ইচ্ছুক নন, তাঁদের পক্ষেও এই ধরনের ব্যবস্থা সুবিধাজনক হতে পারে। শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা চালু করা যায়। বেতনের ব্যবস্থা বয়স অভিজ্ঞতা সময়ের আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হতে পারে। অর্থাৎ যুগের প্রয়োজনে সমাজ সমস্যার সমাধানে অভ্যস্ত প্রথাবদ্ধতার পরিবর্তনের জন্য মনকে প্রস্তুত করা, সাময়িক সমস্যার যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষিত বেকার সমস্যা দূরীকরণে সহায়তাদানে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে নতুন পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা প্রয়োজন। কোন নীতিই

সমাজে সম্ভবত সর্ববাদীসম্মত হয় না। সকলকেই সুখী করে, আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, এমন ব্যবস্থাও বোধহয় কোন সমাজে নেই। কিন্তু অধিকাংশের জীবনে কিছুটা আশা পূরণ হয়, সকলেই একটা জীবনযাত্রা নির্বাহের সাদামাটা ব্যবস্থায় মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান পায় সে-বিষয়ে লক্ষ্য রেখে যদি মানব-জীবনের মর্যাদা রক্ষার্থে একটি স্বাধীন দেশ গুরুতরভাবে সক্রিয় না হয়ে ওঠে তবে এই প্রমাণ হয় যে, সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত শ্রেণী পরমুখাপেক্ষিতা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি, এবং সমাজের বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় আপন স্বার্থ রক্ষার্থে ধনতান্ত্রিক সম্পদশালী দেশের পন্থা অনুসরণে যতটা তৎপর হয়েছে, গোষ্ঠীগতভাবে সেই বুদ্ধিশালী সম্প্রদায় স্বকীয়তা তত দেখাতে পারে নি। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক মতবাদী গোষ্ঠী রাজনৈতিক আন্দোলন-ক্ষমতা কব্জা করা ধ্বংসাত্মক জবরদস্তি, ইত্যাদি নীতি অনুকরণ আরোপে যতটা সিদ্ধিলাভ করেছে জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজ সংগঠনমূলক কর্মতৎপরতা ততটা প্রমাণ করে নি। অথচ সমাজে জনজীবনের মান উন্নয়নে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাস জাগানো ও আরোপিত পন্থা অনুসরণে উদ্দীপনা জাগানোর চেয়ে বোধ-বুদ্ধির সজীবতা জাগানো ও যুগপৎ আইনসঙ্গতভাবে অর্থনৈতিক বিন্যাস ব্যবস্থার পরিবর্তন অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল।

বর্তমানে নানাজাতীয় জটিলতা মুদ্রাস্ফীতি ইত্যাদি সত্ত্বেও উপরে বর্ণিত পরিকল্পনাটি পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হলে শহুরে শিক্ষিত বেকার সমস্যার অনেকাংশে সাময়িক সমাধান হতে পারে, বিশেষত যখন বড় বড় শহর শিল্পনগরী ব্যতীত এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কার্যব্যপদেশে সচলতা সঙ্কুচিত বা নিয়ন্ত্রিত বলা চলে। ব্যক্তিগত ব্যবসা কী বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিপ্রচেষ্টা এক রাজ্য থেকে অপররাজ্যে গিয়ে সফল হবার সম্ভাবনা কম, আদৌ নেই বললে কিছু বাড়িয়ে বলা হবে না। কেন্দ্রীয় সংস্থা, বৃহৎ শিল্প-ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈজ্ঞানিক গবেষণাকেন্দ্র এইসব স্থানে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত, বিশেষ দক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অল্পসংখ্যক ব্যক্তির সম্ভাব্য নিয়োগে বিশেষ রাজ্য-সীমা কোন বাধা সৃষ্টি করে না,— এ ছাড়া কার্যত কর্মক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সচলতা নগণ্য, আদপেই নেই বললে চলে, এক কলকাতা-বোম্বে-দিল্লী

প্রভৃতি কয়েকটি বড় বড় নগর ব্যতীত। এমত অবস্থায় শিক্ষিত বেকার সমস্যার সাময়িক সমাধানে উক্ত পরিকল্পনাটি একটা হঠকারি অসম্ভব কল্পনা-বিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা বিবেচ্য।

সমাজের আর্থিক নিদারুণ বৈষম্য দূরীকরণে মনোভাবের পরিবর্তন যে কতটা দরকারী এবং মনোভাব যে কীপ্রকার দৃঢ়মূল তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমরা ক্ষুব্ধ হই যদি দেখি সব জাতীয় কাজকে একই পর্যায়ে ফেলা হয়। কায়িকশ্রম মানসিক-বুদ্ধির কাজের গুণবিচার না করে সমানুপাতিক বেতনভুক্তিতে আমাদের মন সায় দেয় না। আমরা মর্মাহত হই যদি দেখি কৃতী ব্যক্তির সন্তান উপযুক্তভাবে শিক্ষিত বা উচ্চপদে উচ্চমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বা সমমর্যাদার ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত না হয়। অর্থাৎ আর্থিক বৈষম্যে, বংশপরম্পরায় সামাজিক বৈষম্যে, আমাদের মনই পরোক্ষে সায় দেয় কারণ এই প্রকারই আমার দেখতে বুঝতে অভ্যস্ত। আবার আমরা বেহিসাবি ক্ষমতাকে সহ্য করতে পারি না বটে কিন্তু বংশপরম্পরায় ধন-সম্পদের ভোগে আমরা প্রাপ্য অধিকার বলেই স্বীকার করি। স্বচেষ্টায় ব্যক্তির ধন উপার্জনের উপর কোন সীমারেখা আমাদের মনে সায় দেয় না।

অথচ ব্যক্তি এবং সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে গুরুত্ব দিলে ব্যক্তি প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠাকে সম্মান কৃতিত্বে মর্যাদা দেবার সঙ্গে ধন উপার্জনের একটা সীমা নির্ধারণও প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং গচ্ছিত ধন-সম্পদ বংশানুক্রমিক ভোগের ব্যাপারেও কিছু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়।

দ্বিতীয়ত, পেশাদারী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষার ফলে অধিক উপার্জনের সম্ভাবনা এই জ্ঞানে অধিকসংখ্যকের সেই একই ধরনের শিক্ষা গ্রহণের চেষ্টায় প্রয়োজনাতিরিক্ত দক্ষ কারিগর, প্রয়োজনাতিরিক্ত স্থপতি, প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষক-অধ্যাপক ইত্যাদি ক্রমে সমস্যা সৃষ্টি করে। যদিও এই ধরনের বিনিয়োগ গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থ বা বস্তু বিনিয়োগের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তথাপি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, একঝোঁক দৃষ্টি হতাশা, ক্ষোভ, বৃদ্ধি করার পক্ষেই অনুকূল। এই অপ্রীতিকর দুঃখজনক পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যই ৫/১০ বৎসর অন্তর পরিকল্পনার কার্যকারিতা অনুসন্ধান, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, পুথিগত বিদ্যার পরিবর্তন, কায়িক-শ্রম বুদ্ধির কাজ পেশাদারী দক্ষতার কাজে লব্ধ উপার্জনে আসমানজমিন ফারাক ঘুচানো নিতান্ত দরকার। দুঃখের বিষয় শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে,

ব্যক্তি ও যৌথ উপার্জনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন উত্থাপিত হলেই ব্যক্তির গুণগত যোগ্যতা বিচারের মূল্যও যেমন রক্ষা পায় না, বিভিন্ন কার্যকরী পরিকল্পনাও বাস্তবে রূপ পায় না, তখন সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থাতে মুরুব্বির প্রশ্ন এসে পড়ে। কবে এবং কীভাবে এই দোষমুক্তি ঘটবে কারোই জানা নেই, তবে একযোগে নিয়ত অনুসন্ধান, সুষ্ঠু পরিকল্পনা— নিয়ন্ত্রণ সঙ্কোচনের দ্বারাই জটিল সমস্যাগুলি রাশ টেনে ধরা যেতে পারে সে-বিষয়ে বোধহয় দ্বিমত হবে না।

আশা রাখি নিবন্ধে দুই পর্যায়ে আলোচিত বিষয়ের অবতারণায় প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আর্থিকবিন্যাস ব্যবস্থার পরিবর্তনে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রাথমিক। শিক্ষা-ব্যবস্থা অন্যতম সহায়ক জাতীয় মানসিকতার বনিয়াদ গঠনে। জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিমূলক শিক্ষানীতি সহজে গ্রহণীয়। পরিচিত ভাব-ভাবনার যুগউপযোগী ব্যাখ্যা ও সেই আলোকে সমাজবোধের ধারণা দৃঢ়ীকরণ ভবিষ্যতের পক্ষে কল্যাণকর, নচেৎ আরোপিত ভাব-ভাবনায় বিচ্ছিন্ন মনোভাবের সংশ্লেষে একটি দেশের জনসমাজের জাতীয় পরিচয় বিনষ্ট হতে পারে।

আজ বৃহৎ সমাজবোধের ধারণার উন্মেষ বিকাশের উপরেই জাতীয় জীবনের মান উন্নয়ন নির্ভরশীল। সমাজের যে অংশ শিক্ষিত নয় বা অল্পশিক্ষিত সেই জনতাতেও যেমন, তেমনি উপরের শ্রেণীতেও সমানভাবে বোঝার প্রয়োজন যে সমগ্র সমাজ জীবনের হাজারো রকমের চাহিদা কাজ বিধিব্যবস্থার সমবেত প্রয়োজনকে জড়িয়েই জাতীয় অর্থনীতি। ব্যক্তির দায়িত্ব এবং ব্যক্তি-জীবনের গুরুত্ব গ্রাম-শহর নির্বিশেষে এবং শ্রেণী সম্প্রদায় গোষ্ঠী নির্বিশেষে। সক্ষম সচ্ছল জাতীয় অবস্থা প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ, কৃষি-শিল্প উৎপাদন নির্ভরত বটেই সর্বোপরি দেশের জন-শক্তি নির্ভর। একযোগে উৎপাদন বৃদ্ধি ও সমাজে সমদৃষ্টি সহযোগী মনো-ভাব সৃষ্টির দ্বারা— ব্যক্তি মাত্রেরই আর্থিক নিরাপত্তা সমাজের দারিদ্র্য তথা আর্থিক বৈষম্যের অপনোদনের সম্ভাবনা। পরস্পর সাম্য সহযোগের মনোভাব পরিমিতিবোধ ও ধর্মবুদ্ধির দ্বারা ব্যক্তিজীবনে দৃঢ়ভাবে প্রতি-ষ্ঠিত হয়। এই বোধ বুদ্ধি চিরায়ত ভারত জীবনবোধের স্বরূপ। উপযুক্ত শিক্ষা ও যথোপযুক্ত আইনের দ্বারা সমাজবোধ ও ব্যক্তিজীবনের এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার একান্ত আবশ্যকতা। এটিই উদ্দিষ্ট তৃতীয়-পন্থা।

আমাদের যে মরীয়া মনোভাব দ্রুত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে এই সাধারণ বিষয়গুলি পুনর্বার তলিয়ে বুঝবার যদি একটু অবকাশ মেলে, তবে এই নিবন্ধ কিছুটা সহায়তা করবে। ফলে বোঝা যাবে যে-দাবি-গুলি আজ সোচ্চার, যে-পথ আজ গৃহীত তা অনেকাংশে মূল সমস্যায় দৃষ্টি-পাত করে না, সার্বিক উন্নয়নে মূলের প্রতি লক্ষ্য আজও গুরুত্ব পায় নি।

পরিশেষে বক্তব্য, সমীক্ষা বিশ্লেষণ আলোচনার পদ্ধতিটি জনশিক্ষা-ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, কারণ, এইভাবেই ভালোমন্দ বিচারের ক্ষমতা জন্মায়— যূথবদ্ধ বিক্ষোভের পন্থার চেয়ে এই ক্ষমতা কার্যকরী, এর ফলে অনুসন্ধিৎসা জাগে, প্রশ্ন জাগে নির্বিচারে প্রভাবিত না হয়ে গ্রহণ-বর্জনের বুদ্ধি সজাগ হয়।

মূলত বিষয়ের গুরুত্ব আরোপই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য। সভা-সমিতি আলোচনা-রচনা সব সময়েই যে জ্ঞানবৃদ্ধি বা সমস্যা সমাধান করে তা নয়, সমচিন্তার মানুষকে একত্র করা, সামাজিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রাধান্য পায়। এ-দিক থেকে বিচার করে সম্ভবত নিবন্ধটি মূল্যহীনবোধ হবে না, কোন-কোন পাঠক মানসিক নৈকট্য অনুভব করবেন।